রূপহীনার রূপ

শ্রীলীলাদেবী

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স,
৯০৷২এ, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা।

[দাম ২৲ টাকা

রূপা

বা

রূপহীনার রূপ

(উপন্যাস)

"তুমি কোন কাননের ফুল
তুমি কোন্ কাননের তারা
আমি দেখেছি তোমায়
যেন কোন স্বপনের পারা !"

—কড়ি ও কোমল।

১

"এক্‌জিবিসান্ পুড়ে গেলো ! এক্‌জিবিসান্ পুড়ে গেলো !"

কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! ভবানীপুরের রাস্তা ও আশে পাশের বাড়ীর ছাদে জমা জনতার মুখে মুখে এই রব! এক্‌জিবিসান্ গ্রাউণ্ডে লাট সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল পরিদর্শনের জন্যে, তদুপলক্ষে গণ্যমান্য মনীষীদের সমাগমে রাস্তায় মোটরের অসম্ভব ভিড়! ঐ অজস্র লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ, আগুণের লক্‌লকে প্রদীপ্ত শিখা, এমন একটা দুঃখোত্তেজিত বিস্ময়ে মানুষের মনকে নাচিয়ে তুলেছিল— যাতে শোকের অবসাদের চেয়ে উত্তেজনাই বেশী ছিল।

তারপর—সব ছাই! কত উজ্জ্বল মণিরত্ন, জরী জড়োয়ার বসন ভূষণ, শিল্পীর সারা জীবনের হৃদয়রক্তে আঁকা বিচিত্র নক্সা, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য—যা কিছুর পরিবর্ত্তেই আর ফিরে পাবার নয়—সমস্তই ভস্মে পরিণত! বণিক্‌দের ব্যবসাদার-দের, দোকানীদের সর্ব্বস্ব উজাড় হ'ল—কেউ কেউ বা কপর্দ্দক হীন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আকুল উচ্ছ্বাসে শোক কান্না কাঁদতে দেখে কর্ত্তৃপক্ষরা ব'ল্লেন—"দেশের কপাল! কি ক'রবে বলো? একে তো কাঙ্গাল দেশ, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, তাকে যদি বা এক্‌জিবিসানের সাজে সাজান গেলো—তাও গেলো আগুণে পুড়ে! সবই অদৃষ্ট—অদৃষ্ট!"

অমিয়নাথ দত্তের দেশী ও ঢাকাই কাপড়ের একখানা বড় দোকান একেবারে পুড়ে ছারখার! অমিয়নাথ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দোকান বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদেবের আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হলেন না। ভাগ্যবশতঃ স্বেচ্ছাসেবকরা এসে পড়ায় অমিয়নাথ উদ্ধার হ'য়ে হাঁসপাতালে প্রেরিত হ'লেন সেখানে তাঁর অর্দ্ধদগ্ধ দেহ দুই দিন মাত্র জীবিত ছিল।

অমিয়নাথ কাপড়ের ব্যবসাতে বেশ দু'পয়সা সংস্থান করেছিলেন—ক্রমশঃ তাঁর আর্থিক উন্নতি তাঁকে একজন সঙ্গতিপন্ন ধনী, কলিকাতাবাসী ও নানা কার্য্যকরী সভা সমিতির সদস্য করে তুলেছিল। কলিকাতায় তাঁর মস্ত বাগান বাড়ী, তা আবার দামী জিনিষে ও আধুনিক রুচি

অনুসারে সাজান। অমিয়বাবুর স্ত্রীর গায়ে হীরা জহরতের বোঝা দিন দিন বেড়েই চ'লেছিল—চাকর দাসী ও পরিজন-দেরও সুখ স্বচ্ছন্দের অভাব ছিল না। তাঁদের একটী মাত্র ছেলে রাজেন্ শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছে—সম্প্রতি আঠারো বছরের শিক্ষিতা মেয়ে রূপার বিয়ের আয়োজন চ'লছিল। রূপা বেথুনের ছাত্রী—পড়া শুনায়, গাইতে, বাজাতে, সব দিকেই সে আজকালকার মেয়েদের ছাড়িয়ে না উঠ্‌লেও—সমকক্ষ। আর দেখতে—পরমা সুন্দরী ব'ল্লেও ঠিক্ বলা হয় না, কেন না তার মুখে এমন কিছু ছিল যা আমরা সচরাচর "পরমা সুন্দরী"দের মধ্যে দেখতে পাই না। যাক্—রূপার রূপের কথা ছেড়ে এখন তার বিয়ের কথা পাড়া যাক্। ২০ হাজার নগদ, তা ছাড়া গহনাপত্র দানসামগ্রী আস্‌বাব্ ইত্যাদি বরপক্ষীয়ের দাবী, তা অমিয়নাথ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন কারণ ছেলেটী একজন নামজাদা এটর্ণীর একমাত্র বংশধর; বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান সব দিক্ দিয়েই এমন ছেলে পাওয়া সুকঠিন—তাই এত বড় লোভ সম্বরণ করা সহজ নয়! কিন্তু ঘটনাস্রোতে সমস্তই আজ বিপরীত হ'য়ে গেলো। অমিয়নাথের সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে শুনে বরপক্ষীয়েরা সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন। সুন্দরী, শিক্ষিতা, এ সব কিছুই কিছু নয় বরের পিতা মাতা চেয়েছিলেন টাকা, তাই যখন পাবার আশা নেই তখন করে কে? আচ্ছা, অত বড় ধনী উকীলের টাকার লোভ হয় কেন ব'লতে পারেন? আপ-

নারাও পারেন না, আমরাও পারি না; অতএব ঐ নীচ প্রথার আলোচনা এইখানেই ইতি করা যাক। বিয়ে তো ভেঙ্গে গেলোই—তা' ছাড়া ইংলণ্ডে অবস্থিত পুত্র রাজেনের মাসিক খরচ পাঠাবার জন্যে ও দোকানের কর্ম্মচারীদের মাইনে ও সংসারের খরচ জোগাবার জন্যে শেষ সম্বল সাধের বাড়ী-খানিও ভাড়া দিতে হ'ল! বাড়ী ভাড়া হ'তে দেরী লাগ্‌ল না কারণ সেটা কলিকাতার সিজ্‌ন্, সে সময় অনেকেই বিদেশ থেকে ও পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতায় এসে থাকেন—তার উপর অমন চমৎকার সাজান বাড়ী—সহজেই বড়মানুষদের মনোহারী হয়! ভাড়াটীয়ারা এসে পৌঁছবামাত্র রূপা ও তার মা সমস্ত বাড়ীখানার দখল তাঁদের ছেড়ে দিয়ে নীচের তলায় রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের পাশাপাশি যে দু'খানা ঘর ছিল তাতেই মায়ে ঝিয়ে কোন প্রকারে মাথা গোঁজবার ঠাঁই ক'রে নিলে। এই অভাব দৈন্যের কষ্ট বয়স্থা মায়ের সহনীয় হ'লেও, সম্পদের কোলে বেড়ে ওঠা মেয়ে রূপার পক্ষে প্রথম প্রথম বড়ই কষ্টদায়ক হ'য়েছিল! যাঁরা ভাড়াটে এলেন তাঁরা প্রসাদপুরের জমীদার। বিস্তৃত জমীদারীর এলাকা ছাড়িয়ে আশপাশের অন্যান্য অন্তর্বিভাগেও তাঁদের ভূসম্পত্তির দখল ছিল। নবীন জমীদার অরুণকুমার মল্লিক পিতার মৃত্যুর পর জমীদারীতে থাকা কিছুদিন আবশ্যক বিবেচনায়, প্রায় মাস ছয় প্রসাদপুরেই ছিল কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকলে তার আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হওয়াই মিথ্যা এই ভেবে সে আবার

কলকাতায় ফিরে আসতে চাইছিল—এতদিন সে আর্ট শিক্ষার জন্য বরাবরই কলকাতার মেসে থেকেছে, তাতে ক'রে মাকে তো এক্‌লা ফেলে আসতে হয়নি—কিন্তু আজ যে তার মা একেবারে একলা—বাবা যে তাঁকে একলা ফেলে চ'লে গেছেন! মাকে এখানে ফেলে তো কলকাতায় যেতে পারে না, তার চেয়ে মাকে নিয়েই সে কলকাতায় যাবে, তারপর পূজা পার্ব্বণের সময় মাকে নিয়ে সে কিছু দিনের জন্যে দেশে আস্‌বে আবার পূজার পর মার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাবে—তা'হলে তার আর্ট শিক্ষারও ক্ষতি হবে না আর মাকেও একলা ফেলে যেতে হবে না।

এই সঙ্কল্পমত অরুণ তার বিধবা জননী দুর্গাবতীকে নিয়ে কলকাতায় চ'লে এলো—আর তাদের সঙ্গে এলেন অরুণের বন্ধু ও শালগ্রাম শিলার পূজারী শ্রীআনন্দকিশোর শর্ম্মা—!

প্রসাদপুরের জমীদার ভবনের কাছেই কুলপুরোহিত আনন্দকিশোরের পিতার ভিটে ছিল—যজমান জমীদারের দয়া ও অনুগ্রহে আনন্দকিশোরের পিতা গ্রামের মধ্যে বেশ একজন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ ব'লেই গণ্য হ'তেন। কিন্তু আনন্দ যখন বালক তখন তাঁরও ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার দিকে, অরুণ কলকাতা থেকে ছুটীর অবকাশে যখন বাড়ী আস্‌তো তখন এই দুই বালক-বন্ধুতে আঁকা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হ'ত, আবার আদান-প্রদানও হ'ত—তারপর অরুণ প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ ক'রে ধ'রে ব'সল সে আর

কিছুতেই কলেজে প'ড়বে না, এবার সে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হবে—ছেলের আব্দার বাপমাকে শুনতেই হ'ল, কারণ তার যখন আঁকাতে ঝোঁক আছে তখন শিখলে ক্ষতিই বা কি আর তাকে তো খেটে খেতে হবে না যে বি-এ, এম-এ, পাশ করার জন্যে মাথা কুট্‌তে হবে। অরুণ চট্ ক'রে আনন্দকিশোরকে গিয়ে এই খবর দিল যে সে এবার আঁকার স্কুলে ভর্ত্তি হ'চ্ছে, আনন্দরও খুব ইচ্ছে হ'চ্ছিল যে সেও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হয় কিন্তু তার পিতা গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে ব'ল্লেন "ব্রাহ্মণের ছেলে পিতৃ-পুরুষের কাজ ছেড়ে ও সব নিয়ে থাক্‌লে চ'লবে না—এখন তোমার কত শাস্ত্র পড়া বাকী রয়েছে তার হুঁস্ আছে ?" পিতার বিনানুমতিতে কথা কইতে আনন্দের সাহস হ'ল না। অরুণ যাবার আগে আনন্দের কাণে কাণে ব'লে গেলো "এবার আমিই তোমায় শেখাবো, আনন্দ। আমি যা শিখে আস্‌বো তোমায় সেইগুলো ছুটীর সময় এসে দেখিয়ে দিয়ে যাবো।" তারপরে আনন্দকিশোর আরো শাস্ত্র প'ড়তে সুরু ক'রলেন আর অরুণ কলকাতার মেসে থেকে ছবির রঙে রঙিন্ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। ইতিমধ্যে আনন্দকিশোর পিতৃহীন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত রোগে আনন্দের সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে গেলো। আনন্দের বিধবা মা স্বামীশোকে একেই কাবু হ'য়ে প'ড়েছিলেন, তারপর ছেলের এই আকস্মিক ব্যায়রামে তাঁকে

আরও বিব্রত ক'রে তুল্লে। ছ'বৎসর রোগ ভোগের পর আনন্দের মা ৺তারকনাথে মানসিক ক'রে ছেলেকে রোগমুক্ত ক'রলেন। কিন্তু রোগে শোকে তাঁর শরীর ও মন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, ছেলে ভাল হবার পর তিনি আর বেশীদিন বাঁচলেন না।

আগে যেমন স্বচ্ছল অবস্থা ছিল পিতৃহীন হওয়ার পর থেকে ও নিজের অতদিন রোগভোগের দরুণ এখন আর তেমন নেই—আনন্দের অনেক ধেনো মাঠ জমা দিতে হ'য়েছিল, তাছাড়া বড় বড় ছ'একটা আম কাঁঠালের বাগানও সে জমা দিয়েছিলো। জমীদার বাড়ীর পূজারী হ'য়ে অবধি তাঁর কাজও অনেক বেড়ে গিয়েছিল সেই জন্যে নিজে নিজে ছবি আঁকার সময় আজকাল তিনি বড় বেশী পেতেন না।

—"ওমা রূপা!"

—"কেন মা?"

—"আর কি ক'রে চ'লবে মা? শেষে কি ভিক্ষে ক'রতে হবে?" শীতের সন্ধ্যা। একতালার ঘর একে স্যাঁৎ সেঁতে তার উপর ঠাণ্ডা। প্রদীপটা উস্কে দিয়ে রূপার মা এই কথা ব'লতে ব'লতে আঁচলে চোখ মুছলেন। রূপা অদূরে ব'সে একখানা ছেঁড়া শাল্ সেলাই ক'রছিল। মার কথার উত্তরে সে বল্লে "এক কাজ ক'রলে হয় না মা? আমি যদি কোথাও ছেলে পড়াই তাহলে তো কিছু টাকা

পাই তাতে কি আমাদের বেশ চলে যাবে না?” মার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, এই অপরিণীতা সুন্দরী যুবতী মেয়েকে চাকরী করতে পাঠান তো সহজ কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকা। তিনি বল্লেন “তা কি হয় মা! তুমি ছেলেমানুষ তোমায় একলাটী ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি কখন?” এমন সময় জমিদার গৃহিণী দুর্গাবতী উপর থেকে রূপাকে ডেকে বল্লেন “রূপা! একবার উপরে এসে শাঁখটা বাজিয়ে দিয়ে যাও তো, ঠাকুরের আরতি হবে।” রূপা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলো। ঠাকুরের আরতি শেষ হ'লে পূজারী আনন্দকিশোর দুর্গাবতীর মুখের কাছে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে তাপ দিলেন, তাঁর পাশে রূপার দিকে তাঁর নজর প'ড়ল, তারও মুখের কাছে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে যেমনি তাপ দিতে যাবেন অমনি সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় তাঁর নজর প'ড়ল মেয়েটীর উচ্ছ্বসিত রূপলাবণ্যের দিকে! যেন একটা জমাট বাঁধা সৌন্দর্য্য! যেন একটা স্বপ্ন দেখা মাধুর্য্যের অপার পারাবার! সেই ঢল ঢল মুখে নীলপদ্মের পাঁপড়ির মত আয়ত চক্ষু দুটী তাঁর দিকেই চেয়েছিল। চোখে চোখে মিলতেই রূপার চক্ষু দুটী আপনিই নেমে প'ড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের ঘন কৃষ্ণ পল্লবদল গোলাপী গালের উপর ছায়া বিস্তার ক'রলে। আনন্দকিশোর ভাবলেন—আহা! কি সুন্দর! কি অপরূপ!

রূপাও ভাবছিল আনন্দকিশোরের ঘনশ্যাম তরুণশ্রীর লালিত্যভরা কান্তির কথা। ঐ শ্যামবর্ণের ভিতর কি ঔজ্জ্বল্য! কি তেজ! কি পবিত্রতা!

গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রূপা তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে—পূজারী আশীর্ব্বাদ ক'রলেন—"সাবিত্রী সমান হও।"

২

"আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায় ?
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায় !"
– কড়ি ও কোমল।

"দেখো রূপা ! আমি আজ তোমার ছবি আঁকবো ! না হাস্‌লে হবে না—সত্যি আঁক্‌বো !" রূপাকে এই কথা ব'লে অরুণ তার সুন্দর সুশ্রী মুখখানি তুলে মার দিকে চাইলে। ছেলের কথায় মাও হেসে ব'ল্লেন "তোর সখের আর অন্ত নেই ! ছবি আঁকা, ছবি আঁকা, ক'রে পাগল ! তা রূপার মায়ের মত হওয়া চাইতো ! তাঁকে আগে জিগেস্ কর !"

দুপ্ দাপ্ ক'রে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে অরুণ হাঁক্ দিয়ে ব'ল্লে "দেখুন, আমি আপনার মেয়ের ছবি যদি আঁকি তাতে আপনার মত আছে ?" এই কথায় কৃতকৃতার্থ হওয়ার ভাব বিধবা তারাদেবীর মুখে ফুটে উঠ্‌লো—গরীবের মেয়ে যদি এত বড়লোকের পছন্দ সই হ'য়ে থাকে—তবে—পরে হয়তো বা— ! আগত সুখের চিন্তাকে জোর ক'রে থামিয়ে রেখে সদ্যস্নাতা তিনি ভিজে কাপড়টা উঠানে মেলতে মেলতে বল্লেন "আমার আবার মত কি

বাবা! তোমাদের হাতেই আমি ওকে দিয়েছি—রূপার ভার তোমার মার হাতে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত! ছবি যদি আঁকো সে ওর ভাগ্য।"

অদূরে লজ্জানত মুখে ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রূপা দাঁড়িয়েছিল, মার কথা শুনে একটুখানি হেসে সে ব'ল্লে "আমার যে অনেক কাজ আছে—রান্না চড়াতে হবে, উনুনে আগুন দিইগে।"

উনুনের গন্‌গনে আগুনের তাপ রূপার মুখের উপর প'ড়েছিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে অরুণ ব'ল্লে "আচ্ছা আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করি এসো—তাহলে শিগ্‌গির হ'য়ে যাবে।"

—"আপনি কি এ কাজ পারেন কখন?"

—"আচ্ছা তুমি অনুমতি দাও, দেখো আমি পারি কি না?"

—"এই তরকারী বানাতে পারবেন? দেখবেন যেন হাত কেটে ফেলবেন না।"

অরুণকে বঁটীতে অনভ্যস্ত হাতে তরকারী বানাতে দেখে রূপার হাসি আর থামে না। রূপার হাসিতে অরুণ ভারী অপ্রস্তুতে প'ড়ে গেলো, তার কাণ দুটো লাল হ'য়ে কপালে ঘাম দেখা দিলে, সে ব'ল্লে "আচ্ছা হাস্‌ছো কেন অত? কাজতো ঠিক হ'চ্ছে—অভ্যাস নেই তাই—" তাদের দুজনকেই কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তারাদেবী এসে

ব'ল্লেন "যাও তোমরা ছবি আঁকগে—আমি রান্না ক'রছি! ছি ছি! রূপা! ওঁকে দিয়ে এইসব কাজ করায়? তোর কি বুদ্ধি মা!"

"আমি কি ক'রব মা? উনি যে শুনলেন না!" অরুণ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো, বঁটী ধরা এত কষ্ট! মেয়েরা কি ক'রে এসব কাজ করে? তারাদেবীর দিকে চেয়ে সে ব'ল্লে—"আজ তো দেরী হ'য়ে গেলো, কাল সকাল আট্‌টার সময় রূপাকে ছেড়ে দিতে হবে, ওকে নিয়ে বোটানিকেল্ গার্ডেনে যাবো। সেখানেই ছবি আঁকা হবে।"

কিছুক্ষণ পরে মায়ের কোলের কাছে ব'সে ৫০ ব্যান্ননে ভাত খেয়ে, রূপোর বাটীতে ঘন দুধে চুমুক দিয়ে ধনীর ছেলে অরুণ, দামী সিগারেটের সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আর্ট স্কুলে চ'লে গেলো।

এধারে দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে ঠাকুর ঘরের সাম্‌নে ব'সে পূজারী আনন্দকিশোর ভাগবৎপাঠ সুরু ক'রলেন। সেখানে সবাই ছিল, ছিল না শুধু রূপা। সে তখন কি কাজে ছাদে গিয়েছিল। ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে চুল শুখোতে শুখোতে সে ভাব্‌ছিল অরুণের কথা—অমন সুন্দর সুশ্রী বিদ্বান ছেলে, তার উপর আবার ধনী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই! রূপাদের মত দরিদ্রের সঙ্গেও তার কি অমায়িক মধুর ব্যবহার! এত উদার মন,

এমন দয়ার প্রাণ, যে ধনীদের হয় তা সে জান্‌তো না, তার মা শুদ্ধ অবাক্ হ'য়ে গেছেন অরুণদের উদারতায়। তার উপর তাদের দুঃস্থ অসহায় জেনে এঁরা যে উপকার করেছেন, তার তুলনা নেই। নইলে আজকে তো মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষে ক'রতে হ'ত। রূপার মা ওঁদের ঘরে খান্ না তাই চাল ডাল কাঁচা তরকারী এঁরাই রোজ পাঠিয়ে দেন্ আর রূপা তো ওঁদের ঘরেই খায়, কত রকম ভালো ভালো খাবার দুর্গাবতী নিজে হাতে ক'রে তাকে খাওয়ান। এর বিনিময়ে কতটুকু কাজই বা তারা করে? ঠাকুর ঘরের পূজোর কিছু কিছু কাজ আর সংসারের এটা ওটা সেটা মায়ে ঝিয়ে ক'রে দেয় বটে, তাও দুর্গাবতী ক'রতে দিতে নারাজ, বলেন এত চাকর দাসী থাকতে তোমরা কেন ক'রবে? এঁদের ঋণ কি ক'রে শোধ করা যায়? ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লে আনন্দকিশোর ছাদে এসেছেন কাপড় তুলতে। মেঘের মতন কালো চুল এলান রূপার পিঠের দিকে চেয়ে তিনি ব'ল্লেন "এই যে রূপা চুল শুখোনো হ'চ্ছে? তুমি আজ ভাগবৎ শুনলে না?"

—"না ঠাকুর মশায়! বড্ড শীত ক'রছিল খেয়ে দেয়ে তাই ছাদে এলুম।" ঠাকুর মশায় রূপার আরো কাছে এসে ব'ল্লেন "অরুণ বাবু তোমায় কি ব'লছিলেন আজ?" তবে পূজারীও ছবি আঁকবার কথা শুনেছেন—কি লজ্জা! রূপা ব'ল্লে "তিনি ছবি আঁকেন কিনা তাই ব'লছিলেন।"

"তোমার ছবি আঁকতে কাল বোটানিকেল গার্ডেনে যাবেন বুঝি তোমায় নিয়ে ?"

—"হ্যাঁ" আনন্দকিশোরের মুখে যেন বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আস্‌ছিল বেশ গম্ভীর হ'য়েই তিনি ব'ল্লেন, "সকাল সন্ধ্যায় একটু আধটু উপাসনা ক'রলে হয় না ?—তুমি তো আর এখন স্কুলে যাচ্ছ না—একটা কিছু সৎ বিষয়ে মনকে লাগিয়ে রাখা ভালো।" এর উত্তরে রূপা ব'ল্লে "ওসব চর্চ্চা তো কখন করিনি আর জানিও না: তা ছাড়া অরুণ বাবুর খেয়াল হ'য়েছে ছবি আঁকার। এখন আর—"

দ্বিধা না ক'রে আনন্দ ব'ল্লেন "আমার মতে অরুণ বাবুর সঙ্গে তোমার বেশী মেলা মেশা না করাই ভালো।" এ কথায় রূপার মুখের ভাব বিস্ময়ে ও কৌতুহলে ভ'রে উঠ্‌লো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে ব'ল্লে "আমি কি ক'রব বলুন, তিনি আমাকে উপরে ডেকে আনেন।"

বিকেলে ঠাকুর ঘরের সাম্‌নে রূপা সন্ধ্যারতির পঞ্চ প্রদীপ সাজাচ্ছিল আর পূজারী ঠাকুর স্তব পাঠ ক'রতে ক'রতে ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা গাঁথছিলেন। স্তব পাঠের সুললিত মধুর সুর রূপা অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছিল। কি সুন্দর! স্তব পাঠ শেষ হ'লে রূপা বল্লে "আপনি কি সুন্দর স্তব পাঠ করেন, ঠিক গানের মত! কি চমৎকার আপনার গলা! শুনতে শুনতে আপনিই যেন ভক্তিতে

মন ভিজে ওঠে।” আনন্দকিশোর মুখ নীচু ক’রেই ব’ল্লেন “তুমি শিখ্‌বে ?”

—“আমি কি পারবো ?”

—“কেন পারবে না ? রোজ আমার সঙ্গে পাঠ ক’রো তা হলেই শিখে ফেল্‌বে। আর কিছু করো আর না করো ঠাকুরের নাম গান ক’রতে ক’রতেও মন পবিত্র হয়।” এমন এক এক জন লোক আছেন যাঁরা অলক্ষিতে লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা রাখেন। এই যে আনন্দকিশোর লোকটী ইনি কিছুদিনের মধ্যেই রূপার মানসিক গতির ধারা এমন ভাবে বদলে দিচ্ছিলেন যা সম্পূর্ণ অতর্কিত এবং অনায়াস। তিনি যে কথা ব’লতেন তা দু’একটী হলেও রূপাকে বাধ্য হ’য়েই যেন তার অনুষ্ঠান ক’রে যেতে হ’ত, এবং স্বাভাবিক একটা আকর্ষণে আনন্দকিশোরের কথাগুলি মেনে চলবার তার একটা প্রবল ইচ্ছা হ’ত যাকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না।

৩

"আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ হেন বিরাগ ভরা বিবেকে !"

—মানসী।

"ঈশ্বরের উপর ভক্তি কিসে হয় ?"

"তাঁকে খুব ভালবাসবার মত ইচ্ছা দরকার। পূর্ব্বজন্মের পূণ্য না থাক্‌লে তা হয় না।"

"আচ্ছা, আপনি এত অল্প বয়েসে কি ক'রে এত ঈশ্বরকে ভালবাসলেন ?"

"দুঃখ কষ্ট পেলেই মানুষ তাঁকে ভালবাসে !"

—"আপনার কি খুব দুঃখ কষ্ট হ'য়েছিল ?"

—"হ্যাঁ আমার যখন ১৬ বছর বয়েস তখন পক্ষাঘাতে শরীরের একদিক একেবারে অবশ হ'য়ে গিয়েছিল তখন যে কি কষ্ট পেয়েছি—প্রায় ২।৩ বৎসর তাতেই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল। সে সময় এক ঈশ্বরকে ডাকা ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি ছিল না—আর ছিল শুধু মায়ের স্নেহ ! তিনি আমার জন্যে দিনরাত ভগবান্‌কে ডাক্‌তেন যাতে আমার রোগ সেরে যায়। শেষে ৺ তারকনাথে মানসিক ক'রেছিলেন, সেখান থেকে ওষুধ এনে খাওয়ালেন, তারপরে আস্তে আস্তে ভালো হ'লুম। তখন আমার ১৯।২০ বছর বয়েস। তারপরের বছরেই মা মারা গেলেন। এই

৮ বছর হ'ল তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে। আমায় সুস্থ না দেখে মা যেতে পারেননি, তাঁর রুগ্ন ছেলের ভার কে নেবে সেই জন্যে।"

তরুণ পূজারীর তুই চক্ষু মায়ের শোকে জলভারে নুয়ে প'ড়ল। রূপার বুকখানা সহানুভূতির ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠেছিল। আহা! এনারও কি আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে? চোখ মুছে সে ব'ল্লে—"আপনার বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

—"না।"

ঠিক্ সেই সময় অরুণের জরীর লপেটা সিঁড়ির উপর দেখা গেলো; তার প্রসাধন কৃত বেশবিন্যাস ও সুগৌর মুখখানা নজরে প'ড়তেই আনন্দকিশোর ও রূপা একটু যেন সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ে সেইদিকে চেয়ে দেখ্লে। অরুণের কিন্তু এটা মোটেই ভালো লাগ্লো না। পূজারীর সাম্নে ব'সে ব'সে রূপার কাজ করার কি দরকার? রূপার যে এই নিখুঁত রূপ, তার রস, তার মাধুর্য্য শিল্পীর মন নিয়ে সে যা বুঝবে সে যা উপভোগ ক'রবে আর কেউ তা পারবেও না, বুঝবেও না। শিল্পীর রঙ মাখা অন্তর নিয়ে সে যে ক্ষণে ক্ষণে রূপার হাজার রূপ হাজারভাবে হাজার রঙে, আলোছায়ার কাঁপনে কাঁপনে দেখতে পাচ্ছে—এ কি সাধারণ মন নিয়ে আর কেউ পারবে কখন? কিছুতেই না। রূপার দিকে ইচ্ছে ক'রেই না চেয়ে মার উদ্দেশ্যে অরুণ

ব'ল্লে—"আচ্ছা, মা, রূপাকে দিয়ে তুমি শুধু শুধু এত কাজ করাও কেন বলতো ?

এই বিকেল বেলা একটু ছাদে বেড়ালে বা গাড়ী ক'রে বেড়াতে গেলে হয়। নইলে দিনরাত ঘরের ভিতর কাজ ক'রে ক'রে ওর শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে যে।"

আনন্দকিশোর চোখ তুলে রূপার দিকে চাইলেন, তাঁর নির্ব্বাক্ মুখের দিকে চেয়ে রূপা নিজে থেকেই বলে উঠলো "না না ঠাকুরের কাজ করতে আমার ভাল লাগে তাই করি, মাতো আমায় করতে বলেন নি।" অরুণের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো, রূপার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে সে বল্লে, "সেটাও ঠাকুরের কাজ—ছাদে বেড়ালে শরীরেরই সেবা করা হয়—শরীর হল দেবতার মন্দির।"

দুর্গাবতী ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের জন্যে খাবার জায়গা করতে আদেশ দিলেন। দাসীরা আসন পেতে উপাদেয় খাবার সাজিয়ে দিলে, দুর্গাবতী বারাণ্ডা থেকে ঝুঁকে বল্লেন, "ও তারা দিদি! তুমি যে নিজে হাতে অরুণের জন্যে খাবার করে রেখেছ এনে দাও ভাই, সে খেতে বসেছে।" —"যাই দিদি যাই; ও রূপা একবার নেমে আয় তো।" রূপার মা ও রূপা নিজে হাতে যখন থালায় সাজিয়ে জলখাবার, বাটীতে ক্ষীর, পিঠে ইত্যাদি অরুণের সামনে সযত্নে ধ'রে দিলে তখন রূপার উপর যে বিরক্তির ভাবটা একটু আগেই অরুণের

মনকে পীড়া দিচ্ছিল সেটা একেবারেই নিশ্চিন্তরূপে মুছে যাওয়াতে সে সরলভাবে বল্লে, "মনে আছে তো? কাল সকাল আটটায় আমার সঙ্গে বোটানিকেল গার্ডেন?" রূপা কোন উত্তরই দিলে না, লজ্জায় সে চোখ তুলতেও পার্‌লে না। অরুণ মার দিকে চেয়ে আবার বল্লে, "তোমার যে ভালো ভালো গয়না আছে, তাই ওকে পরিয়ে দিও মা! আর তোমার আল্‌মারিটা একবার খোলো আমি একখানা কাপড় বেছে দিয়ে যাই, সেইটা ওকে পর্‌তে দিও। দুর্গাবতী সহাস্যে বল্লেন, "আমি তো এখানে বেশী কিছু আনিনি, তবে তোর বৌ দেখবো ব'লে যা' দু'চারখান গয়না কাপড় এনেছি—তাই থেকে তুই বেছে দিস্ রূপার জন্যে—"

নীচে নেমে গিয়ে নিজের ঘরে মা কালীর ছবির সাম্‌নে গলবস্ত্রে প্রণাম করে তারাদেবী আনন্দাশ্রু আঁচলে মুছলেন— "মা জগদম্বা! তোমার কৃপায় অনাথা মেয়ের আমার যে একটা কিনারা হ'য়ে গেলো এ দেখে যে যেতে পাচ্ছি একি তোর কম দয়া মা!"

৪

শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলায়ে গেছে দুটী রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটী সূর্য্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটী চরণের ছায়!

—কড়ি ও কোমল

ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো একটা ফুলফোটা অশোক গাছের নীচে রেখে, জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে অরুণ ব'ল্লে, "এসো রূপা!" ছবি আঁকার নামে বাড়ীতে রূপার যতটা লজ্জা হ'ত এখানে এই নির্জ্জন নিরাবিলে অরুণের ভাবুক চক্ষের সাম্‌নে ততটা হ'ল না। সে বেশ সপ্রস্তুত ভাবেই অরুণের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে।

"এই অশোক গাছের গায়ে এমনি ভাবে দাঁড়াতে হবে।" রূপা তাই করলে।

"আচ্ছা, এবার একটু হেসে গাছের দিকে মুখ তুলে চাও, হ্যাঁ হ'য়েছে। সাড়ীর আঁচলটা পিঠ থেকে নামিয়ে দাও তো একটু—তাবিজের ঝুম্‌কোটা একটু এদিকে ক'রে দাও। এইবার মাথাটা একটু এদিকে হেলিয়ে ডান হাত দুটী গালে দাও, আর বাঁ হাতখানি কোমরে—উঁহু, ঠিক্ হ'চ্ছে না, বড় আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছ, বেশ সহজ থাকো।"

ছবি আঁকা সুরু হ'য়ে গেলো। নিবিষ্ট চিত্তে অরুণ

এঁকে চ'লেছে, তার তখন হুঁস ছিল না ব'ল্লেই হয়—তার মানসী প্রতিমা ছবিতে যতই জীবন্ত হ'য়ে উঠছিল ততই তার মুখে প্রফুল্লতার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। আর একটু—আর একটু হ'লেই রেখাগুলি সম্পূর্ণ হয়—রূপা তার হাত ও পায়ের ভঙ্গি ভুলে অন্য রকম ক'রে ফেল্লে—"আহা হা! কি ক'রলে রূপা, হাত পায়ের ভঙ্গি নষ্ট ক'রে ফেল্লে—আর একটু হ'লেই হ'য়ে যেতো। ঠিক্ আবার তেমনি ক'রে দাঁড়াও—ঠিক্ তেমনি।" রূপা বল্লে—"ঠিক্ তেমনটি হ'চ্ছে না যে"—"আচ্ছা তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে নিজে হাতে তোমায় ঠিক্ তেমনি ক'রে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।"

"তা—তা—বেশ তো দিন্ না—" অরুণ দু'হাতে ধ'রে রূপার মাথাটী তেমনি ক'রে একটু কাত্ ক'রে মুখের উপরের চুলগুলি সরিয়ে দিলে, খোঁপার ফুলগুলি টীপে বসিয়ে কোমরে দেওয়া হাতের আঙ্গুলগুলি ঠিক ক'রে দিলে। অরুণের স্পর্শে রূপার হৃদয়ে কেমন একটী অজানা লজ্জার শিহরণ ব'য়ে গেলো—তাতে তার গাল দুটী রক্ত পদ্মের মত লাল হ'য়ে উঠ্লো। সে বুঝছিল এটা ঠিক্ হ'চ্ছে না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে—বিশেষতঃ উপকারীর প্রতি পাছে অবজ্ঞা দেখান হয় এই ভয়ে সে মুখ খুলতে পারলে না। শেষে রূপার আল্তা-পরা রাঙা টুক্টুকে বাঁ পা-খানি হাতে ক'রে সরিয়ে দিতেই রূপা চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্লো

"করেন কি! পায়ে হাত দেবেন না।"—"তাতে দোষ কি রূপা! কাজের গতিকে কত সময় কত কি ক'রতে হয়—আর ওটা একটা সংস্কার বইতো না—নইলে মাথাটাও যা, পাটাও তাই তফাৎ কিছুই নেই।" এইবার দূরে দাঁড়িয়ে রূপার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে অরুণ ব'ল্লে—"এই ঠিক্ হ'য়েছে আর ন'ড়ো না যেন—"অরুণ আবার আঁক্‌তে ব'সলো তার সমস্ত মন তখন ছবির রেখায় রেখায় ডুবে গিয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যদিও রূপার দিকেই নিবদ্ধ ছিল তবুও রূপার চোখ দুটী যে কখন অশ্রুজলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠেছে তা অরুণ মোটেই লক্ষ্য করেনি। ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলো সাফল্যের তৃপ্তিতে হাতের তুলিটা কাণে গুঁজে নবীন শিল্পী ব'লে উঠ্‌লো, "এত ভালো আদর্শ তুমি হ'তে পারবে তা আমি কখনও ভাবিনি—ছবি আঁকার নামে এমনি লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছিলে কাজের সময় যে এমন চমৎকার——"

অরুণের কথা অসমাপ্ত থেকে গেলো, আশ্চর্য্য হ'য়ে সে ব'লে ফেল্লে—"একি রূপা কাঁদ্‌ছ তুমি?"—"না না চোখে কি প'ড়লো—তাই।"

—"সত্যি তো? কান্না নয়?"

—"আপনি কি পাগল হ'লেন অরুণবাবু? কাঁদ্‌বো কিসের জন্যে?"

ফুলে ফুলময় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে অরুণ ব'ল্লে

"তোমায় এই বসন্ত রাজ্যের অগাধ ফুলের মধ্যে ঠিক্ ফুলরাণীর মতই দেখাচ্ছে রূপা !"

—"একটু হেসে রূপা ব'ল্লে—"ফুলরাণী নয় ফুলরেণু !"

খানিকক্ষণ বাগানে বেড়াবার পর যখন তারা মোটারে গিয়ে উঠলো তখন দ্বিপ্রহর উত্‌রে গেছে। সঙ্গে খাবার ছিল, প্লেটে গুছিয়ে রূপা ব'ল্লে, "আগে খান্ তারপরে স্বভাবের শোভা দেখ্‌বেন।"

অরুণ ব'ল্লে—"আমার চেয়েও তুমি বেশী শ্রান্ত হ'য়েছ। অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—তুমি আগে খাও তারপরে আমি—" ব'লেই সে খানিকটা লুচিতে তরকারী দিয়ে রূপার মুখের ভিতর দিতে গেলো, তার উদ্যত হাতখানা সরিয়ে দিয়ে লজ্জা ও ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে রূপা তার মুখটা চট্ ক'রে সরিয়ে নিয়ে ব'ল্লে "কি করেন অরুণ বাবু! আপনার কি কোন কাণ্ড জ্ঞান নেই? এই খোলা গাড়ীতে এ রকম দেখলে লোকে কি ভাব্‌বে বলুন তো? আমাকে লোকে তাই ভাবে আপনার কি তাই ইচ্ছে?" কথাটা বেশ তীক্ষ্ণ স্বরেই বলা হ'য়েছিল—ব'লে ফেলেই রূপা ভাব্‌লে এতটা বলা হয় তো ভালো হয়নি কিন্তু রাগের মাথায় সে ব'লে ফেলেছে যখন তখন তো আর উপায় নেই।

নিজের এই সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস যে এতটা অসংযমকে প্রশ্রয় দিতে পারে যাতে ক'রে ভদ্র নারীকে লোকে হেয় স্ত্রীলোক ভেবে নেবার নমুনা পাবে এতটা সুদূর চিন্তা

অরুণের অপরিণামদর্শী তরল চিত্ত ভেবে উঠতে পারেনি। লজ্জায় তার মাথাটা যেন কাটা যাচ্ছিল; সে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্লে—"আমায় ক্ষমা করো রূপা! আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে এটা রাস্তা! আর এতটাও ভাব্‌তে পারিনি যে এর থেকে লোকে এতটা খারাপ টেনে আন্‌তে পারে।"

—"যাক্‌ সে হ'য়ে গেছে, এখন আপনি ভালো ক'রে খান্—" কিন্তু সহসা অরুণের ক্ষুধার উদ্রেক একেবারে নিভে গেলো দেখে তাকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টায় রূপা ব'ল্লে—"আচ্ছা যে ছবিটা এখন আঁক্‌লেন তার কি নাম দিলেন বলুন তো?"

এতক্ষণে অরুণের পূর্ব্ব উৎসাহ আবার যেন ফিরে এলো। সে দুইখানা লুচি এক সঙ্গেই মুখে পুরতে পুরতে ব'ল্লে—"নাম যে আগে থেকেই ঠিক্ ক'রে এসেছি। এর নাম "দোহদ দান!" আগেকার রাণীরা অশোকের ফুল ফুটতে দেরী হ'লে খুব সেজে-গুজে গাছের গায়ে পা' দিয়ে একটী ঠেলা মারতেন; তার পরেই নাকি অশোকের ফুল ফুট্‌তো। তুমি যখন গাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তখন তোমায় কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল। মাধুর্য্য যখন ভাবের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তার সৌন্দর্য্য দশগুণ বেড়ে ওঠে—সবাই তা দেখে না—দেখলেও বোঝে না—শিল্পীর চোখ আর সাধারণের চোখে অনেক প্রভেদ!"

জাননা কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর,
জাননা কি সংসারের পাথার অকূল,
জাননা কি জীবনের পথ অন্ধকার !
আপনি ফুটেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়,
সাধ ক'রে কে আজিরে হবে পথহারা
সাধ ক'রে এ কুসুম কে দলিবে পায় ?
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেলো শ্বাস !
যারে ভালোবাসো তারে করিছ বিনাশ ?

—চয়নিকা

"দেখো রূপা শরীরের সৌন্দর্য্য আপাতঃ মনোহর হ'তে পারে কিন্তু তার কোন স্থায়িত্ব নেই। প্রথমতঃ রোগে শোকে বার্দ্ধক্যে রূপ নষ্ট হ'য়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর সঙ্গে এই দেহ চিতাভস্মে পরিণত হয়। কিন্তু প্রাণের সৌন্দর্য্য কখনও নষ্ট হয় না, তার ফল চিরস্থায়ী ; জন্মে জন্মে মানুষের কর্ম্মের উচ্চতা অনুসারে চির আনন্দ নিলয়ে পৌঁছে দিতে পারে। তাই জন্যে শরীরের সৌন্দর্য্য বাড়াতে গিয়ে প্রাণের সৌন্দর্য্য যেন নষ্ট না হয়, এ দিকে লক্ষ্য রাখা মানুষের খুব উচিৎ।" ব'লেই আনন্দকিশোর রূপার হাত থেকে নৈবেদ্যের থালাখানি তুলে নিলেন। রূপা ব'ল্লে—

"কিন্তু এক সঙ্গেই ছু'টো হয় কি ক'রে বলুন? এত বেশী শরীরের সাজ-গোজ নিয়ে থাকতে গেলে অন্য দিকে নজর দেবারই সময় হয় না।"

—"অত নাই ক'রলে?"

—"আমি কি ইচ্ছে ক'রে করি—মা বলেন, অরুণ বাবু যা বলেন তা করা উচিৎ। তাঁরা আমাদের অনেক উপকার ক'রেছেন।"

সেই সময় অরুণ প্রাতঃভ্রমণে বার হ'চ্ছিল। এত সকালে রূপাকে আবার সেই পূজার ঘরের সাম্‌নে পূজারীর সঙ্গে কথা নিরত দেখে তার মনটা বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। সে ব'ল্লে—"সকাল বেলা এখানে কি হ'চ্ছে রূপা? আমি ৮টার মধ্যেই ফিরে আস্‌বো ইতিমধ্যে তুমি তৈরি হ'য়ে থেকো।" অরুণের আজ্ঞা পালন ক'রতে রূপা তখনি উঠে যাচ্ছিল—মিনতিপূর্ণ স্বরে আনন্দকিশোর ব'ল্লেন—"চ'ল্লে রূপা?"

—"হ্যাঁ যাই নইলে আবার দেরী হ'য়ে যাবে।"

—"এই ফুলের মালা ছড়া গেঁথে দিয়ে যাবে না?

এই লোকটীর কথা এড়ান এত শক্ত—রূপাকে বাধ্য হ'য়েই ব'লতে হ'ল, "আচ্ছা আমি ফিরে এসে গেঁথে দেবো, এখনো তো আরতির দেরী আছে।"

সাজ-গোজ আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ ক'রে ৮টার আগেই রূপা আবার ঠাকুরের মালা গাঁথতে ব'সে গেলো।

চন্দন পিঁড়িটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে পূজারী বল্লেন, "নাও চন্দনটা ঘসে দাও তো, ঠাকুরের অঙ্গরাগটা সেরেনি।" পূজারী গুণ্ গুণ্ ক'রে হবিনাম ক'রছিলেন, চন্দন ঘস্‌তে ঘস্‌তে রূপা ব'ল্লে, "একটু জোরে জোরে বলুন না ঠাকুর মশায়! আপনার গান শুনতে আমার যে বড় ভালো লাগে।"

—"তুমি যদি আমার সঙ্গে সে গানে যোগ দাও তবেই ব'লব, না হ'লে নয়।"

আনন্দকিশোরের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। চন্দনের বাটিটা তাঁর কাছে এগিয়ে দিয়ে রূপা ব'ল্লে, "আমি যে পারবো না—নইলে আপনার সঙ্গে যোগ দিতুম।"

—"তুমি অমন সুন্দর গাইতে জানো, বাজাতে জানো আর এই সামান্য স্তব পাঠ ক'রতে পার্‌বে না ?"

—অভ্যাস নেই যে—তোমার মত ভালো হবে না।" ব'লেই তাড়াতাড়ি জিভ্ কেটে রূপা ব'ল্লে "আপনাকে ভুলে 'তুমি' ব'লে ফেলেছি তার জন্যে—"

—"তার জন্যে আবার কি ? আমাদের মধ্যে অত লৌকিকতার কিছু দরকার নেই। তুমি যদি আমায় "তুমি" না বলো তা'হলে আজ থেকে আমিও তোমায় "আপনি" ব'লব।"

—"আপনি আমায় কখনই আপনি ব'লতে পারেন না, আমি যে আপনার চেয়ে ছোট।"

—"ছোট হ'লেই যে আপনি বলা যায় না তা তো নয়।

এই দেখো না এমন অনেক চাকর দাসী আছে যারা বয়েসে বৃদ্ধ—কিন্তু ৫ বছরের মনিবের ছেলেকেও আপনি বলে। আমিও তো এক রকম ধ'রতে গেলে তোমাদের চাকর, আমারও তোমাদের আপনি বলা উচিৎ।"

—"দেখুন ফের আপনি ওরকম ব'ল্লে আমি এখনি উঠে চ'লে যাবো কিন্তু। কি অন্যায়! আমার সঙ্গে অরুণ বাবুদের কি সম্বন্ধ বলুন, যে আমার চাকর আপনি হ'তে যাবেন?"

"আচ্ছা আর আপনি ব'লব না, আপনি আমায় মাপ করুন।

"আবার "আপনি" ব'লছেন—যান্ আপনি কিন্তু ভয়ানক—"

"ভয়ানক দুষ্টু, এই তো? কিন্তু আপনিও তো বড় কম নয়—আপনার দুষ্টুমীর চিহ্ন এই দেখুন আমার গালে চন্দনের ছিঁটে লাগিয়ে দিলে। যেই যান আপনি ভয়ানক" বলে হাত ঝাড়লে অমনি হাত ঝাড়া চন্দন আমার গালে এসে লেগে গেলো।"

—"বাবারে! এত হাসাতে পারেন আপনি" ব'লে রূপা তো হেসে কুটী কুটী, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকিশোরও হেসে ফেল্লেন।

"আর আপনাকে আপনি ব'লব না।"

আনন্দকিশোরও গলাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে ব'ল্লেন, "এবার

তাহলে লক্ষ্মী মেয়ে কেমন? আমার সঙ্গে স্তব পাঠ করো দিকিন—এই নাও তোমার জন্যে আমি কাগজে লিখে রেখেছি।”

—“ভুল হ’লে তুমি রাগ ক’রবে না?”

—“রাগ কেন ক’রব রূপা? তোমার সমস্ত ভুল যে আমার কাছে সমস্ত ঠিক্।” সুমধুর গম্ভীর সুরে আনন্দ-কিশোর স্তব গান আরম্ভ ক’রলেন। রূপাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিন্তু খুব আস্তে তার ভয় হচ্ছিল পাছে বেসুরো হ’য়ে যায়।

—হে দেব হে দয়িত হে জগদেকো বন্ধো
হে কৃষ্ট হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো
হে রাম হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃর্শোমে

“রূপা!” উজ্জ্বল শারদ প্রভাতে সহসা বর্ষামেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিবীড়তা যেমন অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে অরুণের ক্রোধে কাঁপা গলায় এই তরুণ তরুণীর স্তব গান মুখরিত শান্ত হাস্যদীপ্ত মুখ দুটীও তেমনি ত্রস্ত শঙ্কায় ও স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে নীরব হ’য়ে গেলো। একটু পরে অরুণ আবার বল্লে “আনন্দকিশোরের বিদ্যা যে দিন দিন বাড়ছে দেখছি।”

আনন্দকিশোর হেঁটমুখ, নিরুত্তর। রূপা কিন্তু চুপ ক’রে রইল না, সে আস্তে আস্তে ব’ল্লে, “উনি খুব সুন্দর গান করেন।” অরুণ এরি মধ্যে রাগটা দমন ক’রে ফেলেছিল—

মুখে হাসি দেখাবার চেষ্টা ক'রে সে ব'ল্লে "তা করুন! কিন্তু আমি চাই না যে তুমি বাজে কাজে সময় নষ্ট করো।" রূপা এর কোন উত্তর দিলে না। অরুণ ব'ল্লে, "আমার আঁকবার ঘরে এসো।"

৬

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া
যৌবন ভরা বাহু পাশে তার বেষ্টন করে কায়া !

—মানসী

প্রচুর আলোর জন্যে অরুণের আঁকবার ঘরখানির চারিদিকে কাঁচের দরজা। প্রশস্ততায়ও সেখানি সব চেয়ে বড় ছিল। ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে আঁকবার বোর্ড, বসবার টুল, তু'একটী টিপয়, তাতে রং তুলি প্রভৃতি আঁকবার সরঞ্জাম, আর একটী ছোট্ট হাতীর দাঁতের টেবিলে ফুলের তোড়া। মাঝখানে রঙিন কাজকরা মসলন্দ "মাঁত্বরী" ও তারই তাকিয়া আর তার চারদিকে ফুটন্ত পদ্মের বেষ্টনী। দেওয়ালের গায়ে অরুণেরই হাতে আঁকা নানা ভাবের নানা রূপের রমণী মূর্ত্তি! শ্বেত মার্ব্বল পাথরের জাফরী কাজকরা একটী সিংহাসন ঘরের এক কোণে রাখা ছিল, তার উপর একটী সুন্দরী রমণীর নগ্ন চিত্র! ঘরে ঢুকেই রূপার মনে হ'ল সে যেন কোন একটা গল্পেয় পড়া বেগমদের বিহার কক্ষের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখে সে ব'ল্লে "এ সব ছবি আপনার আঁকা ?"

"হ্যাঁ, কেমন হ'য়েছে ?"

"ভারী সুন্দর !"

"আজ যে ছবি আঁক্‌বো তার একটার নাম "ফুলরাণী"।

ঐ পদ্মের ভিতর থেকে তোমার মুখখানি আধ আধ ভাবে দেখা যাবে। আর একটার নাম হবে "শূন্য সিংহাসন"। ঐ পাথরের সিংহাসনে মাথা রেখে তুমি যেন শোকে বিহ্বল হ'য়ে লুটীয়ে প'ড়েছ, তোমার হাত দুটী ছড়ান ওর উপর, আর শরীরটা মাটীতে লুটোচ্ছে, মুখ চোখ হাহাকার ভরা, রুক্ষ চুলগুলি আলুথালুভাবে পিঠের উপর ছড়ান। এই ভাবে তোমায় থাক্‌তে হবে বুঝলে ?"

ছবি আঁকা সুরু হয়ে গেলো। রূপার সর্ব্বাঙ্গে ভাবের অভিব্যক্তি এমন ভাবে ফুটে উঠেছিল যাতে ক'রে অরুণ তার আদর্শকে মনে মনে বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পারলে না। খানিক পরে অরুণ ব'ল্লে "আজ এই অবধি থাক্, কাল আবার হবে, তুমি আজ ক্লান্ত হ'য়ে গিয়েছ।" রূপা উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে জিগেস্ ক'রলে "আচ্ছা যাঁদের ছবি এঁকেছেন এঁরা কি সবাই আপনার আত্মীয় ?" অরুণের সুন্দর মুখে একটু হাসি দেখা দিল, সুবিন্যস্ত চুলগুলিতে একবার হাত দিয়ে ঘাড় নেড়ে সে ব'ল্লে "আপনার কেন হ'তে যাবে ?"

—"তবে আপনি চিন্‌লেন কি ক'রে ?"

—"তুমিও তো আমার আত্মীয় কেউ নও, তবে তোমাকেই বা কি ক'রে চিন্‌লুম ?"

—"সেটা তো হঠাৎ একটা কারণ বশতঃ চেনা পরিচয় হ'য়েছে। ধরুন এ বাড়ী যদি ভাড়া দেওয়া না হ'ত

আমাদের যদি দুরবস্থায় প'ড়তে না হ'ত তাহ'লে কি আর আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ত ?"

—"এ সব মেয়েদের ছবি আঁকবার জন্যে পাওয়া যায়। এদের যতক্ষণ ব'লবে ততক্ষণ এরা যে কোন ভাবে Pose ক'রে ব'সে থাকে তারপরে তাদের অবশ্য পারিশ্রমিক দিতে হয়।"

—"তারপরে ?"

—"তারপরে আর কি ? তাদের রূপ যৌবন এইটুকুই শিল্পীর দরকার, তারপরে আর কোনো দরকার তো নেই।"

—"তারা তাহলে কখনই ভদ্রমহিলা নয়—"রূপা আর ব'লতে পারলে না, লজ্জায় তার মাথাটা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবার যোগাড় হ'য়েছিল। এ সব প্রসঙ্গই বা ওঠে কেন ? অরুণ কিন্তু এর উত্তরে একটুও লজ্জা না ক'রে স্পষ্ট ব'ল্লে "নিশ্চয়ই তাই। নইলে কোন্ ভদ্রমহিলা কখন অপর পুরুষের কাছ থেকে ছবি আঁকার জন্যে পয়সা নেয় ? এটা তো তোমার আগে থেকেই বোঝা উচিৎ ছিল রূপা !"

—"তা—তাহ'লে আপনি সে শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে অবাধে—"

—"মেশেন, এই তো ? তা কাজের জন্যে মিশ্‌তে হয় বই কি, তাছাড়া তো উপায় নেই। আমার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ শুধু তাদের রূপ যৌবন ও সৌন্দর্য্যের পসরা নিয়ে,

তা ছাড়া আর কিছুর সম্বন্ধই নেই। সাধারণ লোকের চক্ষু এটাকে লালসা কামনার দিক্ দিয়ে দেখে শিল্পীকে রূপোন্মত্ত বা চরিত্রহীন মনে ক'রতে পারে কিন্তু শিল্পী তার অনেক উর্দ্ধে, অনেক তফাতে আছে ; সাধারণের স্থূল দৃষ্টি তা ধারণা ক'রতে পারে না।" রূপা এর উত্তরে কিছু না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অরুণ তাকে ডেকে ব'ল্লে—"আমাকে অপদার্থ ভেবে চ'লে যাচ্ছ রূপা ?"

—"না—না আমার কাজ হ'য়ে গেছে, তাই যাচ্ছি।"

—"আচ্ছা! দরজাটা বন্ধ ক'রে যেও। আর ব'লে দিও সবাইকে আমায় যেন কেউ বিরক্ত না করে, আমি কাজটা সেরে নি।"

রূপা চ'লে গেলো। অরুণ বেশ নিবিষ্ট মনে ছবি আঁক্‌তে সুরু ক'রে দিলে, এই যে এতক্ষণ একটী তরুণী তার চরিত্রের উপর সংশয়িত অন্তরে তাকে প্রশ্ন ক'রে চলে গেলো, তার অপ্রীতি ভাজন যাতে না হ'তে হয় তার জন্য কোন-রূপ প্রয়াস বা তার সন্দেহের কারণ প্রকাশ পাওয়ায় মনের মধ্যে কোনো রকম অশান্তি এতটুকুও ছিল না। একবার মনে হ'ল বটে রূপা হয় তো তাকে আর পচ্ছন্দ ক'রবে না কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তাতে তার বিশেষ কি এসেই বা যাবে ?

—পৃথিবীতে অনেক সুন্দরী মিল্‌বে! তার কারও উপর এ পর্য্যন্ত এমন কিছু আসক্তি হয়নি যাতে ক'রে কাউকে

নইলে তার চলে না। যেখানে যেটুকু সুন্দর সেইটুকুই সে সেখান থেকে নিতে প্রস্তুত—তার পরে কারও সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।

———

৭

"কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে বলে না কেহ।
ফুলের মালা গাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে করে না স্নেহ।"

—কল্পনা

অতি কষ্টে চোখের জল রোধ ক'রে রূপা একেবারে বাড়ীর পেছন দিকের পরিত্যক্ত বারাণ্ডাটীতে গিয়ে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে আকুলভাবে কাঁদতে লাগ্‌লো। তার বুকের ভিতর কে যেন খুব জোরে কাঁটা ফুঁটিয়ে দিয়েছে, এমনি একটা জ্বালায় তার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানছিল না। তার মনে হ'চ্ছিল নারীর মান, মর্য্যাদা যার কাছে, রমণীর আর সব সম্পদ তুচ্ছ সেই শ্রদ্ধা সম্মানের ডালা সে যেন উজাড় ক'রে কার পায়ের তলায় না বুঝে ঢেলে দিয়েছে। এর পরে আর কারও কাছে এ মুখ দেখান কি মিথ্যা বিড়ম্বনা নয়? সে যদি আজ বিবাহিতা হ'ত, তা'হলে তার স্বামীর ভয়ে কেউ কি তাকে এমন ক'রে অপমান ক'রতে পারতো কখন? মাও তো তার বিয়ের কথা যেন একেবারেই ভুলে ব'সে আছেন! যাদের মান রক্ষা কর্‌বার জন্য স্বামীর উপস্থিতি নেই, তাদের তো তা'হলে নিজেদেরই সে কাজে সক্ষম হওয়া উচিৎ। নইলে

তো পদে পদেই এমনি ক'রে লাঞ্ছিত হ'তে হ'বে। শেষে সামান্য গণিকাদের দিয়ে অরুণ যে কাজ করায় তাকে দিয়েও তাই অনায়াসে করিয়ে নিতে পার্‌লে ?—বিনা লজ্জায়, বিনা বিবেক বিবেচনায় ? তা'হলে অরুণদের বাড়ীর সব লোক, তা ছাড়া অরুণের বন্ধু বান্ধবরা সকলেই বুঝতে পেরেছে তার অবস্থা ? হয় তো বা ভাবছে, সেও একজন ঐ রকম হেয় স্ত্রীলোক ? কি ভয়ানক ! আর তার দুঃখিনী বিধবা মা ? তিনি যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে মেয়েকে রাণী পদে বসিয়ে দিতে পেরেছেন ভেবে অরুণের হাতে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ের মত অমন যে হাজার সুন্দরীকে অরুণ পছন্দ ক'রে এঁকেছিল—শুধু আঁকবার জন্যেই—বিয়ে কর্‌বার জন্যে নয়, একথা কেমন করেই বা সে মাকে বোঝাবে ? একে হ'ল সে ধনী, তার উপর নিজের খেয়াল নিয়ে মত্ত, তার মত লোকের কাছ থেকে কোনরূপ বিবেক বিবেচনা বা অকপট উদার অনুষ্ঠান আশা করাই ভুল, এই কিছুদিন সে অরুণের সঙ্গে মিশে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝেছে ! এ দিকের বারাণ্ডার গায়ে যে ঘরগুলো পড়েছিলো সে গুলোর মধ্যে একখানা হচ্ছে ঠাকুরঘর। এই বারাণ্ডাটা খুব সরু ও অন্ধকার বলে এখানটা কেউ ব্যবহার ক'রত না। তা ছাড়া এর গায়ে যে ঘরগুলো পড়েছে তার এদিকে যে দু'একটা জানালা ছিল তাও মাঝে মাঝে ছাড়া, কেউ বড় একটা খুল্‌তো না। বেলা ১২টা বাজে কিন্তু রূপা এখনও একবারও এদিকে এলো না

দেখে আনন্দকিশোর ভাব্‌লেন, তা'হলে হয় তো এখনো ছবি আঁকা শেষ হয়নি। ভোগ সেরে আরতি ক'রে আনন্দকিশোর ঠাকুরের শয়ন দিলেন। সব দরজা বন্ধ ক'রতে যাবেন, হঠাৎ ওধারে জানালার ফাঁক থেকে যেন একটা চাপা কান্নার আওয়াজ তাঁর কাণে এসে লাগ্‌লো। মনে সন্দেহ হ'তেই জানালার একটা খড়খড়ি টেনে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। এমন ক'রে রূপা কাঁদছে কেন? আনন্দকিশোর তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ওধারের বারাণ্ডা দিয়ে ঘুরে এসে রূপার হাঁটুর মধ্যে গোঁজা মাথাটী চন্দন চর্চ্চিত বুকের কাছে টেনে নিলেন। পূজারীর সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প চন্দনের পবিত্র সুরভি ও নারায়ণ সেবালব্ধ শুদ্ধতার তেজজ্যোতি, সেই অন্ধকার বারাণ্ডা ও তার চেয়েও অন্ধকার রূপার হৃদয় এক সঙ্গেই আলোকিত ও সুবাসিত ক'রে তুল্লে। আনন্দকিশোরের স্পর্শেতে এমন একটা আকর্ষণ, এমন একটা আন্তরিক স্নেহের আভাষ মাখানো ছিল, যাকে অনুচিত বা অন্যায় ব'লে রূপা প্রত্যাখান ক'রতে পারলে না। যদিও কেউ কথা কয়নি কিন্তু আনন্দকিশোরের প্রাণের স্পন্দনে অগাধ সাহানুভূতি ও প্রীতির সাড়া রূপা বেশ স্পষ্ট ক'রেই প্রাণের মধ্যে অনুভব ক'রছিল। "কাঁদছ কেন রূপা?"

—"মনে এমনি অশান্তি হ'য়েছে, ভারী কষ্ট।"

—"এ অশান্তিকে নষ্ট ক'রতে হবে, মনে শান্তি এনে —তার উপায় মন স্থির করা।"

—"মন স্থির কি ক'রে হয় ?"

—"যথার্থ মন স্থির ক'রতে গেলে যোগ ক'রতে হয়, তার থেকে ইন্দ্রিয় দমন আপনি হয়।"

—"আপনি যোগ করেন ?"

—"হ্যাঁ তা একটু আধটু অভ্যাস আছে বই কি।"

—"তা'হলে আপনি যোগী পুরুষ, আপনাকে ছুঁলে দোষ নেই ?"

—"মানুষ মানুষকে ছোঁবে এতে আর দোষ কি রূপা! তবে—মা ভিন্ন অন্য কাউকে কখন ছুঁইনি।"

—"তবে আমায় ছুঁলেন যে ?"

—"তোমায়—তোমায় আপনার মনে ক'রে"

—"সত্যিই তো আর তা নয়, আমি তো আর আপনার নই।"

—"মনের টানটা কি কিছুই নয় রূপা ?"

—"সত্যি ব'লছেন আপনি ?"

—"মিথ্যা ব'লে আমার লাভ কি বলো ?"

—"অরুণবাবুর কি তা'হলে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নেই ?"

—"ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মানুষ সেটাকে অনেক সময় নিজের স্বার্থের পরিপূর্ত্তির জন্যে ইচ্ছে ক'রে ঢেকে রাখে।"

—"আচ্ছা, অরুণবাবু যে এই সব মেয়েদের সঙ্গে মেশেন

তা বুঝি আপনি আগে থেকে জানতেন? তাই আমাকে মিশতে বারণ ক'রেছিলেন?"

—"চোখের উপর দেখেছি ব'লেই জানতে হয়।"

—"আমার এমনি লজ্জা হ'চ্ছে—আমরা গরীব হ'য়েছি ব'লেই না আজ উনি—" রূপা আর ব'ল্‌তে পারলে না, তার দুই চোখ বেয়ে আবার কান্না নেমে এলো। আনন্দকিশোর ব'ল্লেন "তোমার সঙ্গে যাতে অরুণবাবুর বিয়ে হয় এই চেষ্টা তোমার মাকে ক'রতে বল না—আর তা যদি না হয়, আমাকে বলুন আমি পাত্র খুঁজি!"

—"ও সব কথা ছেড়ে দিন্। আমার মনের অশান্তি কিসে যাবে তাই বলুন। অরুণবাবু বিয়ে টিয়ে করবার লোক নয়।" শেষের দিকের কথাটার উত্তর না দিয়ে আনন্দকিশোর ব'ল্লেন "তুমি রোজ গীতা, কবীর, উপনিষদ এই সব পড় না কেন?"

—"আপনি তা'হলে আমায় এক একখানা কিনে দেবেন।"

—"তা দেবো। কিন্তু আবার "আপনি" আরম্ভ হ'ল কেন?"

এতক্ষণে রূপার মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে সে ব'ল্লে, "না না আর আপনি ব'লব না। আমায় কিন্তু তুমি সেই বৈদিক যুগের মেয়ে ক'রে তুল্‌ছ। ঠাকুরঘরের কাজ করা, আবার গীতা পড়া! আমার স্কুলে পড়া

বিদ্যা এবার সব ভুলে যাবো দেখ্‌ছি। তুমি আমার এত বদলে দিচ্ছ। আগে আমি সবই নিরর্থক ভাবতুম, এখন দেখ্‌ছি এই সমস্তরই মানে আছে।"

আনন্দ ব'ল্লেন, "ঠিক্‌, তাই শাস্ত্রে ব'লেছে নীচ জাতির অর্থাৎ নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে সহবাস ক'রবে না—নীচ জাতি ব'লতে বুঝায়, নীচ মন, নীচ প্রবৃত্তি ; তার সঙ্গ গ্রহণ ক'রতে নিষেধ ক'রেছে কিন্তু আমরা তার কি উল্টো মানেই না ধ'রে নিয়েছি। পতিত নিম্ন জাতি যারা, তাদের স্পর্শ ক'রতে হিন্দুধর্ম্ম যদি নারাজ হ'ত, তাহলে হিন্দুধর্ম্মের সমস্তই উল্টে যেতো, তা'হলে হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তকে একের মধ্যে অনন্তের বিকাশের বাণী সম্পূর্ণই ব্যর্থ হ'ত।" অবাক্‌ হ'য়ে শুনে রূপা ব'ল্লে, "তোমার এই সব কথা শুনে শুনে আমার মন এত বদলে গেছে, আগে আমি এ সব একটুও মানতুম না।" হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দ ব'ল্লেন,—"তাই না কি? তা'হলে এই মালাচন্দনধারী গরীব ব্রাহ্মণ তোমার রুচির উপর খুবই উপদ্রব করে দেখ্‌ছি?"

"আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান
অমরাবতী ত্যজে হৃদয়ে এসেছে যে
তোমারও চেয়ে সে যে মহীয়ান্!"
—মানসী

প্রতিদিনের মত সে-দিন বিকেলে পিন্ দিয়ে কাপড় প'রে ফিট্‌ফাট্ সাজগোজ ক'রতে রূপার মন লাগ্‌ছিল না—চুলও সে বিলিতী ধরণে ঘুরিয়ে বাঁধলে না। এক-খানি কালাপেড়ে স্নাড়ী ও সাদা জামা প'রে চুলটা এলো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে সে ঘর থেকে চ'লে আস্‌ছিল; তার মা ব'ল্লেন, "ওকি রে আজ ভালো ক'রে কাপড় প'রলিনে? অরুণ রাগ ক'রবে যে!" মার কথায় রূপার মাথাটা আরো গরম হ'য়ে গেলো, মুখটা ভার ক'রে সে ব'ল্লে, "কারুর রাগ-অ-রাগে আমাদের অত এসে যাবার দরকার কি মা? গরীবের—গরীবের মত সাজগোজ করাই ভালো। যখন বাবা ছিলেন, তখন ক'রতুম, সে আলাদা—এখন তো আর সে-দিন নেই।"

মৃত পিতা ও পতির স্মৃতি মা ও মেয়ে উভয়ের মনেই বেদনা দিল—আজ সেদিন কোথায়? চোখ মুছে মা ব'ল্লেন, "সে ভেবে আর কি হবে মা? সে আমার ভাগ্য!

তা ব'লে ভগবান্ যদি তোর দিকে মুখ তুলে চান্, তা'হলে তোকে রাণী দেখে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

—"তুমি যেন কি, মা! কোথায় কি তার ঠিক্ নেই, আমায় তুমি দিনরাত রাণী দেখ্ছ! গরীবের মেয়েকে কে আবার সেধে বিয়ে ক'রতে চায় বলো? অরুণ বাবুদের মত বড় লোকের ছেলেদের হাজার সুন্দরী পাত্রী মিল্‌বে; যারা ধনী-মানী তাদের ঘরের—তুমি কেন এমন অসম্ভব আশা ক'রে ব'সে আছো বলো তো?" মেয়ের কথায় ও ভাবে অরুণের উপর বিরক্তি ও রাগের প্রকাশ দেখে রূপার মার মনটা দমে গেলো—তবে কি কিছু হ'য়েছে? রূপা কি জানতে পেরেছে অরুণ তাকে বিয়ে ক'রতে রাজী নয়? ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লেন, "কেন রে সে কি কিছু ব'লেছে?" —"ব'লবে কেন? তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে রূপা যেমনি তিন তলায় পা দিয়েছে, ঘর থেকে অরুণ বেরিয়ে এসে একটা সুদৃশ্য মখ্‌মলের কেস্ রূপার হাতে দিয়ে ব'ল্লে, "এই সামান্য জিনিষটা তোমায় নিতে হবে রূপা! আমার জন্যে তুমি অনেক কষ্ট ক'রেছ"—প্রথমটা রূপা বুঝতে পারে নি। মখ্‌মলের কেস্‌টা খুলে দেখলে একটী সুন্দর হীরের ব্রোচ্! হীরে গুলোর ঔজ্জ্বল্য যেন ঠিক্‌রে প'ড়ছে! ওঃ! তার পরিশ্রমের জন্য পারিতোষিক! টাকা দেওয়ার বদলে এই উপহার—! সে কি

এমনি ক'রে মূল্য চেয়েছিল তার দেহের প্রতিকৃতির? ধন্য এই শিল্পীকে আর তার চেয়েও বাহাদুরী তাঁর হৃদয়হীন হৃদয়কে! রূপার মুখের উপর অস্ত সূর্য্যের লাল আভা রঙ্গিন্ কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে এসে প'ড়েছিল, তার উপর এই আসন্ন লজ্জার লাল তার কাণ ও মুখ চোখ ফুটন্ত কাঞ্চনের মত রক্তিম ক'রে ফেল্লে। সুন্দর সুগোল হাতখানি বাড়িয়ে মখ্মলের কেস্‌টী অরুণের হাতে ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হ'য়ে সে ব'ল্লে, "আপনি যে আমাকে এতটা নীচ ভাবেন তা জানতুম না—আগে জানলে —এমন কাজে যোগ দিতুম না—" সে যথাসাধ্য নিজেকে সংযত ক'রে ভদ্রতার মাপকাঠি নষ্ট হ'তে দেয়নি, তবু তার ঠোঁট দু'খানি ঝড়ের দোলায় কাঁপা নতুন গজান টুকটুকে পাতার মত কাঁপ্‌ছিল! অরুণ একেবারেই এটা প্রত্যাশা করেনি, কিসের জন্যে যে রূপা নিজেকে এতটা অপমানিত ও দুর্ব্ব্যবহার-প্রাপ্ত মনে ক'রে ফেলে সহসা অসম্ভব রকম উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো, অরুণ তা ভেবে ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে না পেরে ব'ল্লে—"কেন রাগ ক'রছ রূপা? একটা জিনিষ তোমায় আদর ক'রে দিলে যদি সেটা তোমার রাগের বা অপ্রীতির কারণ হবে জানতুম, তা'হলে কখনই অমন কাজ ক'রতুম না। তুমি জান না বিলেতে আদর্শের কত মান, শিল্পীর চেয়েও শিল্পীর আদর্শের মান শত সহস্র গুণে বেশী— এতে লজ্জাকর বা অপমানকর তো কিছুই নেই।" এতক্ষণে

রূপা অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছিল। বারাণ্ডাতেই একটা বেঞ্চের উপর ব'সে প'ড়ে সে ব'ল্লে, "বিলেতে অনেক জিনিষই আছে, যার অস্তিত্ব এ দেশে নেই। আমাদের দেশে মডেল মাত্রেই যখন সমাজের বহির্ভূত যারা তারাই, তখন তাদের সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা উল্টে অসম্মানের বোঝা মুখ টেপা হাসি টিট্‌কারীতেই উপ্‌চে উঠ্‌তে দেখা যায়।"

—"তার মানে আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা এখনো যায়নি কি না? তা'ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকদের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করা এ সব এখনো তেমন হয়নি যে! কাজেই এটা তারা লজ্জাকর মনে করে—এর ভিতর যে কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে তা তারা বুঝতে চেষ্টাও করে না। কিন্তু তোমার তো এ সব বোঝা উচিৎ রূপা? মিছিমিছি নিজেকে দুঃখ দেওয়া কি উচিৎ? তা'ছাড়া আমাকে তুমি এমন ভাবে অপরাধী ক'রে তুলেছ যে, আমার সত্যিই লজ্জা ক'রছে—" ব'লতে ব'লতে অরুণ তার মুখটা নীচু ক'রলে। রূপা তার দিকে চেয়ে ব'ল্লে, "আপনার এতে লজ্জার কি আছে বলুন?—আমার-ই এতে লজ্জা হওয়া উচিৎ।"

—"কেন?"

—"আপনি ভাব্‌লেন ভাড়া করা মডেলদের যেমন টাকা দেন্‌ আমাকেও তাই দিতে হবে, তাই এই ব্রোচ্‌টা—"

—"সত্যি তা নয় রূপা! যখন আমার ছবিগুলো আজ

শেষ হ'য়ে গেলো, অমনি সেই আবেগের মুখেই ছুটে দোকানে গিয়ে এইটে কিন্‌লুম—আর কিছু তখন আমার মনে ছিল না।" অরুণের চোখ দুটী সজল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে যে সত্য কথা ব'লছে তাও রূপা বুঝতে পারলে—তা'হলে তো অরুণের প্রতি সে অন্যায় ক'রেছে? অরুণের ভাবপ্রবণ চিত্তের সঙ্গে অন্যের তুলনা করাই ভুল, তাই তার ব্যবহারে চট্‌ ক'রে একটা কিছু ভেবে নেওয়া আরও অন্যায়, তাতে ক'রে কত সময় মিথ্যা অপরাধী ক'রে তুলতে হয় যে? এই যে সকাল থেকে তার সমস্ত অন্তর এই লোকটীর বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠেছিল এটাতো সবই তা'হলে কাল্পনিক, বেচারা অরুণের দোষ এতে ধ'রতে গেলে কিছুই যে নেই। তবে কেন সে মিথ্যা মিথ্যি এ বন্ধুত্ব ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হ'য়েছে। নিজের মূর্খতা ভেবে রূপা ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেল্লে। অরুণ বুঝলে এতক্ষণে সে জয়ী। মখ্‌মলের কেস্‌ থেকে হীরের ব্রোচ্‌টী খুলে নিয়ে রূপার কাছে এগিয়ে এসে সে ব'ল্লে, "আজ আবার এমন ক'রে কাপড় পরা কেন? সাজ-গোজেরও ব্যাঘাত কি এই অভাজনের উপর বিরক্তিতে?" হাস্‌তে হাস্‌তে রূপা ব'ল্লে "না, না, আজ কোথাও যাবো না ব'লেই—"

—"তা'হলে এ ব্রোচ্‌টী আজ তোমার এলো খোঁপার এক ধারে পরিয়ে দি, কেমন? তুমি পারবে না—আমি ঠিক্‌ পরিয়ে দিচ্ছি—" ব'লতে ব'লতেই শিল্পীর সুদক্ষ হাত রূপার কালো মেঘের মত এক রাশ নিবীড় চুলের মাথাভরা

খোঁপাতে ব্রোচ্‌টী আট্‌কে দিলে। উঠে দাঁড়িয়ে রূপা ব'ল্লে "যাই, কাজ আছে"

—"এখন কাজ থাক্‌—লণ্ডন থেকে কতকগুলো ছবির বই এসেছে, দেখ্‌বে এসো!" কথা কইতে কইতে দু'জনে পাশাপাশি ঠাকুরঘরের সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় ঠাকুরঘরের দরজায় আনন্দকিশোর গঙ্গা জলের ছড়া দিচ্ছিলেন—রূপার খোঁপার হীরের ফুল বাজ পোরা বিদ্যুতের মতন এক ঝলক্‌ আলো ও আঘাত এক সঙ্গেই এনে তাঁর চোখ দুটোকে যেন ঝল্‌সে দিলে! তিনি তাড়াতাড়ি মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন!

———

৯

হায় বিধি একি ব্যর্থ হবে ?
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা ?
কত জনের কত আশা পূরে
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা ?

—কড়ি ও কোমল

রূপার সে-দিনের কথা শুনে অবধি তারাদেবীর মনটা একটু চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিল। সত্যিই তো একে তো পরের ছেলে, তার উপর এত ঐশ্বর্য্য যাদের তাদের যে খেয়ালেরও অন্ত নেই, এটাও তো একবার ভাবা উচিৎ ছিল। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মন নিয়ে এই যে তিনি মেয়েকে সম্পদশালিনী দুর্গাবতীর ভবিষ্যৎ বধূর আসনে বসিয়ে রেখেছেন, এটাও তো ভালো নয়। যদি তাঁরা নাই করেন, তখন মেয়ের কি হ'বে ? এত বড় অবিবাহিতা মেয়েকে পাত্রস্থ করা যে আরও মুস্কিল, বিয়ে তো দিতেই হবে। তার চেয়ে তিনি স্পষ্ট ক'রে অরুণকে বলুন না কেন যে, তোমরা তো যথেষ্টই এ গরীবদের জন্যে ক'রছো, এখন একটী ভালো পাত্র যদি ঠিক্ ক'রে দাও, তা'হলে গহনা পত্র যা কিছু এখনো আছে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তিনি মেয়েটার ব্যবস্থা করেন। দুর্গাবতীকেই না হয় আগে ব'লে দেখা যাক্, তার পরে না হয় অরুণকে বলা যাবে। ওঁদের যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে রূপাকে ঘরে নিতে, তা'হলে

তাঁরা এ কথায় নিশ্চয়ই ব'লবেন যে অন্য পাত্রের দরকার কি অরুণই তো রয়েছে। স্নান সেরে রান্না চড়িয়ে উঠানে ব'সে বড়ি দিতে দিতে এই কথাই তারাদেবী ভাব্‌ছিলেন। ঠাকুরের চরণতুলসী হাতে নিয়ে আনন্দকিশোর সেখানে এসে প'ড়ে ব'ল্লেন, "ঠাকুরের নির্ম্মাল্য নিন্ মা, রূপাকেও দেবেন।"

—"এই যে বাবা আনন্দ! কেন রূপা আজ উপরে যায় নি? তুলসী তো সেই রোজ হাতে ক'রে নিয়ে আসে।" এই ব'লে মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে তা একটী তাম্র পাত্রে রেখে তারাদেবী আবার এসে বড়ি দিতে ব'সলেন। আনন্দ ব'ল্লেন, "কই না, রূপা বোধ হয় অরুণবাবুর ঘরে কি ছবি-টবি দেখ্‌ছে হ'বে—তাই আমিও ডাকি নি।" চিন্তিতভাবে মুখ তুলে মৃদুস্বরে তারাদেবী ব'ল্লেন "এ রকম ভাবে মেলা মেশাটাই কি ভালো? যদি ধরো বিয়ে নাই হয়?"

"আমি তো সে কথা আগে থেকেই ব'লছি মা! যদি এ রকম মেলা মেশা ক'রতে দিতে হয়, তা'হলে পাকা কথা কয়ে নিন্ না কেন?"

—"আমরা গরীব, নিজে থেকে বিয়ের কথা তুলতেও যে সাহস হয় না বাবা! আমি আশা ক'রেছিলুম ওঁরাই সেটা আগে তুলবেন।"

—"তা আর কই তুল্লেন বলুন? সে স্থলে আজই আপনি রাণীমার (দুর্গাবতীর) সঙ্গে বিয়ের কথাটা পেড়ে ফেলুন।"

মুখ নীচু ক'রেই তারাদেবী ব'ল্লেন, "আর যদি ধরো ওঁরা নাই করেন—তখন ?"

—"তখন অন্য চেষ্টা দেখ্‌তে হবে, এমন অনেক পাত্র আছে যারা টাকা না নিয়েও বিয়ে করে।"

—"আজকালকার দিনে তেমন পাত্র কই মেলে বাবা ? তার উপর রূপা বড় হ'য়ে গেছে ; হিন্দু-ঘরের গিন্নীরা এমন বৌ ঘরে নিতেই আপত্তি ক'রবে।"

—"তাঁরা আপত্তি ক'রতে পারেন কিন্তু কল্‌কাতায় অনেক শিক্ষিত আছেন, যাঁরা বড় মেয়েই পছন্দ করেন।"

তার দু'ঘণ্টা বাদেই অরুণ ভাত খেতে ব'সেছিল, দুর্গাবতী কাছে ব'সে ছেলেকে খাওয়াচ্ছিলেন, সেদিন রবিবার, অরুণের আর্ট স্কুলে যাবার তাড়া ছিল না। অবসর বুঝে তারাদেবী উপরে উঠে এলেন—তাঁকে দেখে দুর্গাবতী তাড়াতাড়ি আর একখানি আসন পেতে দিতে আদেশ দিয়ে ব'ল্লেন, "এই যে দিদি ! সিঁড়ি ভেঙ্গে তুমি একেবারে হাঁপিয়ে গিয়েছ—ব'সো ব'সো ! এতটা কাহিল হওয়াতো ভালো নয়, তোমার খাওয়া দাওয়া বুঝি তেমন ভালো হ'চ্ছে না ?"

নিঃশ্বাস ফেলে তারাদেবী ব'ল্লেন, "বিধবা মানুষের আবার ভালো খাওয়া কি দিদি, বেঁচে থাকাই যখন তাদের পক্ষে দোষের ? তোমার দয়াতে যথেষ্ট খাওয়া পরা পাচ্ছি,

আর কোন অভাব নেই—নারায়ণ তোমার ছেলেকে চিরজীবী করুন।"

অরুণ খেতে খেতে মুখ তুলে ব'ল্লে, "সত্যিই তুমি রোগা হ'য়ে যাচ্ছ মাসীমা! একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ো, ওটা ভালো নয়—তা ছাড়া তোমার মুখ, চোখও খুব শুখ্‌নো দেখাচ্ছে, এমন তো আগে ছিল না; আমায় এর ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্ছে।"

—"ভাবনা চিন্তেতেই মানুষ শুখিয়ে যায় বাবা! এত বড় মেয়ে হ'লো তার ভাবনা কি কম? আমার ব্যবস্থা ক'রতে হবে না, যদি পারো তারই একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও! যাতে একটী ভালো পাত্র জোগাড় হয়—"

অরুণ কিছু বলবার আগেই দুর্গাবতী ব'ল্লেন, "রূপার জন্যে আর ভাবনা কি দিদি! হ'লই বা বড় মেয়ে, তোমরা তো আমাদের স্ব-ঘর, আর অরুণও তো বড় হ'য়েছে। কত জায়গা থেকে কত সম্বন্ধও তো এসেছে কিন্তু এখানে এসে রূপাকে দেখে অবধি আমি তো আর কাউকেই কথা দিই নি—এমন মেয়ে কি সহজে মেলে? কি বলিস্‌ অরুণ?"

সপ্রতিভ অরুণ ইতিমধ্যেই উত্তর ভেবে ঠিক্‌ ক'রে রেখেছিল, একটুও লজ্জা না ক'রে ব'ল্লে, "আমি মোটেই রূপার যোগ্য নই, আমার চেয়ে ঢের ভালো ভালো পাত্র মিল্‌বে মাসীমা! তুমি কেন মিথ্যা ভাব্‌ছ। কত বড় বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তারা যেমনি

বিদ্বান্ তেমনি সুশ্রী, তুমি যদি বল ত আমি একটা পার্টি দিই, তাতে তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করি, আর পাঁচজন শিক্ষিতা মেয়েদেরও নিমন্ত্রণ করি। তা'হলে রূপা নিজেই বর পছন্দ ক'রতে পার্বে, আর তারাও রূপাকে দেখে যেতে পার্বে।"

হাস্তে হাস্তে দুর্গাবতী ব'ল্লেন, "রূপাকে তুই স্বয়ম্বরা ক'রবি না কি ?"

অরুণ ব'ল্লে, "তোমরা জান না মা, আজকালকার নিয়মই এই, আজকালকার বাপ মা পছন্দ ক'রে বিয়ের ঠিক্ করেন না, বর ক'নেই নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে ঠিক্ ক'রে থাকে।"

তারাদেবী ব'ল্লেন, "এত বড় মেয়েকে কি সহজে কেউ বউ ক'রতে চাইবে ?" অরুণ তৃষ্ণার জল মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, "কেন চাইবে না ? অশিক্ষিতা গিন্নীরা না চাইতে পারে, তা ব'লে কল্‌কাতা সহরে শিক্ষিত ভদ্র ব্রাহ্ম পরিবারে এমন মেয়ে পেলে আদর ক'রে তুলে নেবে—তা জানো মাসীমা! তোমরা তো একটু তলিয়ে ভেবে দেখ না, কেবল মিথ্যা মন খারাপ ক'রে ক'রে শরীরটা মাটী ক'রবে। আজই আমি রূপার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রছি।" ব'লেই অরুণ হাঁক দিয়ে ডাক্‌লে "সীতারাম !" ছুটে আস্‌তে আস্‌তে বেয়ারা উত্তর দিলে "হুজুর !"

"একবার নবীন সরকারকে ডেকে আন্‌তো।"

—"যো হুকুম।" ছ'মিনিটের মধ্যেই নবীন সরকার করজোড়ে হাজির, অরুণ তার দিকে চেয়ে ব'ল্লে—"দেখুন কতকগুলো নেমন্তন্নর কার্ড ছাপাতে দিয়ে আসুন্‌ তো—"

"কি রঙের ?"

—"একেবারে সাদা"

—"তাতে সোণার জলে——"

—"সোণার জলে ফলে নয়—আজকালকার দিনে ও সব বাবুগিরি কোন ভদ্রলোক করে না—প্লেন্‌ কালো অক্ষর হবে ; পেন্‌সিল্‌ কাগজ নিয়ে লেখাটা টুকে নিন্‌।" নবীন সরকারের পকেট্‌ থেকে তখনি পেন্সিল্‌ কাগজ বেরোল ও প্রথানুযায়ী নিমন্ত্রণ পত্রে যা লিখিত হবে তা টুকে নিয়ে নবীন সরকার চ'লে গেলে ছেলের কার্য্যতৎপরতা দেখে হাসিমুখে দুর্গাবতী বল্লেন, "তোর আর সবুর সয় না—একবার একটা কিছু কাজের নাম পেলে হয়—তখনি তা হাঁসিল! দেখ্‌লে তো দিদি এমন কাজের লোকের হাতে তুমি যখন তোমার মেয়ের বিয়ের ভার দিয়েছ, তখন আর ভাবনার কিছু নেই।" তারাদেবীর বিষণ্ণ মুখে আবার একটু শুখ্‌নো হাসি ফুটে উঠ্‌লো ; তিনি ব'ল্লেন, "তোমাদের হাতে রূপাকে দিয়ে যেতে পারলে যেমনটী হ'ত, তেমন কি আর কোথাও হবে ? অরুণ যে আমার বড়ই মন কেড়ে নিয়েছে দিদি! এমন জামাই কি আর আমার হবে ?"

তারাদেবীর চোখ দুটী সজল হ'য়ে উঠ্‌লো—অরুণ তাঁর দিকে চেয়ে কি ব'লবে তাই ভেবে নিচ্ছিল, ইত্যবসরে অরুণের মা ব'ল্লেন—"আমারও যে রূপা ছাড়া অন্য মেয়েকে বৌ ক'রতে সাধ নেই ভাই। রূপার মত বৌ কি আর আমার ভাগ্যে মিল্‌বে দিদি!"

—"ও কি কথা ব'লছ তুমি, রাজার ঘরে বৌ ঢের মিল্‌বে ভাই, কিন্তু গরীবের ঘরে জামাই মেলা বড় দায়—তার উপর আবার এমন রাজপুত্তুর জামাই কি আর গরীবের হয়, অরুণের মুখখানা এমনি বুকের ভিতর ব'সে গেছে, মনে হয় ও যেন আমার সত্যিই পেটের ছেলে!"

অরুণ পান খেতে খেতে ব'ল্লে "তা মাসীমা আমি তো আছিই, সেই যাকে বলে ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—তবে আমার চেয়ে ভালো পাত্র যদি রূপার ভাগ্যে জুটে যায়, তা'হলে আর এ ভাঙ্গা কুলোর দরকার কি বলুন?"

—"আচ্ছা, সত্যি ব'লতে হবে অরুণ, তুমি আমার রূপাকে পছন্দ করো কি না?"

"পছন্দ? পছন্দ নিশ্চয়ই করি—খুব পছন্দ করি, রূপাকে যে দেখ্‌বে সেই পছন্দ ক'রবে, আমি তো ছার!"

—"তবে কেন বাবা তোমার ততটা মন নেই বিয়ে ক'রতে?"

—"দেখুন মাসীমা, আমার আঁকার বড় ক্ষতি হবে বিয়ে ক'রলে—তাই আমি বিয়ে ক'রতে চাইনে। দেখুন এর

আগেও আমার জন্যে মা কত মেয়ে ঠিক্ ক'রেছিলেন, আমি করিনি—" ব'লতে ব'লতে অরুণ চ'লে গেলো—তারাদেবীর দিকে চেয়ে দুর্গাবতী ব'ল্লেন—"অরুণ আমার এমনি পাগল—বিয়ে থাওয়ার ইচ্ছে কোন দিনই দেখতে পাইনে—কত সম্বন্ধ এলো, সব তো দূর দূর ক'রে ফিরিয়ে দিলে, কেবল রূপার বেলায় একেবারে না ব'লতে পারছে না, এই তোমার ভাগ্য দিদি!" এতটা সৌভাগ্য বুঝতে পেরে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে তারাদেবী নীচে নেমে এলেন।

———

কাঁদিছে নীরব বাঁশী
অধরে মিলায় হাসি
তোমার নয়নে ভাসে
ছল ছল অভিমান !
এবার বসন্ত গেল
হ'ল না হ'ল না গান !

কল্লনঃ ।

আনন্দকিশোর সেদিন দুর্গাবতীর কাছ থেকে ছুটী নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দর্শন ক'রতে যাচ্ছিলেন—রূপা ধ'রে ব'সল সেও যাবে। রূপার মা ব'ল্লেন, "অরুণকে তার মাকে জিগেস্ করো, তাঁরা যদি বলেন তা'হলে যেও—তাঁদের অমতে কোন কাজ করা ভালো নয়।" রূপা ব'ল্লে, "শুধু শুধু এমনভাবে পরের দাসত্ব করাটা কি খুব গৌরবের মা ? ওঁদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ হ'তে পারি, শ্রম দিয়ে, সেবা দিয়ে ওঁদের উপকারের ঋণ যথাসাধ্য কমাতে চেষ্টা ক'রতে পারি, কিন্তু তা ব'লে এক পা বাড়াতে গেলে যদি অরুণবাবু বা তাঁর মার মত নিতে হয় তা'হলে তো বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।" পেছনে যে কখন আনন্দকিশোর এসে দাঁড়িয়েছেন রূপা তা মোটেই জানতে পারেনি, তাঁর হাস্য-দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রূপার মা ব'ল্লেন—"শুন্‌ছো বাছা! আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কি কথায় পারবার যো আছে। তোমার

সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাবে ধ'রেছে, এতে অরুণ যদি রেগে যায় সেটা কি ভালো হবে ?" আনন্দকিশোরকে দেখতে পেয়ে রূপার সমস্ত মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো—চোখে চোখে প'ড়তেই এই যে অকারণ লজ্জা এর কোন মানে আছে কি না কে জানে! আনন্দকিশোরও তাঁর চক্ষু নীচে নামিয়ে ফেল্লেন। একটা মৌন ভাষা নির্ব্বাক্ এই তরুণ তরুণীর চোখে মুখে যে কাব্য রচনা ক'রে ফেল্লে তার গুপ্ত অক্ষর অদৃশ্য কালীতে লেখা অক্ষরের মতন আর সকলের অগোচরে রয়ে গেলো। রূপা ভাব্‌ছিল, আনন্দকিশোরের সঙ্গে সে যে একান্তই যেতে চেয়েছে এতে না জানি তিনি কি ভাব্‌ছেন তাকে ? ছিঃ কি লজ্জা! সে আর যেতে চাইবে না। মন্দির দেখে কাজ নেই! মার দিকে চেয়ে একটু হেসে সে ব'ল্লে—"আমি তোমার সঙ্গে মজা করছিলুম মা! দেখছিলুম তুমি কি বলো। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির দেখতে যাবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই, পূজারী ঠাকুরের মত ভক্তি শ্রদ্ধা কোথায় পাবো বলো যে মন্দির দেখে আনন্দ পাবো—তার চেয়ে আজ বরঞ্চ একটা ভালো থিয়েটারে গেলে কাজ দেখ্‌বে।" রূপার মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে উপরে চ'লে গেলে, আনন্দকিশোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রূপার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন—"তোমার মন্দিরে যাবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই হ'য়েছিল রূপা! এখন কথাটা ঘুরিয়ে নিলে তো হবে না। আমি যে তোমার মনের সব খবর জানি রূপা! আমার কাছে

লুকিয়ে কি কিছু লাভ আছে ? তবে মা যখন বারণ ক'রছেন তখন গিয়ে কাজ নেই। এই দেখো তোমার জন্যে আজ কি এনেছি—" ব'লেই শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও কবীরের দোঁহাবলী বই দু'খানি রূপার হাতে দিয়ে আনন্দ ব'ল্লেন "রোজ প'ড়।" বই দু'খানি সাগ্রহে হাতে নিয়ে দু'চার পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে রূপা ব'ল্লে, "এর মানে বোঝা কি আমার পক্ষে সহজ হবে।"

—"মানে বোঝা খুবই সহজ, তবে সেটা জীবনে উপলব্ধি ক'রতে হয় যোগ সাধন ক'রে। তবে অল্প কথায় ব'লতে গেলে "গীতা" "গীতা" দশবার উচ্চারণ ক'রলে যা হয় সমস্ত গীতা খানার অর্থ ই এক কথায় তাই।"

—"দশবার গীতা" উচ্চারণ ক'রলে কি হয় ?"

—"গীতা" "গীতা" ব'লতে ব'লতে "তাগী" হ'য়ে যায়—তার মানে সমস্ত গীতার উদ্দেশ্য ত্যাগী হওয়া—সেইটাই নানা ভাবে নানা উপায়ে এতে বলা হ'য়েছে।"

—"আচ্ছা আমার মনের যে এই অশান্তি তা কি গীতা প'ড়লে যাবে ?"

—"তোমায় মনে আবার অশান্তি কিসের ?"

—"কি জানি কিসের ! আমি নিজেই বুঝতে পারি না কেন আমার মনের মধ্যে এমন কষ্ট হয়। বোধ হয় বাবার জন্যে—বাবা মারা যাবার আগে তো এমন ছিল না। আচ্ছা তোমার মনে কি কোন অশান্তি বা দুঃখ নেই ঠাকুর ?"

যেখানে দাঁড়িয়ে কথা হ'চ্ছিল, সেখানটা বাগানের অশোক গাছের ধারেই রোয়াকের উপর—তারই অদূরে শ্বেত পাথরের বাঁধানো ঘাট, নীচে কাঁচের মত পরিষ্কার দীঘীর জল—দীঘীর পাড়ে বকুল গাছের ফুলভরা শাখায় ব'সে একটা কোকিল ক্রমাগতই "কুহুহু"র তান সপ্তমে তুল্‌ছিল। কি যেন উন্মাদনা কোন কুহকে জেগে উঠে আনন্দকিশোরের ভক্তি-শান্ত, শ্রদ্ধা-সংযত, অন্তরকেও উদ্‌ভ্রান্ত, অশান্ত, না ক'রে ফিরতে দিচ্ছিল না। রূপার কথার উত্তরে তিনি ব'ল্লেন, "আমার দুঃখ ? না, তা আর কিসের ! তবে মাঝে মাঝে অশান্তি হয় সেই পক্ষাঘাতের কথা মনে ক'রে, যদি আবার কখন সে রোগ হয়, তা'হলে আর নিষ্কৃতি নেই, সঙ্গে সঙ্গে অশেষ দুর্গতি ! তখন মা ছিলেন, চ'লেছিলো ; এখন দেখ্‌বে কে ?"

—"মা নেই ব'লে কি আমরাও কেউ নই ? কেন ওসব মিথ্যা ভাব্‌না ভাব্‌ছো বলো তো ?" ব'লেই রূপা তার সকরুণ চোখ দুটী তুলে আনন্দকিশোরের দিকে চাইলে। বকুল গাছের কোকিল পাখী আবার গান গেয়ে উঠ্‌লো—কুহুহু কুহুহু কুহুহু ! আনন্দের বৈরাগ্যমাখা শান্ত চক্ষু দুটী হঠাৎ আবেগ ভরা আবেশে ছল্ ছল্ ক'রছিল, আস্তে আস্তে তিনি ব'ল্লেন "আমাকে কি তুমি যথার্থই বন্ধু ব'লে ভাবো রূপা ? এ কাঙ্গালকে কি তুমি একটুও ভালো বাস্‌তে পারবে—" আর বলা হ'ল না ; অরুণের গলার

আওয়াজ শোনা যেতেই দু'জনকেই ত্রস্তভাবে বিভিন্ন পথে নিজেদের কাজে চ'লে যেতে হ'ল। ঠাকুরঘরে ঢুকে আসনে ব'সে প'ড়ে আনন্দের মনে হ'ল, যেন একটা অতি বড় অপরাধে তিনি আজ অপরাধী, ঠাকুরের পূজা করার অধিকার যেন আর তাঁর তিল মাত্রও নেই! যে কামনা লোকচক্ষুর আড়ালে মনের বিজন বনে রক্ত গোলাপের মত ফুটে উঠেছে, তাকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পূজার পুষ্পপাত্রে সাজাতে না পারলে তো আর পূজা করা চলে না।

জীবনের এই ১৫।১৬ বৎসর যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে পূজা করা হ'য়েছে, আজ এই এক নিমিষের আবেগ রাঙ্গা অন্তর নিয়ে সে পূজা ক'রলে তাঁর ২৮ বৎসরের জীবন যে এক দণ্ডের মধ্যে বীভৎস কপটতায় পরিণত হয়ে উঠবে। না— এ কপটতা তাঁর দ্বারা চ'লবে না, নিজেকে আহুতি দিতে হবে—এই দাউ দাউ জ্বালা নিজেরই কামনার চিতায়, তবে তাঁর অপরাধের সুবিচার হবে যে!

অরুণ বাবুর বৃত্তিভোজী সামান্য পূজারী তিনি, তার উপর তাঁর বাল্যবন্ধুও বটে, সেস্থলে অরুণ বাবুর অপ্রীতিকর কার্য্য করবার তাঁর কোনো অধিকারই নেই। গলার আওয়াজ পাবা মাত্র কেন তিনি ভয়ে ও লজ্জায় পালিয়ে এলেন? যদি তিনি নিজের মনের কাছে নিষ্পাপ ও নিরুদ্বেগ থাকতে পারতেন, তা'হলে তো আজ এ গোপনতার আবশ্যক হ'ত না! নির্ভীক ও অকুণ্ঠ মন নিয়ে তিনি তো

অনায়াসেই রূপার সঙ্গে কথা ক'য়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তে তাঁর চিরলব্ধ তেজ ও সাহস কোথায় গিয়েছিল? যে মুহূর্ত্তে তিনি রূপাকে গীতার তাৎপর্য্য বোঝাচ্ছিলেন তার পরমুহূর্ত্তেই তাঁর মনে এই ঝড়ের বিক্ষুব্ধ হাহাকার উঠ্‌লো কোথা থেকে? না—তাঁর গীতা উপদেশ করারও অধিকার নেই, নারায়ণ সেবারও আর অধিকার নেই—তাঁকে পালাতে হবে—একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে হবে—যেদিকে দু'চোখ যায়! ঐ যে তাঁকে আবার বেঁধে ফেল্‌ছে ঐ দুটী জলভরা নিবিড় কালো চক্ষু! কি ভয়ানক নেশা—এ যে মরুযাত্রীর আকণ্ঠ তৃষ্ণা তাঁকে পেয়ে ব'সল! গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে আনন্দকিশোর দৃঢ়পদে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর সমস্ত মুখে এমন একটা নিষ্ঠুর দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল, যাতে ক'রে তাঁর স্বাভাবিক করুণতামাখা মুখ অচেনা হ'য়ে উঠেছিল। তিনি একেবারে দুর্গাবতীর ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লেন—"রাণী মা!"

—"কি আনন্দ!"

—"আমার একটু কথা আছে;"

—"কি কথা বাবা?" ব'লতে ব'লতেই দুর্গাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আনন্দ ব'ল্লেন, "আমি দক্ষিণেশ্বরে যাবো ব'লে একদিনের ছুটী নিয়েছিলুম কিন্তু এখন দেখ্‌ছি হয় তো কিছুদিনের মতই আমায় ছুটী দিতে হবে মা?"

—"কেন, কোথায় যাবে ? কি দরকার ?"

—"একবার দেশে যাবো, তারপরে দেখি কি হয়।"

—"তা কতদিন আর দেশে থাক্‌বে। ৮।১০ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে তো ?"

"আস্‌তে চেষ্টা ক'রব কিন্তু যদি না পারি তার জন্যে আমায় ক্ষমা ক'রতে হবে মা।" দুর্গাবতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আনন্দ যখন সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছেন, রূপা তখন উপরে উঠ্‌ছিল, তাকে দেখে জোর-করা হাসি হেসে আনন্দ ব'ল্লেন—রাণীমার কাছে মস্ত ছুটী মঞ্জুর হ'য়ে গেছে রূপা। আর ফির্‌ছি না।"

রূপা অবাক্‌ হ'য়ে ব'ল্লে "কেন ফির্‌বে না ?"

—"এ কাজের যোগ্য নই তাই।"

—"মানে ?"

—"মানে আমি পূজা করার যোগ্য নই।"

—"এতদিন পূজো ক'রে আজই হঠাৎ অযোগ্য হ'য়ে গেলে যে ?"

—"হ্যাঁ, এতদিন ক'রেছি বটে, আবার যদি কখন যোগ্য হ'তে পারি তখন এসে ক'রব।"

—"তবে সত্যিই আর আসবে না ?"

শূন্যে-রাখা উদাস দৃষ্টি নামিয়ে রূপা দেখলে, চকিতের মধ্যে আনন্দকিশোর নেমে গেছেন, তার কথার উত্তর দেবে কে ? শুধু নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি

কাণের কাছে ঠাট্টার সুরে ব'লে উঠ্‌লো "সত্যিই আর আস্‌বে না ?"

সেদিন বিকেলে রূপা আর উপরে উঠ্‌তে পার্‌লে না, কিসের যেন একটা অভাব তার সমস্ত মনকে পীড়া দিচ্ছিল। এতটা শূন্যতা সে জীবনে কখনও বোধ ক'রেছে ব'লে মনে হ'ল না—এ বাড়ীতে তার আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে ইচ্ছা হ'চ্ছিল না, মনটা ছুটে যেতে চাইছিল ঐ পথের পানে —যে পথে............................ছিঃ, একি দুর্ব্বলতা ! এমনটা যে হ'তে পারে তা তো সে কল্পনাও করেনি কখন ? তাদের একতালার ঘর কিনা সন্ধ্যা হবার আগেই ছায়া-ঘন হ'য়ে এসেছিল। মা অদূরে ব'সে হরিনাম ক'রছিলেন। রূপা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই বাগানের অশোক গাছের নীচে যেখানে সকাল বেলা দুজনের কথা হ'য়েছিল, সেইখানে ব'সে প'ড়ল। সন্ধ্যার ধূসর আঁচল-ঢাকা আকাশের এক কোণে সতীর সিঁথীর সিন্দূরের মত খানিকটা জাফ্‌রাণী রঙের মেঘ ফিরোজার সঙ্গে মেশামেশি হ'য়ে ঠিক্ সন্ধ্যা হতে দেয়নি তখনো। সুন্দরীর ললাট-চুম্বিত মুক্তার সিঁথীর হীরক ধুক্‌ধুকির মত অসীমের প্রান্ত-ভাগে সান্ধ্য তারাটী উজ্জ্বল ! মলয় বাতাস বইছিল—ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়ে দিয়ে আর ফুটন্ত পুষ্পের পরিমল চুরি ক'রে ! দীঘির পাড়ের বকুল গাছের কোকিলটা সপ্তমীর চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে গেয়ে উঠ্‌লো—কুহু, কুহু, কুহু ! অশোক

গাছের কাণ্ডে যেখানটাতে আনন্দকিশোর ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানটায় মাথাটা রেখে রূপা তার মুখখানা দুই হাতে ঢেকে ফেল্লে।

১১

"ছিল তিথি অনুকূল,
শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল—
পরাণ জ্বলে,
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে ?"

তার পর দিন সকালে উঠেই অরুণ তার মাকে, রূপাকে, তারাদেবীকে, তা' ছাড়া বাড়ীশুদ্ধ চাকর-বাকর সকলকেই মনে করিয়ে দিলে যে, আজ তাদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে অনেক লোক আস্‌বে। খাবার-দাবারের আয়োজন করা, ঘর ও বাগান সাজান—অরুণ নিজেই সব ক'র্‌ছিল ; হঠাৎ কি একটা দরকার পড়ায় মায়ের আঁচল থেকে অরুণ চাবি খুল্‌তেই দুর্গাবতী হেসে উঠে বল্লেন, "আজ আর কারও নিস্তার নেই দেখ্‌ছি, তুই আর কাউকে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দিবিনে আজ।" অরুণ বল্লে—"আজ তো রূপার দেখাই নেই, কোথায় আমায় একটু সাহায্য কর্‌বে আজ, তা না ঘরের ভিতর কি কর্‌ছে কে জানে!" দুর্গাবতী বল্লেন,— "এত বেলা অবধি ঘরে কি কর্‌ছে, ঠাকুরঘরেও তো আসেনি আজ! একে নতুন পূজারী, রূপা এসে পূজোর জোগাড়গুলো ক'রে দিলে তবু সে অনেকটা বুঝে নিতে

পারবে।" একটু ভেবে অরুণ বল্লে,—"কেন, আনন্দকিশোর শর্ম্মার কি হ'ল হঠাৎ ?" মুখটা ভার ক'রে দুর্গাবতী বল্লেন, "কি জানি, তার কি দরকার হ'ল বল্লে দেশে যাচ্ছে, হয় তো আর না আস্তেও পারে।"

—"তা ভালোই হ'য়েছে। আজকাল তার মাথার কিছু ঠিক ছিল না। দিন দিন বিদ্যা বাড়্ছিল।" বলেই অরুণ আবার ব'ল্লে, "তুমি ডাক মা রূপাকে।" বারাণ্ডা থেকে ঝুঁকে দুর্গাবতী ডাক্লেন, নীচে থেকে তারাদেবী বল্লেন—"এখনো শুয়ে।"

—"এত বেলা অবধি শুয়ে কেন? অসুখ বিসুখ হয়নি তো?"

—"বল্ছে তো মাথা ধরেছে, দেখি আবার।" এঁদের কথাবার্ত্তার সাড়া পেয়েই রূপা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল, কিন্তু হাত-পাগুলো যেন অবসন্ন! শরীর ও মনের জড়তা কাটিয়ে সে অবশেষে উঠে পড়্ল। আয়নাখানা মুখের সাম্নে ধ'রে লজ্জায় সে বন্ধ ক'রে ফেল্লে! এক রাত্রের মধ্যে মানুষ যে এমন বদ্লে যেতে পারে, তা তার ধারণা ছিল না। স্নান করতে প্রবৃত্তি হ'ল না, কেমন যেন শীত শীত করছিল। মুখে হাতে জল দিয়ে, অসংবদ্ধ চুলগুলো একটু ঠিক ক'রে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে একটু যেন অবাক্ হ'য়েই তারাদেবী বল্লেন, "রাত্তিরে

তোর ঘুম হয়েছিল তো? মুখটা কেমন যেন শুখ্‌নো শুখ্‌নো দেখছি—ভাল আছিস্‌ তো?"

—"একটু মাথা ধরেছে, ও সেরে যাবে'খুনি।"

—"তোকে যে উপরে ডাক্‌ছেন।"

—"যাই।" উপরে গিয়ে সে দেখ্‌লে বিস্তৃত হল্‌ঘরের সুসজ্জিত শোভা। ছোট ছোট টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, তা' আবার রঙিন্‌ চায়ের সরঞ্জামে আরও শোভনীয় হয়েছে! অরুণ নিজে হাতে জরীর Teapoy cloth ও কাশ্মীরী চৌকীঢাকা পেতে দিচ্ছে। ঘরের সাম্‌নে যেতেই অরুণ চেয়ে দেখে বল্লে,—"এই যে রূপা, অসুখ কর্‌লো না কি? আজকের দিনে অসুখ করলে কি করে চলে বলো দিকিন্‌?"

—"না, না, অসুখ কিছু করেনি, একটু মাথা ধরেছে, সেরে যাবে'খুনি। কি কাজ আছে দিন না করি।"

—"এই সমস্ত খাবারগুলো এই প্লেটে সাজিয়ে ফেলো।" রূপা প্লেটে খাবার গুছোতে লাগ্‌লো। অরুণ বল্লে,—"আমি ততক্ষণ তোমার যে ছবিগুলো এঁকেছি সেগুলো সাজাই।" ছবিগুলো ঘরের যেখানে যেমন ভাবে সাজে, সেখানে তেমনি ভাবে সাজিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে অরুণ আবার বল্লে, "দেখো দিকিন্‌ কেমন হ'লো?" বিস্মিত হ'য়ে রূপা বল্লে, "আমার ছবিগুলো সাজাচ্ছেন কেন? অন্য তো অনেক ছবি আছে, সেগুলোই দিন্‌ না।" মুচ্‌কি

হেসে অরুণ বল্লে, "তোমার ছবি কেন সাজাচ্ছি? তার মানে আছে!"

—"কি মানে?"

—"মানে, তোমার বিয়ের জন্যে তোমার মা যে বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন কি না, অথচ ব্যস্ত হ'বার কোন কারণই নেই! আজকে যাঁরা আস্‌বেন, তাঁদের সেই কারণেই নিমন্ত্রণ করেছি।"

অবাক্ হ'য়ে রূপা বল্লে, "আপনি আমায় আগে থেকে জানালেন না কেন? তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই এতে বাধা দিতুম।"

—"তুমি বাধা দিলেই বা কে শুন্‌ছে বলো! যেটা অবশ্য করণীয়, সেটা তো কর্‌তেই হবে!"

—"আমি যদি বিয়ে না-ই করি? তা' ছাড়া এ সব সাহেবী ফ্যাসান্ আমার ভালো লাগে না।"

—"ভালো লাগ্‌তেই যে হবে রূপা! নইলে তো উপায় নেই—"

—"আপনার এত মাথা ব্যথার দরকার কি বলুন তো? আমার উপায় থাকুক্ আর নাই থাকুক্—" অরুণ বেশ হেসেই ব'ল্লে—"আমি যে মাসীমার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, যদি তাঁর মেয়ের জন্যে ভাল পাত্র না যোগাড় ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে নিজেই তাঁর মেয়েকে বিয়ে ক'রব। শেষে আমার ঘাড়ে যদি বিয়েটা চাপে, এই ভয়েই আমার

মাথা ব্যথা—” অরুণের এতটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা রূপার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল—গরীবের মেয়ে ব'লে তার কি কোন মান-মর্য্যাদাও নেই যে এরূপ উপেক্ষা ও অপমানের ঘায়ে অরুণ তাকে প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত ক'রবে? মিষ্টি সাজানো ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রূপা ব'লে গেলো, “আপনার ঘাড়ে কিছু চাপবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার গরীব মা না বুঝে যদি কিছু আপনার কাছে আশা ক'রে থাকেন তাঁকে ক্ষমা ক'রবেন—” স্তম্ভিত অরুণ প্রথমটা স্তব্ধভাবে থেকে—ফস্ ক'রে মাথার ভিতর একটা কৌশল ঠিক্ ক'রে নিলে—২ মিনিট মোটে তার ভাব্‌তে সময় লেগেছিল—তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সে রূপার গতিরোধ ক'রে ফেল্লে! অরুণকে পথ আগ্‌লে দাঁড়াতে দেখে রূপার সমস্ত শরীর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছিল—অরুণ এত নীচ! এত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণ তার! এমন বড়লোকের দয়া কেন তারা নিতে গেলো? অরুণ এবার গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্লে “দেখো রূপা, তুমি আমায় যতই অপদার্থ ভাব না কেন, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু কেন যে আমি এমন কথা ব'ল্লুম তারও তো একটা মানে আছে? তুমি সেটা না শুনে কিছুতেই রাগ ক'রে চ'লে যেতে পাবে না।”

—“এর মানে আর স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে হবে না অরুণবাবু! যথেষ্ট বুঝেছি—গরীবের মেয়েকে আপনার

মত লোকে বিয়ে যে ক'রবে না তা খুব জানি—তার উপর এই বাড়ীখানাও তো সেদিন আপনি মার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন আর সেই টাকা দিয়ে বাবার কারখানার দেনা ও দেনদারদের পাওনা চুকিয়েছেন, আমরা এখন নিঃসম্বল বল্লেও তো বেশী বলা হয় না। এমন গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে আপনার লাভ কি বলুন ? আর সে আশা আমরাও করিনে কখন—এমন কি আপনি সাধাসাধি ক'রলেও নয়—কারণ গরীবেরও প্রাণ আছে অরুণবাবু! সেটা পয়সাও দেখেনা, রূপও দেখেনা—সেই প্রাণ জিনিষটা প্রাণই চায়! আপনার পক্ষেও যেমন ঘাড়ে চাপা আমার পক্ষেও ঠিক্ সেই রকম দুর্ব্বহ জীবন হবে যদি আপনাকে বিয়ে ক'রতে হয়—তাই আপনার মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই—"

—"তুমি রাগের মাথায় যা-তা ব'লছ কেন রূপা ? আমার উদ্দেশ্য অবিবাহিত থেকে শিল্পের উন্নতি করা। বিয়ে ক'রলে আমার ছবি আঁকার শক্তি ও সুযোগ আর তেমন মিলবে না সেইজন্যে। একটা কোন বিষয়ে সাধনা ক'রতে গেলে একাগ্র না হ'লে হয় কি তা ? তুমি তো এ সব বইতেই প'ড়েছ, তুমিই বলো না ?" রূপার মুখ এতক্ষণে অনেকটা প্রসন্ন হ'য়ে এসেছিল, এবার সে শান্তস্বরে বল্লে "বিয়ে ক'রলেই বা আপনার ছবি আঁকার ক্ষতি কি ?"

—"ক্ষতি এই—প্রথমতঃ সংসারের অনেক হেঙ্গাম

আছে তাতে ক'রে সময় কমে যাবে একাগ্রতাও নষ্ট হবে, দ্বিতীয়তঃ আমি স্বাধীনভাবে যে সে মেয়ের ছবি আঁকতে পারবো না, কারণ সেটা আমার স্ত্রী না পচ্ছন্দ ক'রতে পারেন। তার চেয়ে বিয়ে না করা ঢের ভালো—"

যে অরুণকে সে একটু আগে ঘৃণা করেছিল এখন সেই অরুণের উপর শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা রূপার হৃদয়ের কোণে কোণে উঁকি মারতে লাগ্‌লো--এই যে ত্যাগস্বীকার, এই যে সংযম—এ কি যে সে লোকে পারে? যথার্থই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি ভিন্ন জীবনে এমন সত্যের প্রতিষ্ঠা করা যার তার সাধ্য নয়। দুজনেই চুপ্ ক'রে থাক্‌বার পরে অরুণ আবার বল্লে, "রাগ গেলো? কথা না বুঝে কেবল ছেলেমানুষী করা—"

—"আচ্ছা আর ছেলেমানুষী ক'রব না, বলুন কি কাজ ক'রতে হবে?" রূপার মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখে অরুণ বল্লে—"তোমার মুখ আজ বড্ড শুখ্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কি হ'য়েছে?"

—"কিছু না।"

—"কাঁদছিলে?"

—"কাঁদবো কেন? আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন না কি?" ব'লেই রূপা জোর ক'রে একটু হাসলে। সে হাসির মধ্যে যে কত খানি ব্যথা লুকান ছিল অরুণের কবিচিত্তের কাছে তা সম্পূর্ণ গোপন রইল না। এবার অরুণ বল্লে —"তোমার আর কাজ ক'রে কাজ নেই, তাতে আরো

ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়বে। তুমি এখন বিশ্রাম করগে যাও, বিকেলে খুব প্রফুল্ল দেখান চাই বুঝলে? আর আল্‌তা রঙ্গের বেনারসী ও তার সঙ্গে নীলার গহনা প'রো—বেশ সুন্দর ক'রে সাজা চাই—ঠিক্ ৪টের সময় প্রস্তুত হ'য়ে আমার কাছে উপরে এসো, ৪॥ টার সময় লোক আস্‌বে।" রূপার মনটা আজ কিছুতেই বাধ্য শিশুটীর মতন অরুণের আজ্ঞা নির্ব্বিবাদে পালন ক'রে চ'লতে পারছিল না। যখন সমস্ত অন্তর দিয়ে সে চাইছিল একটু খানি নিরিবিলি— একটু খানি বিশ্রাম ও শান্তি তখন যদি তাকে সেজে গুজে দম দেওয়া কলের পুতুলের মত এই কষ্টসাধ্য অভিনয় ক'রে চ'লতে হয়, তা হ'লে তার মত পরাধীনতা আর কি হ'তে পারে? আজ তার সমস্ত হৃদয় যখন একটা নূতন জানা দুঃখ, আশঙ্কার উদ্বেগে তোলপাড় ক'রছে, তখন সে কেমন ক'রেই বা সকলের মনস্তুষ্টির জন্য প্রফুল্লতার ভাণ ক'রে সকলের কাছে নিজের রূপের বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াবে? একটু দৃঢ়স্বরেই রূপা বল্লে "দেখুন আজ আমি সেজে গুজে বাহার দিয়ে বেড়াতে পারবো না—আমায় মাপ ক'রবেন।" রূপার এই কথায় রাগটা কম হয়নি কিন্তু অরুণ সেটা দমন ক'রে বেশ ধীরস্বরেই বল্লে, "তা হ'লে তো আজ সবই পণ্ড হ'ল, শিবহীন যজ্ঞের মতন!" অরুণের চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছিল, সে আর কিছু না ব'লে চ'লে যাচ্ছিল। রূপার মনটা তৎক্ষণাৎ নরম হ'য়ে গেলো—সত্যিই তো, এত

পয়সা খরচ ক'রে তার জন্যেই তো এ আয়োজন হ'য়েছে, আর সে যদি সামান্য একটু অসুখের অছিলায় এতে যোগ না দেয় তা হ'লে সেটাই বা কি রকম দেখাবে? দূর হ'ক্ গে— ! নিজের সমস্ত দুঃখ নিরাশা মনের এক কোণে সরিয়ে রেখে অভিনয় ক'রেই যাবে সে। বিষণ্ণ অরুণকে ফিরিয়ে সে বল্লে, "আচ্ছা, তা হ'লে ৪টের সময় উপরে আস্‌বো—আপনার কথাই রইলো।"

১২

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা মাখা
মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায় ক্ষণে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

—কল্পনা

তারপর তিন মাস কেটে গেছে। আনন্দকিশোর আর ফিরে আসেননি। এত টিপার্টি, ডিনার পার্টি দিয়েও রূপার যোগ্য বর খুঁজে না পাওয়ায় অরুণ অধীর হ'য়ে উঠেছিল রূপার মার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিষণ্ণ মুখ দেখে। এদানি তারাদেবীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়্‌ছিল, সিঁড়ি উঠ্‌লে হাঁপ ধরে, আহার নাম মাত্র, চেহারা রোগশীর্ণ। মায়ের দিকে চেয়ে রূপা অতি কষ্টে অশ্রু রোধ ক'রে রাখে, তার সেই সুন্দর মুখে হাসি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, হঠাৎ বয়োবৃদ্ধ হ'য়ে যাওয়ার মত তার চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা, এমন কি চোখের চাহনি পর্য্যন্ত কেমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গাবতী ছেলেকে ডেকে

বল্লেন, "তুঃখিনী বিধবার শেষ সাধ আর অপূর্ণ রাখিস্‌নে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে দে তাঁকে, নইলে এই অনূঢ়া মেয়ে রেখে ম'রেও শান্তি পাবেন না।" আজকালকার দিনে এমন সহৃদয়া মা প্রায় দেখা যায় না, নইলে বড় ঘরের কুটুম্বিতার লোভ ছেড়ে কে আর মৃত্যুশয্যাশায়িনী গরীব বিধবার অসহায়া মেয়েকে বৌ ক'রে নেবার জন্যে ছেলেকে অনুরোধ উপরোধ ক'রে থাকে? মার কথা অরুণ ঠেল্‌তে পারলে না। তা' ছাড়া উপায়ও ছিল না। বাড়ীতে নহবৎ ব'সে গেলো, নতুন রঙ্গিন্‌ কাপড় প'রে চাকর-দাসীরা ছুটাছুটী লাগিয়ে দিলে, দেশ থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রজা, আশ্রিত-আশ্রিতার দলে বাড়ী পরিপূর্ণ। তুর্গাবতী হাসিমুখে ছেলের বিয়ের উদ্যোগে উদ্ব্যস্ত, সরকার আমলারা লাল-নীল রেশমী চাদর উড়িয়ে তত্ত্বাবধানে লেগে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুমূর্ষু জননীর ওষ্ঠ বেয়ে কি শান্তির হাসিই ফুটে উঠ্‌লো—আঃ! এতদিনে নিশ্চিন্ত! মায়ের রোগ-প্রফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে রূপার ব্যথা ভরা চোখ তুটী মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মেয়ের গলার ফুলের মালা, চন্দন-চর্চ্চিত কপাল ও গোলাপী রঙ্গের নূতন বেনারসী সাড়ীর দিকে চেয়ে, হাত নেড়ে অস্ফুট স্বরে তারাদেবী বল্লেন, "আহা! কি সুন্দর মনিয়েছে আজ! যদি তিনি আজ বেঁচে থাক্‌তেন! কি দিয়ে

আজ তোকে অরুণের কাকা মহাশয় আশীর্ব্বাদ ক'রলেন ?"

ফোয়ারা প্যাটার্ণের হীরের বালা দেখিয়ে রূপা বল্লে, "এই বালা জোড়া দিয়ে।"

—"আহা ! চমৎকার ! সন্ধ্যাবেলা রুগীর কাছে থাকতে হবে না, যা একটু বেড়িয়ে আয়।" ডাক্তারে ব'লেছে রূপার মার হৃদ্‌রোগ, যে কোন দিন হঠাৎ শেষ হ'য়ে যেতে পারে। রূপার কাছ থেকে এ কথা লুকিয়ে রাখা হ'য়েছিল, অরুণ ও দুর্গাবতী শুধু এ কথা জান্‌তেন।

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে রূপা আস্তে আস্তে সেই অশোক গাছের তলায় গিয়ে ব'সে পড়্‌ল। সুসজ্জিত দেহ-খানার দিকে চেয়ে দেখে তার মনে হ'ল এ যেন একটা প্রচণ্ড বিদ্রূপ! তার হাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কি কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, সেটাও সে ঠিক্ বুঝতে পার্‌ছিল না। মানুষের সমস্ত দুঃখকে যখন কর্ত্তব্যের চাপে বুকের ভিতর চাবি দিয়ে রাখতে হয়, তখনই বোধ হয় তার এইরূপ অবস্থা হয়। সানায়ের সুরে পূরবীর মধুর তান সমস্ত বাড়ী-খানা এমন কি পাড়াটাকে শুদ্ধ আগত উৎসবের সমা-রোহ শোভার লীলায় সচকিত ও সজাগ ক'রে তুলেছিল, শুধু এই বর্ষাসন্ধ্যার নিবিড় মেঘ ঢাকা আকাশের মতন রূপার হৃদয়-গগনে সে সুর কোনমতেই আনন্দ-হিল্লোল তুলতে পারছিল না। আষাঢ়ের নব ঘন মেঘ রূপার দুই চোখে

জমা হ'য়ে কেবলি ঝ'র্‌ছিল—ঝর্ ঝর্! রূপা ভাব্‌লে এ বিয়ে বন্ধের তো কোনো পথই তার হাতে নেই—তা করে আসন্ন-মৃত্যু জননীকে কষ্ট দেওয়া! ছিঃ, এত বড় পাপ সে কর্‌তে পারবে না। চিরদিনই সে দুঃখের বোঝার মত, উদ্বেগের কাঁটার মত, মাকে দুঃখ ও অশান্তি দিয়ে এসেছে, আজ তাঁর মৃত্যুর সময়েও যদি তাঁকে শান্তিতে মর্‌তে না দেয়, তা হ'লে তার চেয়ে দুষ্কৃতি অতি বড় মহা-পাতকেও করেনি যে! তার নিজের ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সমস্তই ভুলে যেতে হবে—বিধবা জননীর আশা মেটাতে! নিজের ধর্ম্মের চেয়েও বড় অন্যকে শান্তি দেওয়া —এর তুলনায় আর সমস্ত অতি তুচ্ছ! তা ছাড়া অরুণ যে তাকে ভালবেসেছে এটা নিশ্চিত, নইলে বিয়ে কর্‌বে কেন? শুধু পরদুঃখে সহানুভূতি দেখাবার জন্যে? না, তা নয়, তা যদি হ'ত, তা হ'লে সে ছাড়া আর কারো ছবি কেন সে আঁকতে চায় না? এটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়— অরুণের প্রেমের গভীরতার পক্ষে? কিন্তু—কিন্তু কোথায় যেন, কি যেন বাদ প'ড়ে গিয়েছে—আনন্দকিশোরের বন্ধুত্বের মধ্যে যে আত্মহারা সুখ, অরুণের প্রীতির মধ্যে তা' তো নেই? এ সব প্রশ্ন তার মনেই বা উঠ্‌ছে কেন? অনধিকারচর্চ্চায় তার দরকারই বা কি! আকাশের অসীম বুকে সারাদিনরাতের প্রতি মুহূর্ত্তে কত রং বেরঙের আল্‌পনা চোখকে মুগ্ধ করে, পাগল বনের শ্যামল ছায়া স্নিগ্ধ

আলিঙ্গনে বুকে তুলে নেয়, ফুলের সুরভি বয়ে দিয়ে যায় কত স্বপ্নভরা সুখের পাথার, বিভোর করা আনন্দ, তাই ব'লে তাদের তো আর ধ'রে বেঁধে পোষা পাখীর মত ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা যায় না—দিয়ে যায়, দিয়ে চ'লে যায়; অনুভূতির মধ্যে তাদের স্মৃতিটুকু শুধু থাকে। তাতে ক'রে তো এ বলা চলে না যে, "ওগো মেঘ! সেদিন তুমি যে রঙ্ দিয়ে চোখ ভুলিয়েছিলে, আবার সেই রঙ্ চোখের উপর বুলিয়ে দাও" বল্লেই বা শুনছে কে? পাগলের প্রলাপ ছাড়া লোকে তাকে আর কোন আখ্যাই যে দেবে না! তাদের প্রাণ-জুড়ান নিষ্কাম দানের বদলে আমরা শুধু স্মৃতির মধ্যে তাদের পূজা করা ছাড়া আর কিছুই তো করতে পারি না। তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি নমস্য, তিনি শ্রদ্ধেয়, তিনি সার্থক। এই মনে ক'রে তাঁকে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করতে পাওয়াই কি তার মত একজন অতি ক্ষুদ্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

ভাবনাস্রোতে রূপা তার সমস্ত বর্ত্তমানকে হারিয়ে ফেলেছিল, হঠাৎ তার মনে হ'ল তার সমস্ত গা যেন ভিজে উঠেছে। চেয়ে দেখলে কখন থেকে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একেবারে সিক্ত। তাই তো—ভালো কাপড়টা নষ্ট হ'য়ে গেলো যে! কেয়াফুলের মিষ্ট গন্ধ ভিজে বাতাসের সঙ্গে মিশে রূপার মুখের উপর দিয়ে ব'য়ে গেলো, আকাশে ঝিলিক্ হান্‌ছিল, দূরে কোথায় একটা বাজ পড়্‌ল।

১৩

"দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়
* * *
এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাবো
নিতে কে পারিবে মোরে
কে আমারে পাবে আঁকড়ি রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে
* * *
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না
কত যে আকুল আশা
কত যে তীব্র পিপাসা-কাতর ভাষা!"

—মানসী

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি ও প্রেমের পরিবর্ত্তে সরল বন্ধুত্বের আদান-প্রদান দেখে অরুণের মা মনে মনে খুবই দমে গেলেন। কেন? রূপাকে তো অরুণ তাঁর পছন্দই করেছিল! এমন সুন্দর সুশ্রী সুশিক্ষিতা মেয়েকেও অরুণ যদি ভালো বাস্‌তে না পারে, তা হ'লে সেটা দোষের বই কি! দোষের হ'লেও ছেলের বিরক্তির ভয়ে অরুণকে তিনি মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌লেন না। অরুণ তার আঁকবার ঘরের আস্তানা ছেড়ে নববধূর নূতন

সুসজ্জিত শয়নঘরে একবারও পা দিয়ে মাড়াবার অবসর পেত না—না দিনে না রাত্তিরে। নববধূও নিজের তিন-তালার নূতন শোবার ঘরে নেহাৎ দরকারের সময় ছাড়া আস্তো না বেশী! এক তালার সেই ঘরেই মায়ের কাছে তার অবসর সময়; তা ছাড়া দুর্গাবতীর ঘরেই ও তাঁর সঙ্গে কাজকর্ম্মে তার অধিকাংশ সময় কেটে যেতো। নববধূর সঙ্গে অরুণের দেখা-শোনা বা আলাপ-পরিচয় বিয়ের পর যতটুকু হয়েছিল, তা বিয়ের আগের চেয়ে বেশী নয়। তাই ব'লে অরুণকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সে ছিল চির নবীনত্বের—চির সৌন্দর্য্যের উপাসক! অবশ্য সেটা বাহ্যিক দিক্ দিয়ে—! কাজেই তার শিল্পের দিক্ দিয়ে তার মন অনবরতই নব নব দেহের অভিনব সৌন্দর্য্য খুঁজে বেড়াত। সে ক্রমশঃ রূপার সৌন্দর্য্যের সঙ্কীর্ণতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে না পেরে, অন্য আদর্শের নূতন সৌন্দর্য্যে নিজের শিল্প-সাধনাকে নবীনতা দিতে চেষ্টা কর্‌ছিল। তখন সে বুঝ্‌তে পারেনি যে, দেহের সৌন্দর্য্যে চির নবীনতার আশা করাটা কত বড় ভুল! অন্তরের মধ্যেই যে সেই আসন পাতা আছে! শিল্প-সাধনাকে যে সেই অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে চির নবীনতায় ভূষিত করতে হবে, তা তখন তার খেয়াল হয়নি! একই মুখ রোজ দেখা এও যেন তার জীবনে অভিনবত্বের হ্রাস ক'রে দিচ্ছিল—কারণ রূপার মুখ ছাড়া ও দেহ ছাড়া রূপার মধ্যে আর

কিছু দেখবার তার খেয়ালই ছিল না। তার চির অতৃপ্ত হৃদয় রূপার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও শান্তি খোঁজবার চেষ্টা কখন করেনি আর রূপার হৃদয় যে মানুষেরই মত আশা আনন্দ আবেগ প্রণয় দিয়ে গড়া, এটাও সে ভুলে যাচ্ছিল জড় মূর্ত্তির নিশ্চল প্রতিমা গড়ে গড়ে। এমনিতর কল্পনার ঝোঁকে ও আঁকবার নেশায় অরুণের দিনগুলো তারও অজ্ঞাতসারে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু রূপার দিন কাটান ততই দুষ্কর না হ'য়ে উপায় ছিল না। কাজ তার কম ছিল তা নয়, কিন্তু এই উদ্বেল আবেগভরা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাকে দিনরাত যে কেমনতর উন্মনা ও উদ্দাম ক'রে পীড়ন কর্‌ছিল, তা শুধু তার অন্তর্য্যামীই জানেন। সে এক এক বার ভাব্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত—আচ্ছা সে কি চায়? তার অভাব তো কিছুরই নেই, যার জন্যে তার বুকের মধ্যে দিনরাত এমন হু হু করে, চোখ ছাপিয়ে জল আসে, নিজের দেহের প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাইলেই আরও যেন তার কান্না পায়! এই যে পরিপূর্ণতা, একে প্রিয়তমের পায়ে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে নিজেকে শূন্য করে ফেল্‌তে পারছে না বলেই বুঝি তার সমস্ত নারী-চিত্ত মথিত ব্যথিত ক'রে আকুল কান্না নেমে আস্‌তো। অরুণের পায়ে নিবেদনের জন্যই তো তাকে তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু অরুণের তো এই নতুন পাওয়া জিনিষটী পাবার জন্যে মোটেই আগ্রহ নেই। আর যদি ধরো অরুণের

আগ্রহ থাক্‌তো, তা হ'লে সে কি ক'র্‌ত? যদি তিনি আজই ঘরে এসে দাঁড়ান? এই খানে তার মন আবার কিন্তুতে ভ'রে ওঠে, নিজেকেই নিজে চোখ রাঙ্গিয়ে তখন সে আবার ভাবে," অরুণ—অরুণ—! অরুণ ছাড়া আর কেহই যে তার দেহ-মনের এতটুকুও অধিকারী নয়। অরুণ যদি তাকে দয়া ক'রে আপনার ক'রে নেন্‌, তা হ'লে তখন তার সব দুঃখ, সব বেদনা নিশ্চয়ই ধুয়ে মুছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাবে। নারী-জীবনের মধ্যে এমন একটা সময় আসে, যখন নিজের রূপ-যৌবন নিজেই উপভোগ ক'রে সে কিছুতেই তৃপ্তি পায় না—যতক্ষণ না তার অন্তরের মাধুরী-নিঙ্‌ড়ান সমস্ত সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস প্রিয়তমের উপভোগ্য ক'র্‌তে পারে, ততক্ষণ সে কিছুতেই শান্তি পায় না। এই যে বিলিয়ে দেওয়া বা বিকিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছা, এই দুর্নিবার জোয়ারের স্রোতে রূপার সমস্ত হৃদয় ভেসে গিয়েছিল। তা'কে তীরে টেনে আন্‌বার শক্তি যদি কারো কাছে থাকে তা হ'লে তা তার স্বামীর কাছেই ছিল—কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

নিজের ঘরে বড় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রূপা চুল বাঁধ্‌ছিল; বাইরে থেকে দুর্গাবতী তাকে ডেকে বল্লেন, "ও বৌমা, শিগ্‌গির নীচে এসো, তোমার মার অসুখ বেড়েছে।"

—"এই মাত্র যে আমি মার কাছ থেকে আস্‌ছি।"

—"এই মাত্রই খবর পেলুম।" শাশুড়ীর সঙ্গে রূপা নীচে

নেমে গেল। তারাদেবীর অন্তিম নিঃশ্বাস তখন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। মার শোকে রূপা যতটা কাতর হ'বে সবাই ভেবেছিল, ততটা কিন্তু সে হ'ল না। হয় তো আগে হ'লে তাকে শান্ত করা অসাধ্য হ'ত, কিন্তু আজ সে বেশ ধীর-ভাবেই মায়ের বিচ্ছেদ মাথা পেতে নিলে। যাক্, তিনি তো শান্তি পেয়েছেন! নইলে তাঁকে হয় তো আরও কত কি দেখ্তে হ'ত! খবর পেয়ে অরুণও একবার এলো কিন্তু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা সে খুঁজে পেলে না। সেদিন রাত্রে ভূমি-শয্যায় কম্বলের উপর শুয়ে শুয়ে রূপা ভাবলে—তার আজ শেষ বন্ধন যেন ছিঁড়ে গিয়ে একেবারে তাকে মুক্তির রাজ্যে যাবার নিশানা দেখিয়ে দিলে। কিন্তু —মা—মা তো আর ফিরে আস্বেন না? মায়ের সেই মুখ আর তো সে দেখ্তে পাবে না গো? তারপর রূপার মার শ্রাদ্ধাদি চুকে গেলে ছেলেকে খাওয়াতে ব'সে দুর্গাবতী একদিন বল্লেন, "তোর এবার উপরে থাক্লে হয় না? দিন-রাত বাইরে বাইরে থাকা কি ভালো? নাতি দেখ্তেও তো আমার সাধ হয়।" অরুণ এক ঢোক জল খেয়ে বল্লে, "বাইরে বাইরে আর কই থাকি মা! আমায় বাড়ী ছেড়ে কখনো বেরুতে দেখেছ? আর খারাপই বা কি আছে এতে? আমি তো আর মাতাল বা আর কিছু নই যে—"

—"আঃ! তা কে বল্‌ছে বল্! তবে কি না ছেলেমানুষ বৌ, ওর ও তো সাধ আশা আছে, দিনরাত একলাটী থাকে।"

—"তা হ'লে আমার আঁকা ফাঁকা সব গোল্লায় যাবে। তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে আমার সব গেলো—ঐ জন্যেই তো আমি বিয়ে কর্‌তে চাইনি মা।"

—"তবে তুই যা ভালো বুঝিস্ কর্ বাবা।" ইহারও মাসখানেক পর নাতির মুখ দেখার সাধ এ জন্মে তাঁর ব্যর্থ ই জেনে, একদিন শ্রাবণের মধ্যাহ্নে দুর্গাবতী রামনগরের উদ্দেশে রওনা হ'লেন। সেখানে খুব ধূমের দুর্গাপূজা—আগে থেকে তার যোগাড় চাই তো!

তাঁর যাবার সময় রূপা আর চোখের জল রাখ্‌তে পারলে না। এই শাশুড়ীই ছিলেন তার একমাত্র সঙ্গী, তিনিও আজ ছেড়ে যাচ্ছেন, এবার এই এত বড় বৃহৎ পুরীতে সে শুধু এক্‌লাই রইল—তার অদৃষ্টের সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্‌তে। মাতৃস্থানীয়া তিনি যখন বধূকে পূজার সময় অরুণের সঙ্গে দেশে যাবার আদেশ দিয়ে ও অনেক উপদেশ আশীর্ব্বাদ দান ক'রে চ'লে গেলেন, তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে রূপার মনে হ'ল সে আজ থেকে সম্পূর্ণ একাকী!

১৪

আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল-শিখায় কি করিনু খেলা,
দিন শেষে দেখি ছাই হ'ল সব হুতাশে ;
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে !

—কল্পনা

তারপর—তারপর দু' তিন দিন বাদে একদিন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে, "তুমি দিন দিন বড় শুকিয়ে যাচ্ছ রূপা, না ? মা গিয়ে তোমার আরও এক্‌লা মনে হ'চ্ছে বুঝি ? কাজ নিয়ে থাক্‌লে কিন্তু সময় বেশ কাটে। আমি বলি তুমি এক কাজ করো।"

—"কি বলুন ?" পূর্ব্ব অভ্যাস মত রূপা এখনও অরুণকে আপনি সম্বোধনই করতো। অরুণ তাতে কখন বাধাও দেয়নি, রূপাও তার অভ্যাস ছাড়্‌তে ব্যস্ত হয়নি। অরুণ বল্লে, "আমার কাছে তুমি আঁক্‌তে শেখো। দিন কতক শিখলেই তুমি দক্ষ হ'য়ে উঠ্‌বে। তারপরে একটা আঁকার মেয়ে ইস্কুল খোলা যাক্—তুমি হবে তার প্রতিষ্ঠাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। প্রথমে বাড়ীতেই ক্লাস খোল। অনেক মেয়ে আছে যাদের আঁক্‌বার দিকে ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও শেখ্‌বার সুযোগ নেই।" এই প্রস্তাবে রূপার বিষণ্ন মুখে একটু উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌লো, একটু ভেবে সে বল্লে, "তার

চেয়ে আপনি শিক্ষক হন, আর আমরা সবাই আপনার ছাত্রী হই।”

“কিন্তু তাতে কি দোষ হবে জানো—অনেক মেয়ে আছে যারা পুরুষ শিক্ষকের কাছে শিখতে চায় না, মেয়ে শিক্ষক শেখাচ্ছেন শুন্‌লে আগ্রহের সঙ্গে আস্‌বে।’

—“তা হ’লে আমার নামেই ইস্কুল করুন, আপনিই শেখাবেন, আমি উপস্থিত থাক্‌বো।”

—“হ্যাঁ, সেই বেশ হবে, তা হ’লে তুমি অনেক নূতন সঙ্গীও পাবে অনেকের সঙ্গে আলাপও হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিই, কি বলো?”

—“তা দিন্ না, দেখুন না কি হয়।”

রূপা যখন কিছুতেই মনকে শান্ত কর্‌তে পারে না, তখন সে গীতা নিয়ে এক মনে পড়্‌তে চেষ্টা করে, খানিকক্ষণের জন্য মনটাও বেশ শান্ত হ’য়ে ওঠে, কিন্তু আবার কোথা থেকে যে সেই বিরাট শূন্যতা এসে তার সমস্ত অন্তর গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হয়, তখন তার শান্ত মনও আবার ব্যথায় বেদনায় আলোড়িত হ’য়ে ওঠে। এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার অন্ধকার ভাগ্যাকাশে অরুণলেখার মতন অরুণের দৃষ্টি তার একাকীত্বের উপর প’ড়ে যাওয়ায় সে একটা নূতন কাজ ও নূতন সঙ্গী পাবার আনন্দে একটু-খানি প্রদীপ্ত হ’য়ে উঠ্‌লো। ৪।৫ দিনের মধ্যেই ৬টী ছাত্রী রূপার ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার জন্যে আবেদন জানালে। অরুণের

আঁকবার ঘরের পাশেই বাইরের দিকের একখানা ঘর চিত্র-শিক্ষার ক্লাস ব'লে নির্দ্দিষ্ট হ'ল। সকাল ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাস খোলা, এর মধ্যে যে যতক্ষণ শিখতে চায় শিক্ষা পেতে পারে। বিনা বেতনের স্কুল—অরুণ একজন বিখ্যাত শিল্পী ব'লে ইতিমধ্যেই নামজাদা হ'য়ে উঠেছিল, কাজেই তার কাজেরও অন্ত ছিল না। তাই রূপাকে ডেকে সে বল্লে, "দেখো রূপা, আমি এই ক'খানা বই দিচ্ছি, এই এক নম্বর, দু'নম্বর, তিন নম্বর, এই রেখাগুলো তুমি ছাত্রীদের দিয়ে অভ্যাস করাও, একেবারে নির্ভুল হওয়া চাই—যে ক'দিন না হয় এই কাজই চল্‌বে—আমার অনেক কাজ প'ড়ে গেছে একটুও সময় নেই।" রূপার ছয়টী ছাত্রীদের মধ্যে ১টী বিধবা, ২টী সধবা ও তিনটী কুমারী। এরা ছয় জনেই প্রায় রূপার সমবয়সী—কুমারী ২টী ওদের মধ্যে যা একটু ছোট। সধবাদের মধ্যে একটীর নাম ছিল রাণী। সপ্তাখানেকের মধ্যেই রাণীই তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে উঠ্‌লো। রূপা যেমন চুপ্ চাপ্, রাণী তেমনি কথা কইতে পটু, ঠাট্টায় হাসিতে, গল্পে গুজবে সে যেন সারা ক্লাসটাই মাতিয়ে রাখে। মাসখানেক হ'ল রাণীর স্বামী কি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়েছেন—আজ যে তাঁর ফিরে আসার কথা আছে তা রূপা জান্‌তো না।

"আচ্ছা ভাই রাণী, তোমার স্বামীর জন্যে তোমার মন

কেমন করে না?" রাণী সলজ্জ মুখ নত ক'রে হাতের সূক্ষ্ম রেখাগুলির প্রতি নজর ক'রে চুপ্ করে রইল। রূপা কিন্তু আবার প্রশ্ন করলে, "না, লজ্জা করলে হবে না, তা হ'লে বুঝ্বো আমায় তুমি মোটেই বন্ধু ভাবো না— তা হ'লে কিন্তু আজ থেকে আড়ি।" রাণী এবার মুখ তুলে বল্লে, "আচ্ছা বেশ তো রূপা, তুমি আমার কথার উত্তর যদি দাও তা হ'লে আমিও তোমায় দেবো।"

—"আমি কেন উত্তর দেবো না? আমার তো কিছু লুকোবার নেই, তুমি যা জিগেস্ করবে তারই উত্তর পাবে।"

—"আচ্ছা, অরুণ বাবুকে তুমি "আপনি" "আপনি" কর কেন ভাই?" ব'লতে ব'লতেই চতুরা রাণী হেসে লুটিয়ে পড়্ল। সংসার-অনভিজ্ঞ-চিত্তা রূপা এ হাসির মানে ঠিক্ বুঝতে পারলে না, কারণ তার অন্তর এখনও বালিকা-সুলভ সহজ সরলের মধ্যেই বিচরণ করত। সে গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলে, "কেন তাতে দোষ কি? স্বামী যে স্ত্রীর সকল বিষয়েই পূজনীয়, স্বামীকে "আপনি" বলাতে আমি তো কিছু দোষ দেখিনে।"—"আমিও তো বল্ছিনে যে দোষ, কিন্তু এটা যে ভয়ানক অস্বাভাবিক ভাই!"

—"সকলের জন্যেই যে সব জিনিষ অস্বাভাবিক তা নয় রাণী! মানুষের মন ও প্রকৃতির উপর সব বিষয়ের

স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা নির্ভর করে।”

রাণী বল্লে, “তার মানে তোমার মন স্বামীকে “আপনি” ক’রে রেখেই খুসী, কি বলো ভাই ?”

—“তা বই কি। তুমি বুঝি তোমার স্বামীকে “আপনি” বলনি কখন ?”

—“তা কি আর বলা চলে! যেখানে এক মন এক হৃদয়, সেখানে ভদ্রতার ‘আপনি’ কত দিন চলে বলো ?” একটু পরেই রাণীর স্বামী রাণীকে গাড়ী ক’রে নিয়ে যেতে এলো। রূপা জানতো না রাণীর স্বামী গাড়ীতে অপেক্ষা কর্‌ছে। সে বরাবর বন্ধুর হাত ধ’রে গাড়ী অবধি তুলে দিতে এসেছিলো। স্বামী-স্ত্রীতে চোখোচোখী হ’তেই উভয়ের মধ্যে যে মিষ্টি হাসির বিনিময় হ’ল, তা দেখে রূপা একটু আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হ’য়ে গেল। ঘরে ফিরে গিয়ে সে কেবলি ভাব্‌তে লাগ্‌লো—এম্‌নি সব স্বামী-স্ত্রীতেই হ’য়ে থাকে, কেবল সে আর অরুণ ছাড়া! ঐ যে রাণী আর ওর স্বামী, ওদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব আছে কিনা—আচ্ছা সে কি রকম ভাব ? এই যেমন……

—এর পরে রূপা আর ভাব্‌লে না। জোর ক’রে মনের চিন্তাকে ফিরিয়ে নিয়ে সে হাত মুখ ধুতে উঠে গেলো। সে বেশ বুঝ্‌তে পারছিল, তার জীবনের যেখানটা একেবারে শূন্যের ঘরে পড়ে গেছে সেখানটা পূর্ণ কর্‌তে গেলে ঈশ্বরের প্রেম দিয়ে ভর্‌তে হবে, তদ্ভিন্ন তাকে পূর্ণ করা

অসম্ভব। আনন্দকিশোর চ'লে যাওয়ার পর থেকে সে আর বড় একটা ঠাকুরঘরের ওদিকে যেতো না। কিন্তু দুর্গাবতী চ'লে যাবার পর থেকে ঠাকুর-সেবার সমস্ত ভারই সে নিজে হাতে তুলে নিয়েছিল। বৃদ্ধ পূজারী শুধু নিয়মিত পূজা কর্‌তেন, আনুসঙ্গিক পূজার কাজগুলো রূপাই নিজে হাতে ক'রে যেতো। গীতা, ভাগবৎ, উপনিষদ্ পাঠও সে ঠাকুরঘরের সামনে ব'সে ব'সেই নিয়মিত সেরে নিত। এতে আজকাল তার আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ হয়েছিল। দুপুর বেলা আঁকার ক্লাস, সকাল বেলা অরুণের খাওয়া দাওয়া, সংসার দেখা, পূজার কাজ, সন্ধ্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও পূজার আয়োজন—এঁমনি ক'রে তার স্বামী-পুত্রের স্নেহ-বঞ্চিত শূন্য জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার লালপেড়ে গরদের কাপড় প'রে গলবস্ত্রে রূপা ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছিল। সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো তার সুন্দর কপালের উজ্জ্বল সিঁদুরের টীপটীকে স্বর্গীয় কিরণাভায় মণ্ডিত ক'রে দিয়েছিল। সেই সময় কি দরকারে অরুণ একবার উপরে এসেছিল, স্ত্রীর দিকে নজর পড়্‌তেই সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বল্লে, "কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়!"

শিল্পীর প্রাণ কি এত নিষ্ঠুর! দেহের সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কি কিছুই তাঁর নজরে পড়ে না? প্রাণের সৌন্দর্য্য, ত্যাগের সৌন্দর্য্য এ সব কি তাঁর হৃদয়ে কোন স্পন্দনই

তোলে না? তার মনে হ'ল—এই সামান্য তুচ্ছ দেহটার জন্যেই শুধু তার স্বামী এক একবার তার দিকে চেয়ে দেখেন, তা ছাড়া আর কিছুই দেখবার মত তাঁর স্ত্রীর মধ্যে নেই। যদি ধরো সে কুশ্রী, কুরূপা, হ'য়ে পড়ে তখন? উঃ—ভাব্‌তে রূপার মাথাটা ঘুরে গেলো—তার আগে তার মরণই ভালো!

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?
ও যে দুটী তারা দূর পশ্চিম গগনে
ওকি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনক মঞ্জীরে ?
ঝিল্লির রব বাজে বন-পথে সঘনে
মরীচিকালেখা দিগন্ত পথ রঞ্জিরে
সারাদিন আজি ছলনা করেছে হুতাশে
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে !

—মানসী।

নারীর জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার ও পূর্ণ সাফল্য—মাতৃত্বের গৌরবে নিজেকে অধিষ্ঠিত দেখা। কিন্তু সে গৌরব লাভের জন্যে রূপার মন ততটা ব্যাকুল হয়নি, যতটা সন্তানের ভালবাসা ও তাকে ভালবাসবার যে নিঃস্বার্থ অনাবিল ভাবটুকু—এইটুকু পাবার জন্যে মাঝে মাঝে লুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌তো। রূপার সমস্ত অন্তর শুধু চাইছিল—ভালবাসা আর ভালবাসতে! আর এই জিনিষটাই এত বড় বিশাল বিশ্বে রূপার ভাগ্যে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল! এদানী রাণী তাকে কবচ, মাদুলী, ঠাকুরদের ফুল ইত্যাদি ধারণ করিয়ে খুব আশা দিয়ে গিয়েছিল। রূপা সোৎসাহে ভাব্‌লে আঃ! তা হ'লে কি চমৎকারই হয়! সেই [illegible] ফুটফুটে

একরত্তি ছেলেকে সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এই ভালবাসা-হীন নীরস জীবনটাকে একেবারে সার্থক ও সরস ক'রে ফেল্‌বে। সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীর আঁকার ঘরে ঢুকেই রূপা বল্লে—"পূজোর তো আর দেরী নেই। কবে দেশে যাবে? মা যে রোজই তাড়া দিয়ে লিখ্‌ছেন।" অরুণ একটী রূপসীর নগ্ন চিত্রে রঙ্‌ ফলাচ্ছিল, স্ত্রীর দিকে না চেয়েই বল্লে, "আমি তাঁকে লিখে দিয়েছি—এবারে আর যাওয়া হ'ল না—এক্‌জিবিসানের জন্য অনেক কাজ।"

—"লিখে দিয়েছো?" ব'লেই রূপা হতাশভাবে স্বামীর সাম্‌নের এক খানা আসনে ব'সে প'ড়ে আবার বল্লে, "এই একঘেয়ে জীবন থেকে একটু রেহাই পাবো ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না তা হ'লে!"

আশ্চর্য্য হ'য়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে অরুণ ব'ল্লে—"এক-ঘেয়ে? একঘেয়ে কি দুইঘেয়ে তা আমি কাজের ভিড়ে বোঝ্‌বারও সময় পাইনে। তুমি তো কম কাজ পাওনি —তবুও তোমার এক্‌লা লাগে কেন বুঝ্‌তে পারিনে।"

রূপা এবার মন থেকে সমস্ত লজ্জা সরিয়ে দিয়ে জোর ক'রে বল্লে, "স্বামীর ভালবাসা না পেলে মনের অবস্থা এই রকমই হ'য়ে থাকে।" অরুণ এবার সত্যই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো—ফুলরেণুর মতই যথার্থ যার মন ও স্বভাব, সে সংসারের এত কথা বুঝ্‌ল কি ক'রে? ফুল-রেণুর যে বাসনা, কামনা জন্মাতে পারে, এ কথা অরুণের কোন দিনই

মনে হয়নি। তাই সে চিরদিনই এমনি ক'রে সরলা স্ত্রীকে স্ত্রীর অধিকার থেকে অনায়াসে ফাঁকি দিয়ে আস্‌বে ভেবেছিল। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রমে সে ভয় পেয়ে উঠ্‌লো—তার সাধনার পাছে কোন ক্ষতি হয়! সে ভয় মনে চেপে সে বল্লে, "এত কথা শিখ্‌লে কোথা থেকে?" লজ্জায় রূপার সমস্ত মুখখানা লাল হ'য়ে উঠেছিল, সে তবু জোর করে বল্লে, "বাঃ! আমি বুঝি কিছু জানিনে? রাণীকে তার স্বামী কত ভালবাসে—সে আমায় সব বলেছে।" এতক্ষণে রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি পেয়ে অরুণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। হাতের তুলিটা ফেলে দিয়ে সে ব'লে উঠ্‌লো "ওঃ! তাই বলো! ঐ সব যত ফাজিল মেয়েগুলোই তোমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে দেখ্‌ছি—রাণীর ফাণীর কথা তুমি শুনো না অত।" কতক বুঝে ও কতক না বুঝে আবার রূপা ব'লে ফেল্লে, "তা ব'লে কি আমি মা হ'তে পাবো না।" বল্‌তে বল্‌তে তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল—অরুণের নির্ম্মম হৃদয়ও এবার বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। নিজের স্ত্রী হ'লেও, নারীর মুখ থেকে আবেগ ও আবেদনভরা এত বড় কথাটা আবেগ-শূন্য হৃদয়ে নেওয়া সহজ নয়। বুকের দ্রুত স্পন্দন জোর ক'রে থামিয়ে অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের একটা বদ্ধ জানালা খুলে দিলে। স্বামীকে নিরুত্তর দেখে রূপাও চুপ ক'রে ভাব্‌ছিল—এবার সে কি কথা কইবে। বাইরে বাগানের অন্ধকার ভেদ ক'রে শ্রেণীবদ্ধ দেবদারু ও শিরীষ গাছের পাতার ফাঁকে

কাদা-থম্‌থমে রাজপথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। আকাশে কেবল থর-বিথর কালো মেঘের পাহাড় চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-ঝরণার ঝলক্‌। বর্ষার ভিজে বাতাস মালঞ্চে ঝরা কদম কেশর উড়িয়ে উড়িয়ে লজ্জানীরব দম্পতীর মধ্যে দৌত্য কর্‌বার চেষ্টা ক'রছিল। অরুণ জানালার কাছ থেকে সরে এসে নিজের চৌকিতে ব'সে পড়ে বল্লে—"আমার যদি যেতে দেরী হয় তুমি ঘুমিয়ে পড়ো—জেগে থাকবার দরকার নেই বুঝ্‌লে?" অরুণের কথায় রূপার এমন একটা লজ্জা হ'ল যেন সে যেচে যেচে স্বামীর ভালবাসা আদায় কর্‌তে ব্যস্ত। নারী হ'য়ে পুরুষের কাছে চাওয়া—ছিঃ! তার কি এতটুকুও আত্ম-সম্ভ্রম জেগে উঠ্‌ল না, যাতে ক'রে এ-ভিক্ষা থেকে সে নিরস্ত হ'তে পারতো। কিছু না ব'লেই রূপা চ'লে যাচ্ছিল। অরুণ তাকে ফিরিয়ে বল্লে—"জানো, কমলের ছেলেকে এরি মধ্যে আঁকা শেখাচ্ছে, আমার ছেলে হ'লে তাকেও খুব ছোট থেকে শেখাবো।" এই কথায় রূপার সমস্ত অভিমান রৌদ্র-গলা হিমকণার মত আনন্দরসে পরিণত হ'ল, লজ্জানতমুখে সে বল্লে—"শ্রীরামের চেয়েও লবকুশ বড় যোদ্ধা হয়েছিলেন।" শোবার ঘর যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও এখানকার জিনিষটা সেখানে ও সেখানকার জিনিষটা এখানে ক'রে রূপা প্রায় আধঘণ্টারও বেশী কাটিয়ে দিলে—এই প্রথম তিনি ঘরে আস্‌ছেন, তাঁর আবার এতটুকু অমানান বা অশোভনীয় কিছুই পছন্দ হয় না! অরুণের পছন্দ মত সে

ঘরের চারিদিক ঠিক্ আছে কি না দেখ্‌তে যখন ব্যস্ত তখন আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তার নজর পড়্‌ল। রাত্রিবাসোপযোগী কাপড় পরা তো এখনো তার হয়নি? কিন্তু পরক্ষণেই তার নজর পড়্‌ল বিছানার ভিতরে রাখা কবীরের কবিতার দিকে। তাড়াতাড়ি সে সেটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে বুক্ সেল্‌ভএ রাখ্‌লে। এই এতদিন ধ'রে সে যে এই সব পড়্‌লে তার কি লাভ হ'ল—ইচ্ছে ক'রে বন্ধন জড়াতে চাওয়া? অরুণকে যা ব'লে এলো, সত্যিই কি সে তা চায়? বেশ ছিল সে—যেমন ছিল তেমনিই সে থাক্‌তে চায় যে। কেন, আগেকার যুগে মানসপুত্রের কথা সে তো অনেক বইএ পড়েছে, তেমনি কি হয় না? ধরো কোন একটী গরীবের মা, বাপ্ হারা ছেলেকে যদি সে মানুষ করে, তা হ'লেই কি তার সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায় না? ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে রাত ১১টা বেজে গেছে তা তার হুঁসই ছিল না। অরুণের গলার আওয়াজে তার চমক্ ভাঙ্গলো। রূপার মনে এমন একটা অসহ্য বেদনা পীড়া দিতে লাগ্‌লো, যার থেকে সে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত কর্‌তে পার্‌লে না। বিছানায় শুয়ে প'ড়ে অরুণ বল্লে—"তুমি শোবে না?"

—"না"

—"এর মানে?"

—"মানে তো কিছু নেই।"

—"তবে ডেকে আন্‌লে কেন আমায় ?"

রূপা এবার নিরুত্তর। এর যে কি উত্তর দেবে সে তা কিছুতেই তার আড়ষ্টপ্রায় জিহ্বায় জুগিয়ে উঠ্‌লো না। বিরক্তি ও লজ্জায় অরুণের আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠেছিল ; স্ত্রীকে নীরব দেখে তা শতগুণ বেড়ে উঠ্‌লো। সে প্রায় চীৎকার ক'রেই বল্লে—"যা হ'ক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে—না হ'ল কাজ না হ'ল ঘুম। এমন ক'রে আর কখনও আমায় disturb করো না ব'লছি।" বল্‌তে বল্‌তেই দরজাটা সজোরে বন্ধ ক'রে অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

১৬

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে

আজ এই ফাগুন দিনের সকালে।

—গীতিমাল্য।

তার পর দিন সকালে উঠে রূপার মনে হ'ল—জীবনটা যতটা দুর্ব্বহ ছিল এই একটা রাতের মধ্যে তার শতগুণ হ'য়েছে। বেশ তো ছিল সে! কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধির কাজ কর্‌তেই বা গেলো? বেশী চাইতে গেলেই মানুষ তার সহস্রগুণ হারিয়ে বসে, এটাই সে প্রতিপদে আজকাল দেখ্‌তে পাচ্ছে তো! তার চেয়ে যা আছে, যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা তার উচিৎ। আর কিছু চাইবে না সে, আর কিছু বল্‌বেও না—শুষ্ক মরুর মত এই ভালবাসা-হীন পুরীতে শুধু কর্ত্তব্যেরই পূজা ক'রে কাটিয়ে দেবে। আর—আর—এই স্মৃতিচিহ্নগুলো কিছুতেই সে আর কাছে রাখ্‌বে না—এই বই খানার জন্যেই তো কাল রাত্তিরে অমন কাণ্ডটা হ'য়ে গেলো, নইলে সে তো শান্ত মনে ও স্থির দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রস্তুত হ'য়েছিল তার সঙ্কল্পকে বজায় রাখ্‌তে! রূপার সমস্ত অন্তর এ কথার বিরুদ্ধে ব'লে উঠ্‌লো—এ তো আর কিছু স্মৃতিচিহ্ন নয়, এ যে কবীরের কবিতা;—একে তো ফেলে দেওয়া যায় না। দিলে পাপ! তা হ'ক্‌ পাপ-পুণ্যের তার দরকার নেই। শ্রদ্ধা-ভক্তির

পাত্র এক স্বামী ছাড়া আর কেউই তার থাক্‌বে না আজ থেকে। তা স্বামী যদি তাকে নাও ভালবাসেন তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু কাল রাত্তিরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে এ বই খানা সে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেবেই দেবে। এখন কি করে সে অরুণের কাছে মুখ দেখাবে? তাঁর রাগই বা থামাবে কি করে? রূপার ভাবনায় দাঁড়ি দিয়ে বেশ সহজ ভাবেই অরুণ বারাণ্ডা থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—"শিগ্‌গির একবার আঁকবার ক্লাসে এসো, নতুন একজন ছাত্রী এসেছে তাকে ভর্ত্তি করে নিতে হবে।" স্বামীর কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষমা পাওয়ায় রূপার মনটা অরুণের প্রতি সম্ভ্রমে ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল। সে তাড়াতাড়ি স্বামীব দিকে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তেই বল্লে, "একটু দাঁড়ান, আপনার সঙ্গেই যাবো আমি।" কাছে এসেই অরুণের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে রূপা বল্লে—"আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

আঁকবার ক্লাসে যে নূতন ছাত্রীটী ভর্ত্তি হ'তে এসেছিলো তার বয়েস আন্দাজ ২০।২১শের বেশী হবে না—সঙ্গে একটী চার বছরের শিশু। রূপাকে দেখে মেয়েটী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার কর্‌লে। রূপা একটা চৌকীতে ব'সে প'ড়ে তাকেও বস্‌তে অনুরোধ ক'রে বল্লে,—"তুমি কি কল্‌কাতাতেই থাকো? নাম?" ব'লেই ছাত্রীদের নামের তালিকার খাতা বের করে রূপা তার মুখের দিকে চাইলে। সে আস্তে আস্তে বল্লে—"আমার নাম—চন্দ্রাবলী।"

"তোমার স্বামীর নাম ?"

—"কিরণধন দে।"

—"তোমার গার্জেন কে ? স্বামীই তো ?"

—"না।"

—"তবে ?"

—"আমার তো আর কেউ নেই—এই ছেলেটী শুধু।"

একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে রূপা বল্লে—"কল্‌কাতাতে কোথায় থাকো তা হ'লে ?"

—"কল্‌কাতায় আমি আজই এসে পৌঁছেছি—আমার বাড়ী বৃন্দাবনে ছিল।"

—"তা হ'লে তুমি কল্‌কাতার লোক নও ?"

—"না।"

—"এখানে কোথায় থাক্‌বে তা হ'লে ?"

চোখ নীচু করে মিনতির সঙ্গে মেয়েটী বল্লে, "কোন বড় লোকের আশ্রয়ে থাক্‌বার ইচ্ছে আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে—এই ছেলেটার কথা ভেবে—একটু আশ্রয় দেন—"

রূপার দয়ার্দ্র হৃদয় ছেলেটীর দিকে চেয়ে মমতায় ভ'রে উঠেছিল ; তার উপর মেয়েটির এই মিনতি-ভরা কথা। সে তাড়াতাড়ি বল্লে, "নিশ্চয়। আমার কাছে ছেলেটীকে নিয়ে থাক্‌লে আমি খুব খুসীই হবো, আমিও তো এক্‌-লাটীই থাকি। কিন্তু আমার সন্ধান তুমি কি ক'রে পেলে তা

তো বুঝ্তে পার্ছিনে।” রূপার নিরহঙ্কারিতায় ও স্নেহ-করুণার স্পর্শে অপরিচিতার দুঃখাহত চিত্ত অনেকটা ভরসা পেয়ে কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠেছিল। ইনি এত ভালো? এত বড় ধনী লোকের স্ত্রী, এতটুকু গর্ব্ব নেই, এতটুকু কার্পণ্য নেই অপরিচিতা একজনের ভার গ্রহণে! মুখ তুলে সে বল্লে, “বৃন্দাবনে একজন বৈষ্ণব ঠাকুর এক আশ্রম খুলেছেন, সেখানে রুগ্ন ও অক্ষম হ'য়ে পড়ার দরুণ যারা স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েছে, তাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব তিনি সেই আশ্রম থেকে মোচন কর্ছেন। যদি সুস্থ সবল হ'য়ে ওঠে, তখন আশ্রম তাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্যে কোন না কোন একটা পথ দেখিয়ে দেন। আমার খুব ব্যারাম হ'য়েছিল, তাই আমার স্বামী আমাকে—” বেচারী আর বল্তে পার্লে না, পূর্ব্ব-স্মৃতি মনে জাগায় তার দুঃখ আবার নূতন ক'রে জেগে উঠেছিল। রূপারও চোখ শুষ্ক ছিল না, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়? অপরিচিতার প্রতি সহানুভূতিতে তার সমস্ত নারীচিত্ত মথিত হ'য়ে উঠেছিল। সে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, “এই একটী ছেলে?”

“হ্যাঁ, স্বামী আবার বিয়ে কর্লেন। অকর্ম্মণ্য স্ত্রী নিয়ে তো আর কাজ চলে না, কাজের জন্যই তো স্ত্রী; ঘরে বসিয়ে রাখার জন্যে তো কেউ বিয়ে করে না। এ ধারে রোগে ভুগে ভুগে আমার এমনি অবস্থা তখন যে, এক পা' নড়্বার ক্ষমতা নেই, যে দিন পথে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল সেদিন

যে কি অবস্থা! ভগবানের দয়ায় তার পর বৈষ্ণব ঠাকুরের দেখা পেলুম। অমন মানুষ যে এখনো পৃথিবীতে আছে এইটাই আশ্চর্য্য! ছেলেটার হাত ধ'রে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি, এগিয়ে এসে বল্লেন, 'কাঁদো কেন মা?' ব'লেই ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন সেখানে আমার মত হতভাগিনী আরও ২০।২৫ জন আছে। তার পর এই এক বছরে আমার রোগ সেরে গেল—তাই ঠাকুর বল্লেন, 'তুমি তো এখন সবল হ'য়ে উঠেছ, এখন কোন একটা কাজকর্ম্ম করো ছেলেটাকেও ইস্কুলে দাও।' তার দু'চার দিন পরে খবরের কাগজ দেখে তিনি বল্লেন, 'কল্‌কাতায় একজন খুব বড় জমীদার আঁক্‌বার ইস্কুল করেছেন, তাঁরা খুব বড় লোক আর ভালো লোক—বিশেষতঃ বাড়ীর গিন্নি যিনি তিনি যদিও ছেলে মানুষ, তা হ'লেও ছেলের আর তোমার আশ্রয় ও অন্নের অভাব তাঁর কাছে কখন হবে না।"

নির্ব্বাক্ হ'য়ে রূপা শুনে যাচ্ছিল—এ যেন সেই আলাদীনের প্রদীপের মত! অজ্ঞাত কে এক বৈষ্ণব সুদূর বৃন্দাবনে যমুনা-তটে ব'সে ব'সে রূপার সমস্ত কথা প্রদীপের ভিতর থেকে জেগে ওঠা দৈত্যের মুখ থেকে জান্‌তে পেরেছেন। সে উত্তেজিত হ'য়ে জিগেস্ কর্‌লে, "তিনি আমায় চিন্‌লেন কি করে? আমি তো তাঁকে চিনিনে।"

এবার ক্ষীণ হাসি অপরিচিতার মুখে ফুটে উঠ্‌লো, সে বল্লে, "তিনি যে আপনাদের চেনেন।"

—"কি ক'রে চিন্‌লেন ?"

—"এ বাড়ীর ঠিকানা আর আপনাদের নাম দেখে।"

—"আমাদের নামই বা কি ক'রে চিন্‌লেন ?"

—"তিনি যখন কল্‌কাতায় ছিলেন তখন যে এই বাড়ীতে ছিলেন বল্লেন—"

আনন্দ ও আশার উৎসাহে রূপার চোখ দু'টো দপ্‌ দপ্‌ ক'রে উঠেছিল—তবে কি সেই বাঁধন-হারা প্রবাসীর—নির্দ্দয় নিরুদ্দিষ্টের সংবাদ পাওয়া গেলো আজ ? খাতা খানা হাতের মুঠোয় জড় হ'য়ে ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হ'য়েছিল, আবেগের বশে সেটা আরও চেপে রূপা বল্লে, "তাঁর পূরো নাম কি ?"

"—শ্রীআনন্দকিশোর—।"

"তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চির ভক্ত
এ কি সত্য ?"

—চয়নিকা

অরুণের কাছে রূপা যখন এই অপরিচিতার কাহিনী জানিয়ে তাকে ও তার ছেলেকে বাড়ীতে রাখ্‌বার কথা বল্লে, তখন অরুণও একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, "তা আনন্দ-কিশোর টাকা পেলে কোথায় যে আশ্রম খুলেছে ?"

—"তা কি জানি, বল্‌ছে তো তিনিই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা হ'লে ওদের এখানে থাক্‌তে বলে দি ?"

—"তা দাও না—তোমার পক্ষে ভালোই হ'ল, একজন সখী জুটেছে যখন !"

স্বামীর অনুমতি পেয়ে হৃষ্টমনে রূপা তাদের ডেকে নিয়ে উপরে চলে গেলো। ক্ষুধার্ত্ত মা ও ছেলেকে পেট

ভরে খেতে দিয়ে, নিজের একখানা কাপড় জামা চন্দ্রাবলীর হাতে দিয়ে রূপা বল্লে,—"যাও, মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এসো, আর তোমার ছেলের কাপড় আমি একটু পরে আনিয়ে দিচ্ছি।" চন্দ্রা যে কি ক'রে ধন্যবাদ জানাবে তা ভেবে ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না। কি ভালো মেয়ে ইনি! এমন আশ্রয় সে যখন পেয়েছে তখন আর তার কোন অভাবই হবে না। ভগবান্ এঁদের মঙ্গল করুন। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী, কি সুন্দর মানিয়েছে—ঠিক্ যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ! কাপড় ছেড়ে রূপার কাছে এসে বস্‌তেই রূপা তার হাতে পান দিয়ে বল্লে, "বসো!" ঘরের সামনে বারাণ্ডায় বেঞ্চি পাতা ছিল, সেখানে তাকে বস্‌তে বলে রূপা তার পাশে বসে প'ড়ে বল্লে, "তার পর—তোমাদের সেই আশ্রমের খরচ কি ক'রে চলে ?"

—"তাঁর নিজের দেশে যে জমীজমা আছে তারই আয়ে খরচ চালান; তা ছাড়া একজন কে ধনী মাড়োয়ারী তাঁর শিষ্য হয়েছে, তিনিও দেন।"

—"তাতেই চলে ?"

—"হ্যাঁ, তাই চল্‌ছে তো। তা' ছাড়া সেবার উদয়পুরের মহারাজা বৃন্দাবনে এসেছিলেন, সে সময় আশ্রম দেখে ক'হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ রকম যখনই কোন বড়লোক বৃন্দাবনে আসেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু না কিছু চাঁদা পাওয়া যায় আশ্রমের জন্যে।"

—"যতগুলি মেয়ে আছে সবাই কি অনুপায় ?"

—"হ্যাঁ, তা' বই কি, কারও বা একটা হাত অক্ষম, কারও বা পা খোঁড়া, কেউ বা একেবারে কালা, কারুর বা জ্বরে ভুগে ভুগে শরীর একেবারে কঙ্কালসার—এই রকম সব।"

—"তাদের স্বামীরা কি বলে ?"

—"স্বামীরা বলে, ঘরের কাজ কর্‌তে না পার্‌লে যদি তবে আর স্ত্রী নিয়ে কি কর্‌বো, ঐ জন্যেই তো বিয়ে করা, বিশেষতঃ গরীব গৃহস্থের ঘরে।"

রূপা আস্তে আস্তে বল্লে—"আচ্ছা তুমি যখন চলে এলে, তখন তোমার স্বামী তোমায় একবারও দয়া ক'রে বল্লে না যে থাকো ?"

—"তা বল্লে কি আর আসি দিদি ? কাজ কর্‌তে পার্‌তুম না বলে রোজ তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি। উঠ্‌তে বস্‌তে গালাগালি, শেষে এমন মন বিগ্‌ড়ে গেলো যে একতিলও তিষ্ঠুতে ইচ্ছে হ'ল না আর।"

—"কেন, তোমার স্বামীর অবস্থা কি ভালো নয় ?"

—"অবস্থা এক রকম ভালো, বড় দোকান আছে একখানা আর যাত্রীদের জন্যে দু'খানা ছোটখাট 'কুঞ্জ' আছে—"

—"কুঞ্জ কি ? বাগান ?"

—"না দিদি—বৃন্দাবনে সব বাড়ীকেই 'কুঞ্জ' বলে। বাসামাত্রই 'কুঞ্জ'।"

রূপা একটু চুপ্ ক'রে থেকে বল্লে—"আমার কথা তিনি আর কি বল্লেন ?"

একটু হেসে চন্দ্রা বল্লে, "আপনার কথা প্রায়ই বল্‌তেন। বল্‌তেন—আপনাকে যে দেখেছে সে আর ভুল্‌তে পারে না, আপনার মধ্যেই তিনি অসীম সন্ধানের নিশানা পেয়েছেন আর তাই পেয়ে তিনি যে শান্তি পেয়েছেন তার তুলনা নেই—এই সব বল্‌তেন।" রূপার চোখের পল্লব আপনিই নত হ'য়ে পড়েছিল। চন্দ্রার প্রশংসমান দৃষ্টি ও বাক্য থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পার্‌লেই যেন বাঁচে—এমনি লজ্জা হচ্ছিল তার। অথচ অজ্ঞাত সংবাদ জান্‌বার লোভও সে সাম্‌লাতে পার্‌লে না, আবার বল্লে—"আমার যে এনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এ কথা তিনি কি করে জান্‌লেন ? তিনি তো আমার বিয়ে দেখে যান্‌নি ?"

—"বিয়ের খবরও তিনি জানেন বল্লেন। তাঁর মতন অমন লোক আর হবে না—শুধু আমি কেন—আশ্রমে তো অতগুলি মেয়ে রয়েছে, সবাই যেন তাঁর আপনার হয়ে গেছে।"

—"তিনি বিয়ে করেছেন ?"

—"না।"

—"কর্‌বেন না ?

—"না। ঐ পূজো নিয়ে আর পরের উপকার নিয়েই আছেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা আশ্রমে ব'সে মেয়েদের

ভাগবৎ, গীতা পাঠ করে বুঝিয়ে দেন্—কি মিষ্টি কথা। এখনো মনে হ'লে চোখে জল আসে।"

রূপার চোখও শুখ্নো ছিল না। আনন্দকিশোরের গুণ-গাথা শুন্তে শুন্তে সে এমনিই বিভোর হ'য়ে পড়েছিল যে, তার হুঁস্ ছিল না বৃষ্টিতে কখন বারাণ্ডা ভিজে উঠে জলের ছাঁটে কাপড়ও ভিজে উঠেছে। সে তেমনিই বিভোর হ'য়ে আবার জিগেস্ কর্‌লে, "তিনি কোথায় থাকেন? আশ্রমের ভিতরেই?"

—"না, আশ্রমের কাছেই একখানি কুঞ্জে থাকেন। মোটে ছু'খানি ঘর, একখানায় পূজো করেন, একখানায় শোন্; আবার কখন কখন যাত্রীদের ঘরে শুতে দিয়ে নিজে দাওয়ায় প'ড়ে থাকেন।"

—"কে তাঁর রান্না-বান্না করে?"

—"রান্না আবার করবে—রোজ গোপীনাথজীর মন্দিরে দর্শন কর্‌তে যান, সেইখানেই প্রসাদ পেয়ে আসেন আর রাত্তিরে একটু ফল খান্। কোন দিন তাও খান্ না।"

—"কি ক'রে না খেয়ে থাকেন?"

—"যোগে থাকেন!"

রূপা চুপ ক'রে ভাব্‌ছিল। চন্দ্রাবলী এতক্ষণে বলে উঠ্‌লো—"ও দিদি, তোমার কাপড় যে সব ভিজে গেছে, পাশের দরজা থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসেছে—ওঠো ওঠো কাপড় ছেড়ে ফেলো।"

কাপড় ছেড়ে রূপা খাটের উপর শুয়ে প'ড়ে বল্লে, "চন্দ্রাবলী ঘরে এসো ভাই! আমার কেমন শীত কর্‌ছে তাই শুয়ে পড়্‌লুম। আমার গায়ে এই চাদরটা ঢাকা দিয়ে দাও তো।"

চন্দ্রাবলী সযত্নে রূপার গায়ে চাদরখানি ঢেকে দিলে, তার হাত দু'টী ধ'রে কোলের কাছে বসিয়ে রূপা বল্লে—"চন্দ্রাবলি! তুমি একদিনের মধ্যে আমার কত আপনার হ'য়ে গেছ, না ভাই? তোমাকে আমার ছাড়্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

এই কথায় চন্দ্রাবলীও রূপার হাত দু'খানি হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে, "আমিও যে তোমায় ছেড়ে আর কখন থাক্‌তে পার্‌বো না ভাই—একদিনের মধ্যেই যে তোমায় ভালো-বেসে ফেলেছি। কিন্তু তোমার গা'টা গরম লাগ্‌ছে কেন? জ্বর হয় নি তো?"

—"না তা হয় নি বোধ হয়।"

রূপার খাস দাসী গরবী এসে বল্লে, "ওমা, ঠাকুরঘরের আরতির সময় হ'ল, পূজোরী ঠাকুর এসে যে ব'সে আছেন।"

মুখ তুলে রূপা বল্লে, "আমি তো আজ উঠ্‌তে পার্‌ছি না গরবী। তুই পূজোরী ঠাকুরকে বল্ নিজেই সব গুছিয়ে ক'রে নিতে।"

চন্দ্রাবলী নিজে থেকেই বল্লে, "কি কাজ কর্‌তে হবে, আমি কি পারবো না?"

—রূপা বল্লে, "আজ থাক্ ভাই। তুমি নতুন এসেছ, কাল সকালে তোমায় সব দেখিয়ে দেবো। তা হ'লে আমি যদি কোনো দিন না পারি, তুমি সব ক'রে নিতে পার্‌বে।"

মনীষের অসুস্থতায় গরবীও চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি সে রূপার গায়ে হাত দিয়ে দেখে বল্লে, "তাই তো মা, গা যে বড্ড গরম!"

গরবী চ'লে গেলো। চন্দ্রাবলী দুঃখিত হ'য়ে বল্লে, "আমি আজই এলুম, আর আজই তোমার অসুখ হ'ল—এমনি অপয়া অলুক্ষণে কপাল আমার!"

"না, না, তা নয়—তুমি না এলে আমার আরো কষ্ট হ'ত! দেখ্‌ছো তো দাসীরা ছাড়া বাড়ীতে একটা মেয়ে মানুষ নেই। তুমি এসেছ তবু কথা ক'য়ে প্রাণ বাঁচ্‌লো।"

—"এখন কি একটু ঘুমোবে দিদি?"

—"না, তুমি গল্প করো—তোমাদের বৃন্দাবনের কথা বলো, আমি শুনি।"

আমায় ভুলতে দিতে

নাইকো তোমার ভয়

আমার ভোলার আছে অন্ত

তোমার প্রেমের নাই তো ক্ষয় !

দূরে গিয়ে বাড়াই যে দুর

সে দূর শুধু আমারি দূর

তোমার কাছে দূর কভু দূর নয় !

*   *   *   *

এই খেলাতে আমার সনে

হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে

হারার মাঝে আছে তোমার জয় !

—গীতিমাল্য

কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে রূপা ঘুমিয়ে প'ড়লো। চন্দ্রা তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল—কি সুন্দর দেখতে ! টানা টানা চোখ দু'টী, তার ঘন কালো পল্লবগুলি গালের উপর পড়েছে ! বিস্রস্ত গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে চাঁপা ফুলের মত গায়ের বর্ণ—যেন মাধবী নিশির জমান জ্যোৎস্না রূপার শরীরে জমা হ'য়ে ঘরময় তার মাধুরী ছড়িয়ে দিয়েছে ! ঠোঁট দু'খানি গোলাপের পাপড়ির মতন রাঙা, নিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে একটু কাঁপছিল—বসন্ত-বাতাসের দোলা লাগা নব-

কিশলয়ের মত। কালো কুচ্‌কুচে একরাশ মাথাভরা চুলের এলো খোঁপাটী অর্দ্ধেক খুলে বালিশের উপর এলিয়ে পড়েছিল। একখানি হাত বুকের উপর, আর একখানি মাথার নীচে রেখে সে ঘুমোচ্ছিল; স্বপ্ন দেখে হঠাৎ সে বলে উঠ্‌লো, "কই—কই—কই তিনি?" তার হাতের ঠেলা লেগে মাথার কাছে রাখা কবীরখানি মাটিতে পড়ে গেলো।

—"কি প'ড়ে গেলো?"

চন্দ্রাবলী সেটা তুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্লে, "কবীর।"

"ওঃ!" আজ সকালেই না সে সঙ্কল্প করেছিল যে, ও বই আর ছোঁবে না? তার পরিবর্ত্তে সে আজ কি না সমস্ত বিকেল ও সন্ধ্যাটা সেই আনন্দকিশোরেরই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিহ্বল ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে! যার দেওয়া স্মৃতি-চিহ্নটাকেই সে অভিশাপের মত দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল সেই লোকের কথাই সে আজ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে অনবরত আলোচনা ক'রে চ'লেছে। না এমন আর কিছুতেই সে হ'তে দেবে না, এবার সে নিশ্চয়ই এই দুর্ব্বলতাকে বজ্রমুষ্টিতে ভেঙ্গে দিয়ে তবে আরাম ক'রে ঘুমোবে। চন্দ্রার দিকে না চেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রূপা বল্লে, "আমার বিছানা থেকে ওই বইখানা উঠিয়ে রাখো তো চন্দ্রা!"

—"কোথায় রাখ্‌বো?"

—"আমার ঘরের কোথাও না—যেখানে হয় ফেলে দিতে পারো।"

গরবী দাসী রূপার জন্যে দুধ নিয়ে ঘরে আস্‌তেই রূপা তাকে বল্লে, "ছাখ্‌ গরবি! এই বইখানা গঙ্গায় দিয়ে আসিস্‌ তো—যেদিন তোরা স্নান কর্‌তে যাবি।"

বইখানা হাতে নিয়ে গরবী বল্লে, "এ বুঝি আপনার মায়ের পূজোর বই? তা এতদিন কি রাখ্‌তে আছে? তিনি ম'রে গেলেই জলে দিতে হয়। এ আমি কালই গঙ্গায় দিয়ে আসবো।" রূপা এর কোন উত্তর দিলে না, তার মনের মধ্যে তখন যে ঝড় বইছিল, তাকে থামাতে গিয়ে মনে হ'ল যেন সমস্ত হৃদয়টা সেই ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ভেঙ্গে চুরে খান্‌ খান্‌ হ'য়ে গেলো। দুধের বাটী মুখের কাছে এনে গরবী বল্লে, "দুধ খাবেন না?" চোখ বুজেই রূপা বল্লে, "না, তুই যা, দুধ আমি খাবো না।" চন্দ্রা আস্তে আস্তে বল্লে, "দুধটা খাবে বই কি দিদি—নইলে তো হবে না।"

গায়ের শালটা ভালো করে টেনে নিয়ে রূপা বল্লে,—"না চন্দ্রা, আমার ক্ষিধে নেই, এত জ্বরে খাওয়াও ভালো নয়। তুমি যাও খাওগে, এঁর আর এনার ছেলের খাবারটা একটু দেখিস্‌ তুই গরবী। যাও চন্দ্রা, তুমি খেয়ে শোওগে।"

চন্দ্রা ইতস্ততঃভাবে বল্লে, "তুমি একলাটী থাক্‌বে

দিদি? অরুণবাবু শুতে এলে না হয় আমরা যাবো।" স্বামী যে উপরে আসেন না একথাটা বল্‌তে গিয়েও রূপা পার্‌লে না। সে কথাটা ঢেকে নিয়ে বল্লে, "আমার জ্বর হ'য়েছে কি না? ডাক্তারী মতে এ সময় আলাদা থাক্‌তে হয়, তিনি তো এখানে শোবেন না, আমি একলাই থাক্‌বো। খাওয়া দাওয়া সেরে গরবী এসে শোবে'-খুনি।" গরবী সবই জানে, সে এবার ব'লে ফেল্লে, "বাবুকে তো অনেকক্ষণ খবর দিয়েছি—বৌঠাকরুণের অসুখ করেছে। একবার এসে দেখে যাবেন, তাও তো কই এলেন না।" রূপার ইচ্ছে হ'ল অরুণকে আর একবার ডেকে পাঠায়, কিন্তু বারবার ডাকাতে যদি তিনি বিরক্ত হন্? তার চেয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে তার স্বামীর আঁকার ঘরে যাক্ না কেন? তাঁকে গিয়ে দেখিয়ে আসুক্ তার এত অসুখেও সে তাঁর কাছে এসেছে আর তিনি একটী মিনিটের জন্যও তাকে দেখে যেতে পার্‌লেন না! শালটা গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে গোপনে সে স্বামীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছাল, তখন ঘরের ভিতর থেকে হাসি ও কথার আওয়াজ সে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে। দরজা সব বন্ধ! স্বামীকে ডেকে দরজা খোলাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়েও আমোদ কর্‌তে মন লাগছে? তার মনে হ'ল সে চীৎকার ক'রে বলে—এই কি তোমার সাধনা?

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সে যখন আবার তেতালার ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌ল তখন তার মনে হ'ল যেন ভূমি-কম্প হচ্ছে! এমনি থর্ থর্ ক'রে তার সারা গা মাথা কাঁপ্‌ছিল!

১৯

"এবার চলিনু তবে !
সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে,
উচ্ছল জল করে ছল্‌ছল্‌
জাগিয়া উঠেছে কল কোলাহল
তরণী পতাকা চল চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে !"

—কল্পনা

তার পর দিন সকালে অরুণ যখন স্ত্রীকে দেখ্‌তে এলো, তখন রূপা আর জান্‌তে পারলে না যে, তার স্বামী তার অসুখ দেখ্‌তে এসে তাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে গেছেন। কারণ, সেই যে রাত্তির থেকে রূপা অচেতন হ'য়ে পড়েছিল, তার পর আর তার জ্ঞান হয় নি। অনুক্ষণ সেবা ও কাছে থাকা চন্দ্রাবলীই কর্‌ছিল—সে না এলে আজ এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে রূপার যে কি অবস্থা হ'ত, তা আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা বুঝতেই পার্‌ছেন বোধ হয়। ডাক্তার এলেন—অরুণের হুকুম হ'ল দু'বেলা ডাক্তার আনাবার। বড় বড় মোটরে ক'রে বড় বড় ডাক্তাররা রোজ রূপাকে দেখ্‌তে আসেন, পথ্যের ব্যবস্থা যা ক'রে যান বাড়ীর বড় সরকার বাবু তা নোটবুকে লিখে নিয়ে

নিজে গিয়ে সে সব কিনে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থেকে প্রস্তুত করিয়ে পাঠিয়ে দেন্। বেদানা, আঙ্গুরের রস ও বিলিতী প্রকরণের নানারকম টীনের খাদ্য অজস্র ঘরময় জমেছে। তার সিকির সিকিও রোগিনীর মুখে গিয়েছে কি না সন্দেহ! কারণ অচেতন মানুষকে খাওয়ানো বড় সহজ কথা নয়। যখনই একটু জ্ঞান হয় তখনি বিকারের ঝোঁকে অনর্গল বকুনি—সে বকুনি থামান অসাধ্য! ডাক্তারদের মত—গা মুখ যখন এত লাল হয়েছে ও এত বেশী জ্বর তখন হয় তো হাম বা পান বসন্ত হ'তে পারে। সে জন্য অরুণের এখন তফাতে থাকাই ভালো। বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে অরুণকে না হয় খবর দেওয়া যাবে," আপাততঃ আশঙ্কার কিছুই নেই। রোগিনীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ডাক্তার নার্সদের বন্দোবস্ত ক'রে ও দাসদাসীদের বলে কয়ে ডাক্তারদের মতানুযায়ী অরুণ দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে চলে গেলো। নার্সের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেও, এ সব সংক্রামক ব্যারামের সেবার জন্য নার্স পাওয়া কঠিন, তা ছাড়া পাওয়া গেলেও টেঁকে না—২।১ দিন অন্তর নতুন নতুন নার্স আস্‌তো আবার চলে যেতো—চন্দ্রাই কেবল দিবারাত্র রূপার মুখের উপর সদা জাগ্রত চক্ষু ও কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে আশা-আশঙ্কায় সেবা করে চলেছিল। ছোট ছেলে—সবাই বল্লে,—ছেলের জন্যে চন্দ্রার সাবধান হওয়া উচিৎ। চন্দ্রা এ কথার উত্তরে শুধু বলেছিল, "যিনি দয়া করে

ছেলের ভার নিয়েছিলেন, তাঁকে যে আমি ছেলের জন্যে আজ এই অসময়ে ফেলে পালাবো এ শিক্ষা আমরা ঠাকুরের কাছে পাই নি।" কে যে সেই অপূর্ব্ব ঠাকুর সে কথা ডাক্তার, নার্স, কর্ম্মচারী ও দাসদাসীরা বুঝ্‌তে না পার্‌লেও চন্দ্রার কথার উপর কথা কয়ে আর তাকে কেউ রুগীর ঘর ছাড়বার জন্যে অনুরোধ কর্‌ত না। চন্দ্রার ছেলেকে বাইরের দিকের একটা ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, মাঝে মাঝে চন্দ্রা দূর থেকে কখন কখন ছেলেকে দেখে যেতো। কিন্তু মার চোখের ইঙ্গিতেই ছেলে বুঝে নিয়েছিল যে, মার কাছে যেতে চাওয়ার আব্‌দার এখন বৃথা! তাই ছেলেও বেশ একরকম মা'কে ভুলে ছিল—মায়ের দূরে থাকার নিগূঢ় কারণ আছে জেনে।

জবাফুলের মত রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে চাইতেই চন্দ্রা তাড়াতাড়ি এক চামচ্‌ বেদানার রস নিয়ে মুখে দিতে গেলো। দু'হাতে তা ঠেলে ফেলে দিয়ে রূপা বল্লে, "না, না, তুমি বঝ্‌ছ না চন্দ্রা! আমি যে তাঁর দেওয়া জিনিষ ফেলে দিয়েছি, তাঁকে অবজ্ঞা করেছি। তাই আমার এই শাস্তি! তাই আমার এই ভয়ানক অসুখ হ'ল!" আবার প্রলাপ আরম্ভ হ'ল দেখে চন্দ্রা বল্লে, "ছিঃ! লক্ষ্মীরাণী আমার! আর কথা ক'য়ো না—এই রসটুকু খাও দিখিন্‌!"

—"আঃ! যাও, খাবো না! আমার কথা শুন্‌ছো না কেন চন্দ্রা! সেই বইখানা আমার মাথায় ঠেকিয়ে দাও না, আমি

ঘুমিয়ে পড়ি।” যে বই এই কয়দিন পূর্ব্বে গঙ্গার অতল গর্ভে বিসর্জ্জিত হয়েছে, সে বই কেমন করে যে চন্দ্রা নিয়ে এসে রোগিনীর প্রলাপ থামাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। সেল্‌ফ থেকে তেমনি একখানা বই এনে চন্দ্রা বল্লে, “এই এনেছি! নাও!”

“কি দুষ্টু! এ বুঝি সে বই! তাতে যে হাতের লেখা আছে—আমি দেখেছি—তুমি দেখেছ?”

নিভৃতে চোখ মুছে চন্দ্রা বল্লে, “হ্যাঁ দেখেছি।”

“আর জানো এখনি আমার কাণে কাণে কি বল্‌ছিলেন? বল্‌ছিলেন—কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়, কষ্ট—কষ্ট—কষ্ট—দুঃখ—ব্যথা! উঃ! বড্ড ব্যথা! আর যে পারি না! ঠাণ্ডা জলে আমায় স্নান কর্‌তে দেবে? গায়ের জ্বালা তা হ'লে কম্‌বে! ঐ দ্যাখো না—চন্দন—চন্দন—পরা—মাথা—উঃ! কি আলো—কেবল—আলো—আলো আর আলো উঃ!” চন্দ্রা আর চুপ্‌ করে থাক্‌তে পার্‌লে না। বল্লে, “আর কথা কয়ো না দিদি!”

—“কইব না কেন? না কইলে যে পাগল হয়ে যাবো!”

—“পাগল হবে কেন? ও কথা বল্‌তে নেই—তা হ'লে ভগবানের নাম করো।”

—“নাম? কি নাম করব?”

—“এই হরি নাম! হরি—হরি—রাধানাথ! রাধা-রমণজী—রাধাকান্ত!”

"তুমি আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে চন্দ্রা? যেখানে গোপীনাথজীর মন্দির?"

"হ্যাঁ, ভালো হও, নিয়ে যাবো!"

তা'র প্রলাপের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রা বেশ সুস্পষ্ট বুঝ্‌ছিল, রূপার জীবন ও মনের দুঃখ-দ্বন্দ্বের ও আঘাত-প্রতিঘাতের আলোড়ন! সে ভেবেছিল—রূপা যেমন সুন্দরী তেমনি সুখী। এখন সে অবাক্ ও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো অরুণের ব্যবহারে! সংক্রামক হ'লেও, যে স্বামী স্ত্রীকে যথার্থই ভালোবাসে, সে কি আর রোগের ভয়ে দূরে পালায়? এত ধন, মান, ঐশ্বর্য্য—সব থেকেও রূপার যখন এত দুঃখ, তখন নিজের দুঃখের কথা ভেবে চন্দ্রার অস্থির হওয়া উচিৎ নয়। ১০ মিনিটও হয়নি রূপার ঘুম আবার ভেঙ্গে গেলো। "জানো চন্দ্রা! ঈশ্বরের মধ্যে আমি সব পেয়েছি। তিনি আমায় এখনি ব'লে গেলেন আমায় খুব ভালোবাস্‌বেন। আর এই শুখ্‌নো মরুতে আমায় হাহাকার কর্‌তে হবে না। ঠাকুর বল্লেন, তাঁর ভালবাসার সাগরে আমায় ডুবিয়ে—ডুবিয়ে—ডুবিয়ে—সমস্ত শুষ্কতা ভিজিয়ে দেবেন। আর আমার দুঃখ নেই—ভালবাসা পাবার জন্যে এই ক'টা বছর কি ভয়ানক ছট্‌ফট্ করেছি—এবার সেই ভালবাসা আমি পাবো—তা জানো?"

—"জানি বই কি!"

—"কিন্তু সেই বই খানা একবার দেবে না আমায়? নইলে যে আমার ক্ষমা হবে না—রোগও সার্‌বে না।"

—"কেন সার্‌বে না? সার্‌বে বই কি! ঠাকুরের চরণামৃত এনে দিচ্ছি, মাথায় গায়ে দাও, তা হ'লেই সেরে যাবে। তিনিই তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন।"

—"তা কি হয়! আমি যে আনন্দকিশোরের দেওয়া জিনিষ ফেলে দিয়েছি—তাঁর ক্ষমা চাই।"

—"এই যে বল্লে নারায়ণের মধ্যেই আনন্দ আছেন?"

—"হ্যাঁ, তাই তো—তাই তো—"

উত্তেজনা-বশে রূপার জ্ঞান আবার হারিয়ে গেলো, চোখ দু'টী দিনান্তের পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মত আবার মুদিত হ'য়ে এলো। চন্দ্রাবলীর দুই চক্ষু বেয়ে গভীর দুঃখের অজস্র অশ্রু ঝর্‌ছিল।

"বন্ধু !

কিসের তরে অশ্রু ঝরে

কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ?

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে

করব মোরা পরিহাস !

রিক্ত যারা সর্ব্বহারা

সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা

গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর

নয় কো তারা ক্রীতদাস !

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে

করব মোরা পরিহাস !"

—কল্পনা

এমনিতর প্রলাপ ও বিকারের মধ্যে দিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে রোগী যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ল তখন তার অতীত অতুল রূপের কাঠামখানা মাত্র প'ড়ে আছে। সে সৌন্দর্য্য—যা একদিন কূল-কিনারা ছাপিয়ে উঠেছিল তা এই নব-যৌবনের সীমা না ছাড়াতেই রূপা হারিয়ে ফেল্লে ! শুধু তার আয়ত চক্ষের সেই মধুর চাহনিটুকু অতীত রূপ-গৌরবের সাক্ষী-স্বরূপ আজও লোকের মনের দ্বারে আঘাত দিচ্ছিল। রূপা যে এমন হ'য়ে গেছে তা সে নিজে জান্‌তো না। সেদিন ঘর দুয়ার পরিষ্কার কর্‌বার জন্যে মিউনিসি-

প্যালিটীর লোক এলো, রূপাকে সেজন্যে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অরুণের হুকুম মত সমস্ত বাড়ীখানা তন্ন তন্ন ক'রে বীজানু-নাশক ধোঁয়া ও আরকে পরিষ্কার হ'য়ে গেলে মিস্ত্রী লাগ্‌লো কলি ফেরাতে। বিছানা-পত্তর সব নতুন, চক্‌চকে রঙ্‌ ও পালিশে খাট চেয়ার সব নতুন —বাড়ীখানা যেন বিয়ে-বাড়ীর সাজে সেজে উঠেছিল। দার্জ্জিলিংএ খবর গেলো সব ঠিক্ ঠাক্ হ'য়ে গেছে। তার পর দিন তার এলো—অরুণ বাড়ী আস্‌ছে। খাবার-দাবার আয়োজন কর্‌তে চাকর-বাকর খুবই সেদিন ব্যস্ত! চন্দ্রা এসে রূপাকে বল্লে—"এসো দিদি, ভালো ক'রে চুল বেঁধে দি, আজ অরুণবাবু আস্‌বেন।" একখানা ইজি চেয়ারে রৌদ্রে পা দিয়ে রূপা শুয়েছিল, এই কথায় বল্লে, "এই ক'টা তো চুল, তার আর বাঁধাবাঁধি!"

—"তা হ'ক্, চুল বেঁধে ভালো কাপড় গয়না প'রে সিঁদুর পরে এইখানে বসে থাকো।"

চুল বাঁধা হ'ল। চন্দ্রা নিজেই রূপার আল্‌মারী খুলে বাদামী রঙের রেশমী সাড়ী ও কমলালেবু রঙের জ্যাকেট পরিয়ে দিলে। রূপা বল্লে—"আমায় আয়নার কাছে যেতে দাও চন্দ্রা! কতদিন মুখ দেখিনি।"

—"আয়নার কাছে আর যায় না—আমিই তোমায় সাজিয়ে দি, আমিই তোমার আয়না।"

বল্‌তে বল্‌তে চন্দ্রার চোখ জলে ভ'রে এলো। রূপা

এবার জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে বল্লে, "না, আমার চেহারা আমি দেখবোই—আমি বুঝেছি চন্দ্রা—" বল্‌তে বল্‌তে সেই বড় আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই—যেখানে পরীর মতন, দেবীর তমন তরুণীর উজ্জ্বল রূপ ঝক্‌-মক্‌ ক'রে উঠ্‌তো, সেই খানে ফুটে উঠ্‌লো—শীর্ণা, শ্রীহীন, ক্ষতচিহ্ন-দুষ্ট মুখাবয়ব! পরমুহূর্ত্তে সেই রেশমী ভালো কাপড় জামা টেনে খুলে ফেলে একখানা সাদা লাল পেড়ে সাড়ী পরে ও আপাদমস্তক একখানা ধূসর শালে ঢেকে বারাণ্ডায় পাতা চৌকীতে গিয়ে সে বসে পড়্‌ল! সে যে কত বড় আঘাত আজ নীরবে সহ্য করছে, তা বুঝ্‌তে পেরেও তার প্রতীকারের কোনো উপায় চন্দ্রার হাতে ছিল না। একটু পরে চন্দ্রা বল্লে—"আমার উপর রাগ করেছ দিদি?"

—"না চন্দ্রা তোমার দয়ায় আমি প্রাণ পেয়েছি, তোমার উপর রাগ কর্‌ব কেন? তবে তুমি যদি আমায় আগে থেকে বল্‌তে যে আমি এমনি হয়ে গেছি, তা হ'লে ভালো হ'ত।"

"কি ভালো হ'ত দিদি?"

—"তা হ'লে—তা হ'লে—আমার স্বামী আস্‌বার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা কর্‌তুম—আজ তো আর সময় নেই, একটু পরেই তো তিনি আস্‌বেন।"

—"তাঁকে না বলে চলে যাওয়াটা কি ভালো হ'ত

দিদি ? তিনি তাতে আরো বিরক্ত হ'তেন—আর ভয়ানক দুঃখিত হ'তেন—"

—"তুমি তাঁকে জানো না চন্দ্রা ! তিনি একজন শিল্পী কিনা—তাঁর চোখে কুশ্রী কুরূপ ছুঁচের মত ফোঁকে—এতটুকু অমানানসই, এতটুকু সৌন্দর্য্যের হানি তিনি দেখতে পারেন না। তিনি কি আমার এই মুখ আর দেখ্বেন ভেবেছো ? না—তা তিনি পার্বেন না, তা তাঁর পারার অতীত—! আমাকে যেতেই হবে !" একটা নিঃশ্বাস ফেলে রূপা চোখ বুজ্লে ! মৃদু কান্নার আওয়াজে রূপা চোখ মেলে দেখ্লে চন্দ্রা কাঁদ্ছে। চন্দ্রার হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে রূপা বল্লে, "না চন্দ্রা, তুমি দুঃখ করো না। আমার সমস্ত দুঃখ আজ ঈশ্বরের প্রেমে ধন্য হক্ এই প্রার্থনা করো ভাই।" একটু থেমে রূপা আবার বল্লে, "তোমার ঋণ তো আমি জীবন দিয়েও শুধ্তে পার্বো না—তাই সে চেষ্টা করে আর কি কর্ব। তোমার খোকাকে একবার নিয়ে এসো না দেখি, অনেকদিন দেখিনি তাকে !"

এবার চন্দ্রার কান্নার বেগ আরো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্লো। রূপা কিছু বুঝ্তে না পেরে আবার বল্লে, "আমায় বল্বে না ভাই, কেন কাঁদছ ?"

সেই সময় গরবী কাপড় শুখোতে দিতে ছাতে যাচ্ছিল, রূপা তাকে ডেকে বল্লে, "ওরে গরবী, চন্দ্রাবলীর খোকাকে একবার উপরে পাঠিয়ে দেতো, কোথায় সে ?"

গরবীর হাতের কাপড় হাতেই রইল। অবাক্ হ'য়ে খানিকটা চেয়ে থেকে চন্দ্রার কাছে এসে গরবী বল্লে, "এখনো বৌঠাকুরুণকে বলনি? আর ক'দিন লুকিয়ে রাখ্‌বে বাছা?" চন্দ্রা এবার চোখের জল মুছে সাধ্যমত ধীরস্বরে বল্লে, "আমার অসংযম ক্ষমা ক'রো দিদি! খোকা আমার বৃন্দাবনজীর চরণে স্থান পেয়েছে—তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, আর—" "চন্দ্রা! আমার জন্যে তুই ছেলে হারালি! কে তোকে বলেছিলো এমন সেবা কর্‌তে! এমন শিক্ষা কে দিয়েছিলো যে পরের সেবা কর্‌তে গিয়ে ছেলের প্রাণ তুচ্ছ কর্‌লি!"

—"আমাদের আনন্দকিশোর যে আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন দিদি!"

—"কি সর্ব্বনাশ! এমন সর্ব্বনেশে লোকের সৃষ্টি হ'ল কেন? আমি কেমন ক'রে মনকে প্রবোধ দেবো ভেবে পাচ্ছিনে যে চন্দ্রা! এই কদর্য্য চেহারা নিয়ে মরণই যে সহস্র গুণে ভালো ছিল—তার বদলে যদি সেই সুন্দর কচি ছেলে বাঁচ্‌তো, তার নূতন জীবনে কত কাজ হ'ত। মায়ের কোল শূন্য করে সে চলে গেলো এই হতভাগিনীর জন্য—কি ভয়ানক! আমি অযত্নে মর্‌লে এত বড় পৃথিবীতে একটী প্রাণীরও যে শোক হ'ত না। আমার জন্যে দুঃখ পাবার যে কেউই নেই।"

—"এতে দুঃখের কিছু নেই দিদি! তুমিই যে সেদিন

বলেছিলে—ঈশ্বরের কাছে গেলে দুঃখ থাকে না। খোকা আমার তাঁর পায়ে স্থান পেয়েছে, এ কি কম ভাগ্যের কথা—তার আর কোনো অভাব নেই আজ—”

—“তুমি কি নিয়ে থাক্‌বে চন্দ্রা! তোমার যে আর কিছুই নেই।”

—“তোমারই বা আমার চেয়ে আর বেশী কি আছে দিদি—নিজের দুঃখটা একবার ভেবে দেখো।”

—“আমার জন্যে যে এমন করে একজন ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে, তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি—ত্যাগ বলে ত্যাগ—ধন্য তুই চন্দ্রা! তোর জীবন ধন্য! আমার এই তুচ্ছ জীবনটা যদি তোর মত কাজে লাগাতে পারি, তবেই সান্ত্বনা পাবো, নইলে তোর শূন্য কোল যখনই দেখ্‌বো তখনি চিতার আগুণ বুকের ভিতর জ্বলে উঠ্‌বে যে।”

অরুণের খাস খানসামা এসে খবর দিলে, “বাবু এসেছেন, তিনি উপরে আস্‌ছেন আপনাকে দেখ্‌তে।

রূপা বেশ ভালো করে মাথায় কাপড়টা বাড়িয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব মুখটা ঢেকে ফেল্লে—এ মুখ নিয়ে তাঁর সুমুখে কি করে দাঁড়াবে সে আজ? ভয়ে লজ্জায় ও দুঃখে তার বুকের ভিতর কাঁপছিল। দুর্ব্বল শরীরটা আরো দুর্ব্বল বোধ হচ্ছিল—অরুণের পায়ের আওয়াজ কাছে আস্‌তেই সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জোর করে চেপে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে প্রণাম কর্‌লে। “রূপা!” তার পরে চেয়ে

দেখে অরুণ বলে ফেল্লে, "উঃ, এ যে পেত্নীর মতন চেহারা।" রূপা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাটীতেই বসে পড়্‌ল। আর একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে, "তুমি কে? সত্যই কি রূপা?"

—"হ্যাঁ"

—"ওঃ! এ যে গলার আওয়াজ শুদ্ধ বদলে গেছে! আমি তোমায় চিনিনে—চিনিনে—তুমি কখনই সে নও—" এক রকম ছুট্‌তে ছুট্‌তেই অরুণ নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলো। মূর্চ্ছাহত রূপাকে বিছানায় শুইয়ে চন্দ্রা পাখার বাতাস কর্‌ছিল, চাকর এসে একখানা চিঠি দিলে। চেয়ে দেখে রূপা ব'ল্লে "কার চিঠি?"

চাকর বল্লে, "বাবু আপনাকে দিতে বল্লেন।" চাকর দাসীদের সামনেই যে স্বামীর কাছ থেকে তাকে এমন ভাবে অপমানিত ও ঘৃণিত হয়ে এ বাড়ী ত্যাগ কর্‌তে হবে, এই শেষ অহংটুকুর আঘাত রূপা কিছুতেই সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। যদিও সে বুঝতে পেরেছিল এমনিই একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ তার জন্যে তার স্বামী সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ছেন, তবুও সেটা যে এতটা বিভৎস কদর্য্যতায় পরিণত হবে তা সে ভেবে উঠ্‌তে পারে নি। যাক্ সেটা যে শেষ হয়ে গেছে—এই তার পরম ভাগ্য, এবার তার মনে এমনি একটা শান্তি আস্‌ছিল, যা সে বহুদিন পায় নি। ঢেউটা যখন আস্‌ছে দেখা যায় তখনি ভয়, সেটা মাথার

উপর দিয়ে চলে গেলে নির্ভয়! দুঃখটা যখন আস্‌ছে তখনি অসহ্য দুশ্চিন্তার ব্যথা—এসে গেলে আর অসহ্য নয়, তখন নিশ্চিন্ত! চন্দ্রার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে রূপা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্লে—চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—“তোমার ও মুখ আমি আর এ জীবনে কখনও দেখতে পার্‌বো না। রূপ নষ্ট হওয়াতে তোমার কষ্ট হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু আমার যে কি কষ্ট হ'চ্ছে তা তুমি একবিন্দুও বুঝতে পার্‌বে না। শিল্পীর প্রাণ যদি নিজের মনে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌তে, তা হ'লে আমার আজকের দুঃখ কতকটা বুঝতে পারলেও পার্‌তে। একটি মাত্র ভুল রেখায় ও রঙে যেমন সমস্ত চিত্রখানির গুণ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি একটুমাত্র সৌন্দর্য্যের বিকৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে সমস্ত জীবনের সাধনা বিফল ক'রে দেয়। সেই জন্য আমার অনুরোধ আমার সাম্‌নে তুমি আর কখনও বেরিও না। অন্য কিছুর অভাব তোমার কখনও হবে না। যখন যা দরকার আমাকে জানালেই পাবে”—চিঠিখানা চন্দ্রার হাতে ফেলে দিয়ে রূপা বল্লে,—“একটুক্‌রো কাগজ দাওতো চন্দ্রা।” তার পর স্বামীর চিঠির উত্তরে রূপা লিখলে,—“আপনার অশেষ দয়া। আপাততঃ এখানে থাক্‌তে ই'চ্ছে নেই। চন্দ্রার সঙ্গে বৃন্দাবনে যেতে চাই। দাসদাসী লোকজন অনাবশ্যক। অনুমতি দিন।”

———

২১

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর !
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর !
কিসেরি বা সুখ ক'দিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে !"

—চয়ণিকা

—"চাকরের হাতে চিঠিটা দিয়ে দে চন্দ্রা !" মিনিট পাঁচেক পরে চাকর আবার জবাব নিয়ে এলো, অরুণ লিখেছে—

"ও রকম ভাবে যাওয়া হ'তে পারে না, যেরূপ ভাবে তোমার যাওয়া উচিৎ সেই ভাবে সন্ধ্যায় যাবার আয়োজন ঠিক্ থাক্‌বে।"

রূপা বুঝলে এর প্রতিবাদ ক'রে ফল নেই। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে সোরগোল প'ড়ে গেল, বৌঠাকরুণ হাওয়া বদলাতে পশ্চিমে যাবেন, দরওয়ান চাকর যারা সঙ্গে যাবে যে যার জিনিষ পত্র প্যাক্ ক'রতে সুরু ক'রে দিলে। ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করবার জন্যে চিঠি নিয়ে লোক

ছুট্‌লো—দাসীরা রূপার কাপড় চোপড় বাক্স বন্দী ক'রতে উদ্যত—সরকার এসে খবর দিলে রিজার্ভ পাওয়া গেলো না, কাল যাবার জোগাড় নিশ্চিত ঠিক্ থাক্‌বে।

সরকার চ'লে গেলে চন্দ্রার দিকে চেয়ে একটু হেসে রূপা ব'ল্লে "দেখ্‌ছিস্ চন্দ্রা! বড়লোকের স্ত্রীর হাওয়া খেতে যাওয়ার ধূম!" দুঃখের হাসি হেসে চন্দ্রা ব'ল্লে "তাই দেখছি ভাই,—কান্নাও আসে আবার হাসিও পায় —আমাদের দেশে মেয়েদের দুর্গতি যে কবে ঈশ্বর ঘোচাবেন তা তিনিই জানেন।" হাস্‌তে হাস্‌তে রূপা ব'ল্লে "ও কথা বলিস্‌নে চন্দ্রা—তা যদি ঈশ্বর ঘোচান্ তা হ'লে চন্দ্রার মত মেয়ে কি ক'রে গড়ে উঠ্‌বে? দুঃখ দিয়েছেন ব'লেই না আমাদের দেশের মেয়েরা—এমন ত্যাগ, এমন প্রেম—এমন জ্ঞান—জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, তাই আমার মতে ঈশ্বর করুণ আমাদের দেশের মেয়েদের এমনি দুঃখ দুর্গতি চিরদিনই থাকুক্!"

ক'খানা দিশী লালপেড়ে সাড়ী ও সেমিজ একটা আলাদা পুঁট্‌লী ক'রে বেঁধে রূপা বল্লে,—"এইটে হাতে নিতে হবে চন্দ্রা, বুঝ্‌লি?"

চন্দ্রা বল্লে, "কেন? ৪।৫ বাক্স কাপড় যে প্যাক্ করে চলে গেছে! এ ক'খানা আর কি হবে?"

একটু হেসে রূপা বল্লে, "তুই কি ভেবেছিস্ বৃন্দাবনে আমি এই সব রাণীর সাজে সাজ্‌তে যাচ্ছি? পাগল আর

কি। ও সব অরুণবাবুর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় হ'য়ে লোক-লস্করের সঙ্গে যাচ্ছে, আবার ওদের সঙ্গেই ফিরে আস্‌বে।"

—"এমন ভাবে তুমি থাক্‌তে পার্‌বে ?"

—"পারা-পারির পরীক্ষা যে অনেক আগেই হয়ে গেছে চন্দ্রা!" এ কথার পর চন্দ্রা আর কিছুই বল্লে না। যাবার আগে চন্দ্রা বল্লে, "একবার অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা না করেই যাবে ?"

রূপা বল্লে, "তিনি যে এ মুখ আর দেখ্‌বেন না। তাতে তাঁর সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষতি হ'বে—তাঁর নিষেধ অমান্য করে তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক নয়!"

উপর থেকে নাম্‌বার সময় রূপা তার ঘরের দিকে ফিরেও চাইলে না। একতলায় নেমে তার কুমারী-জীবনের পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ স্বর্গীয়া জননীর ঘরখানায় ঢুকে সে ভক্তিভাবে প্রণাম ক'রে মনে মনে প্রার্থনা কর্‌লে যে, সে যেন মায়ের আশীর্ব্বাদে বৃন্দাবনজীর দর্শন পায়, আর তাঁর চরণে স্থান লাভ করে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের অশোক গাছের দিকে যেতেই চন্দ্রা বল্লে, "ওখানে আবার কোথায় যাচ্ছ ?"

অশোক তলার একটু মাটী মাথায় ঠেকিয়ে রূপা বল্লে, "এ যে আমার আর একটি তীর্থ ভাই!" চন্দ্রা এ কথা বুঝ্‌তে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রূপার দিকে চেয়ে রইল। একটু হেসে রূপা বল্লে, "এ তীর্থের মাহাত্ম্য

আর একদিন ব'ল্‌ব তোকে—আজ ট্রেণের টাইম্‌ ব'য়ে যাচ্ছে।"

ফার্ষ্ট ক্লাস, রিজার্ভড্‌ কম্‌পার্টমেণ্টে ব'সে ব'সে রূপা ভাব্‌ছিল, এই কদর্য্যতা নিয়ে সে যখন আনন্দকিশোরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তাঁর মনের ও মুখের ভাব কি রকম হবে। কিন্তু তিনি যে শুধু সৌন্দর্য্যেরই উপাসক তাতো নন্‌, বিশ্রী মনের ও মুখের জন্যও যে তাঁর অফুরন্ত করুণা ফুরায় না বলেই তার জানা ছিল। অথচ, আনন্দকিশোরের কাছ থেকে রূপা যে কিছু পেতে চাইছিল, তা তো নয়।—কেবল ভক্ত যেমন ক'রে ভগবান্‌কে প্রণাম করেই নিজেকে সার্থক মনে করে, তেমনি আনন্দ-কিশোরের পায়ের ধূলোটুকু নেওয়া ছাড়া আর তো সে কিছুই চায় না।

বৃন্দাবনে পৌঁছিবার আগের ষ্টেশনেই লোকজনদের ডেকে রূপা বল্লে, "বৃন্দাবনে যখন আমি নাম্‌বো তখন তোমরা আর আমার সঙ্গে যেও না। জিনিষ-পত্র যা কিছু এনেছ সব নিয়ে তোমরা বাড়ী ফিরে যাও, আমার ওসব জিনিষ-পত্রের দরকার নাই। সজল চোখে গরবী বল্লে, "বাবুর হুকুম!"

—"তাঁকে বলো, আমি বলেছি তোমাদের ফিরে যেতে, জিনিষও নিয়ে যেতে!"

গরবীর কথা শুনে নবীন এসে বল্লে,—"আপনার জন্যে

জয়পুরের জমীদার-বাড়ী থেকে বৃন্দাবন ষ্টেশনে গাড়ী আস্‌বে। বাবু তাঁদের লিখেছেন—তাঁরা আপনার জন্যে সহরের বাইরে ভালো বাড়ী ঠিক করেছেন—।"

"সে বাড়ীতে তো আমি যাবো না, তুমি তাঁদের গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল।"

—"তা হ'লে কোথায় থাক্‌বেন ?"

—"গরীব যাত্রীরা যে রকম বাড়ীতে থাকেন, আমিও সেই রকম কোথাও থাক্‌বো এখন।"

—"আপাততঃ এই টাকাটা সংসার-খরচের জন্যে—" বল্‌তে বল্‌তে ভয়ে ও কুণ্ঠায় সরকারের হাত কাঁপ্‌ছিল,—না জানি বৌঠাকরুণ আবার কি বল্‌বেন! হাত পেতে নিয়ে রূপা বল্লে, "আমার আর সংসার-খরচের দরকার কি বলো ? তবে তোমাদের মনিব যখন দিয়েছেন, তখন এ টাকা বৃন্দাবনজীর সংসার-খরচে লেগে যেতে পার্‌বে।"

কর্ম্মচারী একটু ইতস্ততঃ ক'রে আবার বল্লে, "মাসে মাসে কোনখানে টাকা পাঠান হবে ? ঠিকানা ?" রূপা কিছু বল্‌বার আগেই চন্দ্রা তাড়াতাড়ি আনন্দকিশোরের আশ্রমের ঠিকানা বলে দিলে।

বৃন্দাবন ষ্টেশনে চন্দ্রার হাত ধ'রে রূপা যখন ট্রেণ থেকে নাম্‌তে যাচ্ছে, তখন গরবী দাসী দু'হাতে মনিবের পা জড়িয়ে বল্লে—"আমাকেও ফিরে যাবার হুকুম দিয়েছ কি দোষে মা ? আমি তো কোন দোষ করিনি।"

—“পা ছাড়্ গরবি! তুই দোষ করবি কেন—তার জন্যে নয়—তোরা এখন ফিরে যা, এই আমার ইচ্ছে। যদি দরকার হয়, তোকে আবার আনিয়ে নেবো।”

২২

"ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে
জানিনে পথ, নাই যে আলো
ভিতর বাহির কালোয় কালো
তোমার চরণ শব্দ বরণ ক'রেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে

ধীরে বন্ধু ধীবে ধীরে
চল অন্ধকারের তীরে তীরে
চ'লব আমি নিশীথ রাতে
তোমার প্রাণের ইসারাতে
তোমার বসন-গন্ধ বরণ
ক'রেছি আজ এই বসন্ত সমীরে !"

—ফাল্গুনী

ষ্টেশনের লোকজন ও স্বামীর প্রেরিত দাসদাসী, আম্‌লাবর্গের হাত ছাড়িয়ে রূপা যখন বৃন্দাবনের রাঙ্গা পথের ধূলোয় স্বাধীনভাবে পায়ে হেঁটে চল্‌তে স্বুরু কর্‌লে, তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে উঠ্‌লো,— "আঃ! কি সুন্দর!"

এখানে কেউ এমন পরিচিত নেই যে, অতীতের রূপের ব্যাখ্যা ক'রে তার বর্ত্তমান রূপ-হীনতার দুঃখ

আরো বাড়িয়ে তুল্‌বে—এইটাই তাকে সব চেয়ে শান্তি ও আনন্দ দিচ্ছিল। একজন আছেন বটে, যিনি তার অতীতের পরীর মতন রূপ-যৌবন দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাম্‌নে নষ্টশ্রী নিয়ে দাঁড়াতে তার তেমন লজ্জা বা তুঃখ নেই—কেন যে নেই, সেটা রূপা ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না। সকলের সামনেই তার আজকাল এই মুখটা দেখাতে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হ্‌চ্ছে—কেবল আনন্দ-কিশোরের সাম্‌নেই যে লজ্জা বা তুঃখ হবে না, তার কারণ কি? শেষকালে সে ভেবে দেখ্‌লে, দেহের রূপ দিয়ে আমরা যাকে মুগ্ধ কর্‌তে চাইনে, তার কাছে আমাদের কুশ্রী বা সুশ্রী তুইই সমান হ'য়ে যায়। ভগবানের কাছে যখন আমরা দাঁড়াই, তখন দেহের সৌন্দর্য্য কোনখানটায় আছে বা নেই, তা আমাদের মনেই থাকে না; কিন্তু অন্তরের পবিত্র প্রেম, বিশুদ্ধ ভক্তি,—এই নিয়েই আমরা তাঁকে অর্ঘ্য দিই!

চন্দ্রা বল্লে, "এ দিক্‌ দিয়ে যাবে দিদি? তা হ'লে যমুনা দেখ্‌তে পাবে, যদিও সে যমুনা আর নেই।"

যমুনার পথে যাবার আগেই, তারা দেখ্‌তে পেলে তিনটী কিশোর বালকের সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দ-কিশোর তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন। আনন্দকিশোর বল্‌ছিলেন, "আয় রে আমরা গান গাই।"

ছেলেরা বল্লে, "সেই গানটা গাও না কিশোরদা!"

—"কোন গানটা ?"

—"সেই যে 'ত্যাখ্ না রে ভাই ব্রজবাসী.!'"

আনন্দকিশোরের সঙ্গে ছেলেরাও গান ধর্‌লে—

ত্যাখ্ না রে ভাই ব্রজবাসী
কানাই মোদের গোঠে যায়,
চরণ কিরণ ঠিক্‌রে পড়ে
ব্রজ-পথের বনছায়।
হাতে তার মোহন বেণু
ঘিরেছে তায় হাজার ধেণু ;
আপনি ঝরে ফুলের রেণু
পাবে বলে পরশ গায়।
ঐ যে শ্যামের শিখি পাখা
হেলে পড়ে মলয় বায় ;
আয় না রে ভাই যতেক ছেলে
খেল্‌বি গোঠে যমুনায় !

আনন্দকিশোরের ভক্তিমাখা গলার স্বর শুন্‌তে শুন্‌তে রূপা এমনি আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিল যে, তার নিজের কুৎসিৎ চেহারাটা ঢাকবারও অবসর পায়নি। চন্দ্রা ও রূপাকে অদূরে দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দকিশোরের গান থেমে গেলো। তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য না হ'য়ে শুধু বল্লেন—"সত্যিই যে ফুলের রেণু তাঁর পরশ পেতে বৃন্দাবনে ছুটে এসেছে। এ কি চন্দ্রা! এর মানে কি ?"

মাথার কাপড়টা বাড়িয়ে দিয়ে রূপা তাড়াতাড়ি মুখটা

আরো ঢাক্‌তে যাচ্ছিল, আনন্দকিশোর যেন তা বুঝ্‌তে পেরেই বলে ফেল্লেন—"আজ তোমার যে রূপ দেখ্‌ছি, এমন আর কখন দেখিনি! মুখ ঢাকবার দরকার নেই।"

এ কি বিদ্রূপ! এমন করেই কি নিষ্ঠুর পরিহাসে আনন্দকিশোর তাকে জর্জ্জরিত করে তুল্‌বেন? এর চেয়ে স্পষ্ট মুখের উপর সত্য বলা যে ঢের ভালো ছিল। শেষে আনন্দকিশোরের বিশাল হৃদয়ের অপার করুণা-সাগরও কি রূপার ভাগ্যে শুকিয়ে গেলো? চোখের জল জোর ক'রে থামিয়ে রূপা তাঁকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই চন্দ্রা বল্লে—"আমার এমনি ভাগ্য! আপনার কথা শুনে ওঁদের ওখানে যেদিন পৌঁছ্‌লুম সেইদিন থেকেই দিদির অসুখ সুরু। তার পরে রোগের সঙ্গে কি যুদ্ধই গিয়েছে, সেরে যদিও উঠ্‌লেন কিন্তু অরুণবাবুর সঙ্গে যে কি হ'য়ে গেলো—! সব ছেড়ে আজ এই।"

আনন্দকিশোর বিষণ্ণ মুখে বল্লেন—"সবই গোপীনাথজীর ইচ্ছা! এখন আমার কুটীরে যাওয়া যাক্ চলো।"

রূপা আপত্তি জানিয়ে বল্লে—"আমাদের জন্যে আর একটা কুঁড়ে ঠিক্ করে দিতে হ'বে। আপনার কুটীরে ধর্‌বে না তো!"

রূপার মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়ে চোখ নামিয়ে আনন্দ বল্লেন—"বেশ! তাই হবে—দেখি, যদি ছোটখাট একটা কুঞ্জ আশ্রমের কাছেই পাই।"

চন্দ্রা বল্লে—"আজ ওখানেই চল না দিদি, তার পরে তখন দেখে শুনে আর একটা বাড়ী ঠিক্ কর্‌লেই হবে।"

রূপা কিন্তু ঘাড় নেড়ে বল্লে, "কেন চন্দ্রা, একটু খুঁজ্‌লে কি আর বাড়ী পাওয়া যাবে না?"

একটু ভেবে আনন্দকিশোর বল্লেন—"আমার কুটীরে ততক্ষণ তোমরা বিশ্রাম করগে—আমি বাড়ী ঠিক্ করে ফির্‌বো।"

—"আপনার কুটীরে কেন, তার চেয়ে আপনার আশ্রমেই আমরা বিশ্রাম ক'রে নিতে পারবো। আপনার আশ্রমের কথা শুনে অবধি দেখ্‌বার ভারী ইচ্ছে হ'য়েছে।"

—"বেশ তো, তাই তোমরা যাও, আমি বাড়ী ঠিক্ করে আসি।"

ঝড়ে উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচল খানি,
ঢাকা থাকে না হায় গো
তারে রাখ্‌তে নারি টানি।
আমার রইল না লাজ-লজ্জা,
আমার ঘুচ্‌লো গো সাজ-সজ্জা।।
তুমি দেখ্‌লে আমারে
এমন প্রলয় মাঝে আনি
আমায় এমন মরণ হানি।"

—গীতিমাল্য

আশ্রমে পৌঁছে সমস্ত দেখে রূপার মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। কত দুঃখিনী এই আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছে—সেও তো তাদেরই মত একজন—তাই তাদের ব্যথা যে সে প্রাণ দিয়েই বুঝেছে! যদিও তার বড়লোক স্বামী, তার খাওয়া-পরার জন্যে অর্থের অভাব কখন তাকে জান্‌তে দেবেন না—এটা অবশ্য তাঁর খুবই দয়া—কিন্তু তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া রূপার পক্ষে যে আজ কত বড় আত্মাভিমানে আঘাত দেওয়া—সেটাও তো ভাব্‌তে হবে! তবে আনন্দকিশোর যা বলেছেন, অহং অভিমান সব পুড়ে গেছে তার! কিন্তু তিনি এ কথা কেন বল্লেন

যে তাকে আজ আগের চেয়ে সুন্দর দেখ্‌ছেন? কেন তিনি এ রকম ব'লে মিছে তাকে কষ্ট দিলেন? এ কথার জবাব সে একদিন তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই জেনে নেবে। কিছুক্ষণ পরে আনন্দকিশোর ফিরে এসে বল্লেন, "এখান থেকে একটু দূরে ছোট একটী বাড়ী পেয়েছি, ছু'খানি ঘর আছে, একটা রান্নাঘর আর জিনিষ-পত্তর রাখ্‌বার মত একটা কুঠুরীও আছে—চলো দেখ্‌বে।"

যেতে যেতে রূপা বল্লে, "এই দুপুরে রৌদ্রে আপনাকে কত কষ্ট দিলুম।"

—"আর আমার মনে হচ্ছে, এত আনন্দ আমি জীবনে কখনো পাইনি।" বলে আনন্দকিশোর হাসিমুখে চন্দ্রা ও রূপার দিকে চাইলেন। রূপা বল্লে, "আমার জন্যে চন্দ্রা যে কতদূর ত্যাগ করেছে আর কি সেবাই যে করেছে তা আর মুখে কি বল্‌বো—আমার সেবা করে—আমাকে বাঁচাতে গিয়ে—ওর একমাত্র ছেলেকেও হারিয়েছে—এ কথা যখনি মনে করি, তখনি যেন বুক ফেটে যেতে থাকে।"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "তোমার তো এতে কোন হাত নেই রূপা! তুমি কেন মিথ্যা দুঃখ কর্‌ছ? চন্দ্রা যে তার ত্যাগের ফলে মুক্তি পেয়েছে—মায়ার বন্ধন কাটান কি সহজ!"

চোখ মুছে চন্দ্রা বল্লে—"আমার খোকাকে আপনার পায়ে আর ফিরিয়ে আন্‌তে পারলুম না এই দুঃখ।"

—"যাঁর পায়ে তুমি তাকে দিয়েছ, সেই পা যে মুনি-ঋষিরও দুর্ল্লভ!"

নূতন বাড়ীতে পৌঁছে রূপা দেখ্‌লে, ছোট হ'লেও বাড়ীখানি বেশ ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার। আনন্দকিশোর বল্লেন, "তবে আমি ফিরি, তোমাদের যা যা দরকার, সব ঠিক আছে বোধ হয়? আমি আশ্রমের দু'জন চাকরকে আগেই আস্‌তে বলেছি।"

রূপা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "এ সব আপনি কি করেছেন? এত খাবার কি হ'বে? কাল থেকে আর চাকর-বামুণদের আস্‌বার দরকার নেই, আমাদের দুজনের রান্না আমরা নিজেরাই করে নেবো। মেয়েমানুষের খাবার আবার অত-শত কেন, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত কোনমত প্রকারে মুখে দেওয়া বই তো না!"

আনন্দকিশোর গম্ভীরভাবে বল্লেন, "তোমার ওসব কখনো অভ্যাস নেই, পার্‌বে কেন?"

—"না, নেই তো কি? মার জন্যে আমি বিয়ের আগে রাঁধতুম্ না! সব ভুলে গেলেন না কি? দু'দিন না হয় অরুণবাবুর রাণী হয়েছিলুম, তাতেই কি আমি একেবারে অক্ষম হ'য়ে বসে আছি!"

"তোমার শরীরে ওসব সইবে না।"

—"তা না সইলেও কিছু এসে যাবে না। আপনি এখন বাড়ী গিয়ে খাওয়া দাওয়া করুন গে যান্ তো! এই

রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরের ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ কর্‌বার কিছু দরকার নেই।" বলে রূপা চট্ করে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়্‌ল।

আনন্দকিশোরের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে চন্দ্রা বল্লে, "উনি কারো কথাই শুন্‌বেন না! সঙ্গে অরুণবাবু লোকজন সব দিয়েছিলেন, জিনিষ-পত্তর সমস্ত গাড়ী বোঝাই করে পাঠিয়েছিলেন—সব ফিরিয়ে দিলেন! এখানে কোন্ জমীদারের মস্ত বাড়ী আছে, তাও থাকবার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলেন; বৃন্দাবন ষ্টেশনে তাদের গাড়ী পর্য্যন্ত এসেছিলো—সে সব ফিরিয়ে দিয়ে ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে এলেন! অরুণবাবু টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন, তাও নিতে চাইছিলেন না। আমি জোর করেই একরকম কর্ম্মচারীদের বলে দিলুম—আপনার আশ্রমের ঠিকানায় টাকা পাঠাতে। তার পর আপাততঃ খরচের জন্যে হাজার টাকা দিয়েছিলেন, কি ভাগ্যি নবীন সরকার যখন সেই টাকাটা দিলে তখন হাত পেতে নিয়ে বল্লেন, "আমার আর সংসার-খরচ কি, তবে তিনি যখন দিয়েছেন তখন এ টাকা বৃন্দাবনজীর সংসার-খরচে লেগে যেতে পারবে।"

আনন্দকিশোরের উজ্জ্বল চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল—সেই রূপা এত সহ্য কর্‌তে শিখ্‌লে কি করে? এত বৈরাগ্যই বা তার এই নবীন যৌবনে কে এনে দিলে?

আস্তে আস্তে তিনি বল্লেন, "তা অরুণবাবুর দয়াটা কি রকম চন্দ্রা? আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।"

—"তিনি রূপের উপাসক, যে চিঠিটা শেষে লিখেছিলেন তাতেও ঐ কথাই ছিল—দিদি যেন তাঁর সাম্‌নে আর কখন না বেরোন, তাতে তাঁর ভয়ানক কষ্ট হবে।"

আনন্দ বল্লেন, "অনেক সময় কুরূপের মধ্যেও প্রাণের রূপ এমন চমৎকার ফুটে ওঠে যে, সুন্দর চেহারার মধ্যেও অনেক সময় তা পাওয়া যায় না। রূপাকে আমি আগেও দেখেছি, আবার এখনও দেখ্‌লুম, আমার তো মনে হয় এমন নরম আপন-ভোলা মাধুরী ওর সুন্দর চেহারার মধ্যে ততটা ফুটে ওঠেনি।"

ঘরের ভিতর থেকে রূপা সবই শুন্‌ছিল। তবে সত্যিই সে আজ আনন্দকিশোরের চক্ষে সুন্দর! কি আশ্চর্য্য! এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে যে কুরূপের মধ্যেও সুরূপ দেখ্‌তে পায়? আজ যে তার আর এই নষ্টশ্রীর জন্যে কোনো দিক্ দিয়েই দুঃখ নেই! সে আবার শুন্‌তে পেলে আনন্দকিশোর বল্‌ছেন—"জানো চন্দ্রা, যিনি শিল্পী হয়েও কুরূপের মধ্যে রূপ খুঁজে পেলেন না, তাঁর সারা জীবনের সাধনাই ব্যর্থ ধর্‌তে হ'বে। শুধু সুন্দরকেই ফুটিয়ে তোলা কবির ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত পরিচয় নয়, অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে ধর্‌তে পারাই কবির বাহাদুরী! সেইখানেই সে যথার্থ কবি। কিন্তু সেটা

আত্মতত্ত্বে অনুসন্ধিৎসু না হ'লে, যথার্থ প্রেমিক হ'তে না পার্‌লে, ধর্‌তে পারা সম্ভব নয়। আত্মাকে জানা যে শুধু সন্ন্যাসীরই বা সর্ব্বত্যাগীরই প্রয়োজন, তা নয়; শিল্পীরও তাঁকে জানা প্রয়োজন—না হ'লে তার শিল্প শ্রেষ্ঠতা বা পূর্ণতা লাভ কর্‌তে পারে না। হীন, পতিত, অধমের মধ্য দিয়েও যে কবি মহানুভবতা, প্রেম ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন, তিনিই সার্থক—কারণ, অসতের মধ্যে সতের বীজ, কালোর মধ্যে আলোর ফুলঝুরি লুকিয়ে আছে—এটা তিনি অনুভব কর্‌তে পেরেছেন।"

চন্দ্রা অবাক্ হয়ে এই তরুণ বৈষ্ণবের জ্ঞান-ভক্তি-মাখা মধুর কথাগুলি শুন্‌ছিল, তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেই ছিল না। শ্রীআনন্দের নগ্ন বুকের উপর শুভ্র উত্তরীয় ঘামে ভিজে উঠেছিল, দাওয়ার নীচের রোদ্দুর বেলা বেশী হওয়ায় উপর অবধি ভ'রে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে এক ঝল্‌কা গরম হাওয়া মাঠের ধূলো উড়িয়ে নিয়ে আনন্দকিশোর ও চন্দ্রার মুখ-চোখ তাতিয়ে ব'য়ে যাচ্ছিল। শ্রান্ত ঘুঘু নার্‌কেল গাছের মাথার উপর ব'সে ব'সে ডাক্‌ছিল—রূপা আর থাক্‌তে পার্‌লে না—সে যে তাদের সব কথা শুনেছে, এ ভাব একটুও না জান্‌তে দিয়ে যেন আচম্‌কা এসে পড়ে বলে উঠ্‌লো—"এ কি! আমার ঘর-টর সব গুছোন হয়ে গেলো আর এখনও তোমাদের গল্প হচ্ছে! আর তুই তো বেশ চন্দ্রা! একজন যে না খাওয়া, না দাওয়া,

সমস্ত দুপুরটা বসে আছেন, তা তোর একটুও হুঁস্ নেই ? যান, যান, উঠুন, আর এক মিনিটও নয় ; না, আমি কোনো কথাই শুন্‌বো না আর, আগে আপনি স্নানাহার করুন গিয়ে।”

আনন্দকিশোর হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—“তা রাণীর দুয়ারে একদিন না হয় কাঙ্গালী-ভোজনই হয়ে যেতো !”

—“আপনার জন্যে আমি খাবার নিয়ে আসি।”

—“তুই কি পাগল হয়েছিস্ চন্দ্রা ! আমাদের ছোঁয়া খেয়ে ওনার এতদিনের বৃন্দাবনবাসের পুণ্য সব জলাঞ্জলী যাক্ আর কি ! সে কিছুতেই হ’তে দেবো না আমি !”

গায়ের চাদরখানা রৌদ্র আট্‌কাবার জন্যে মাথায় জড়াতে জড়াতে আনন্দকিশোর বল্লেন, “আচ্ছা, এ ছোঁয়া খাওয়ার উত্তর কাল এসে দিয়ে যাবো, বুঝ্‌লে ?”

—“আর কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে, যান আপনি—”

এক রকম জোর করেই রূপা যখন আনন্দকিশোরকে রাস্তায় নামিয়ে দিলে, তখন তার নজর প’ড়্‌ল আনন্দের খোলা গায়ের দিকে—সে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—“গায়ের চাদরটা মাথার পাগ্‌ড়ী কর্‌লেন, গা যে রোদ্দুরে পুড়ে যাবে !” তাড়াতাড়ি ঘর থেকে নিজের গরদের চাদরখানা এনে সে চন্দ্রার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

আনন্দকিশোর তখন একেবারে রাস্তার উপর, তিনি

সেটা ফিরিয়েই দিচ্ছিলেন; চন্দ্রা বল্লে, "ফিরিয়ে দিলে রাগ কর্‌বেন—"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "কত রোদ্দুর, কত বৃষ্টি খালি গায়ে কেটে যাচ্ছে, আমাদের মত অভাগাদের কত খানি তাত লাগ্‌লো, কতখানি শীত লাগলো, দেখ্‌বার আর কে আছে বলো—!"

২৪

"জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে
আমি ধূলায় ব'সে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে
অবোধ আমি ছিলেম বলে
যেমন খুসী এলেম চ'লে
ভয় করিনি তোমায় আমি
অন্ধকারে"

—গীতিমাল্য

রূপার গায়ের চাদরটা গায়ে দিয়ে আনন্দকিশোর যখন নিজের কুঞ্জে পৌঁছলেন তখন বেলা ২টা বেজে গেছে। প্রতিদিনই গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়ে তিনি প্রসাদ পেতেন, আজ সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় আহারের ব্যবস্থা কি করেন তাই ভাব্‌ছিলেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর মনে হ'ল, আজ যে তাঁর প্রসাদ জোটেনি এ কথা রূপা শুন্‌তে পেলে কি রকমই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌বে! মনে মনেই হেসে ভাব্‌লেন, "যাক্, তবু এ কাঙ্গালের জন্যে ভাব্‌বার একজন লোক জুটেছে!" স্নান সেরে আসন পেতে জপে বস্‌ছেন, রামিয়া ছত্রীর মা ৪টী আতা, একটী সুপক্ক পেঁপে ও ঘরের তৈরী কিছু মিষ্টি তাঁর সাম্‌নে রেখে দিয়ে প্রণাম ক'রে বল্লে, "রামিয়ার গাছের জিনিষ!

আর ঐ নাড়ু ক'টা ঘরে বানিয়েছে। রামিয়া বল্লে,—আগে আমাদের কিশোরদাকে দিয়ে আয়। আমি বলি তিনি কি এখন ঘরে আছে। হয় তো কোন গরীবকে উদ্ধার কর্‌তে পথে পথে ঘুর্‌ছে—তা আমার ভাগ্যি যে দেখা মিলেছে।"

গরীব রামিয়ার মা'র এই স্নেহোপহার আনন্দের মনে এমন একটী অনাবিল তৃপ্তি—সুখ এনে দিলে, যাতে ক'রে তিনি জপ থামিয়ে বলে উঠ্‌লেন—"আমার আজ খাবার ছিল না রামিয়ার মা! ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল, তুমি আমার মা কি না, তাই বুঝ্‌তে পেরে ঠিক সময়ে খাবার এনেছ!"

আনন্দের কথায় রামিয়ার মা তার দন্তবিহীন মুখে এক গাল হাসি হেসে বল্লে,—"আহা! হামার কি পুণ্যি! জপ ছেড়ে কথা না বোলো, জপ্‌মে বিলম্ হোয়ে যাবে, খেতে ভি দের হবে!"

রামিয়ার মার এই আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দী কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দ বল্লেন—"পেটে এত ক্ষিধে নিয়ে এখন কি আর জপে মন বসে রামিয়ার মা? তুমি আমায় এই ফলগুলো সব ছাড়িয়ে এই শালপাতার উপর দাও তো! আমি ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাই।"

কৃতকৃতার্থ রামিয়ার মা কূয়ো থেকে এক ঘটী জল তুলে হাত ধুয়ে ফলগুলি কেটে পরিষ্কার ক'রে শালপাতার

উপর গুছিয়ে দিলে। আনন্দকিশোর তা নিবেদন ক'রে দিয়ে এক নিঃশ্বাসেই প্রায় ফল ও মিষ্টিগুলি খেয়ে ফেলে বলে উঠ্লেন—"আঃ! কি মিষ্টিই লাগ্লো—মায়ের হাতের দেওয়া জিনিষ নইলে কি ছেলের পেট ভরে রামিয়ার মা।"

—"এত ভাগ্যি কি করেছি আমি, যে মা বলে তুই ডাক্লি আমায়? আহা! তোকে দেখ্লে চোখ জুড়িয়ে যায় বাবা।"

—"এই কালো ছেলের রূপের প্রশংসা আর কর্তে হবে না রামিয়ার মা! কয়লার চেয়ে আমার রং একটুও কম কালো নয় তা আমি মিলিয়ে দেখেছি। এখন এক ঘটী ঠাণ্ডা জল ঐ সরাইটা থেকে ঢেলে আন তো।"

পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল খেয়ে আনন্দকিশোর বল্লেন, "দেখো রামিয়ার মা, রামিয়াকে ব'লো, যে ধানের ক্ষেত নিয়ে কালাচাঁদ মহাজনের সঙ্গে শিবরাজ কূর্ম্মীর ঝগড়া বেধেছে তা মেটাবার জন্যে আমার সঙ্গে ওকে কাল সকালে যেতে হবে। কমলিনীর ছেলের জন্যে যে ব্যবস্থা কর্বার কথা ছিল তার জন্যে রামিয়া, নিমাই পাঁড়ে, গুপী তেওয়ারী—এদের সকলকে চাই। তুমি রামিয়াকে বলে দিও এদের যেন ঠিক্ ক'রে ব'লে রাখে। আমি জনকতক বাঙ্গালী ভদ্রলোককেও বলে রেখেছি; তাঁরা সবাই আমার পক্ষ হ'য়ে বল্লে অনেকটা ফল হবে—নইলে কমলিনীর ছেলেকে উদ্ধার করা মুস্কিল!"

আনন্দকিশোরের কথা শেষ না হ'তেই হাঁপাতে হাঁপাতে রামিয়া এসে বল্লে, "কমলিনীর ছেলেকে ট্রেণে তুলে দিতে মোক্তার বাবুর পাইক ছুটেছে কিশোরদা! আপনি শিগ্‌গির আসুন!" রামিয়া ও ধীরুবাবুদের সঙ্গে যখন আনন্দকিশোর ষ্টেশনে পৌঁছিলেন তখন কমলিনী ছেলেকে নিয়ে ট্রেণের কাছে দাঁড়িয়ে। তার চার ধারে নামজাদা মোক্তারবাবুর পাইক প্রহরীরা ঘিরে রয়েছে। নীরদ ও ধীরুবাবু কমলিনীর বাপ ও ভাই। আনন্দকিশোর মোক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লেন যে, তিনি টাকা দেবেন, কমলিনীর ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হ'ক্। মোক্তারবাবু বল্লেন, লেখাপড়া না ক'রে মুখের কথায় তিনি কোন কাজ করেন না—যদি আনন্দকিশোর টাকা দিতে রাজী হন—বেশ, লেখাপড়া ক'রে দিন। ব্যস্ত হ'য়ে নীরদবাবুরা বল্লেন, "আপনি কোথায় পাবেন? আমাদের জন্যে আপনি শেষে বিপদে প'ড়্‌বেন, সে আমরা হ'তে দিতে পার্‌বো না।" আনন্দকিশোর শুন্‌লেন না। লেখাপড়া হ'য়ে গেলো, সাত দিনের মধ্যে তাঁকে টাকা দিতে হবে। সজল চোখে ধীরুবাবু বল্লে—"এই যে অত্যাচার এর আর ফল নেই ঠাকুর?" আনন্দকিশোর বল্লেন—"আছে বই কি—তবে শিগ্‌গির আর দেরী, এই যা—"

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে টাকার চেষ্টায় তিনি অনেক জায়গায় ঘুর্‌লেন; কারণ, আগে

থেকে জোগাড় ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেদিন কোনরকম সুবিধা কর্‌তে না পেরে তিনি যখন কুটীরে ফির্‌লেন তখন রাত দশটা বাজে। রাত্তিরে, পশ্চিমের ক্ষুদ্র সহরের নির্জ্জন কোলে, দীনতাভরা কুটীরে নগরবাসিনী রূপার কেমন লাগ্‌ছে?—সারাদিনের পরিশ্রম ও কর্ম্মের পর এই কথা মনে হ'তেই কেমন একটা তৃপ্তিপূর্ণ উৎসাহে তাঁর সমস্ত মনটা ভ'রে গেলো! আকাশের উজ্জ্বল তারা-দল তাঁর শয্যায় মৃদু কিরণ ছড়াচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে আনন্দ ভাব্‌লেন—"কাল একবার রূপাদের দেখ্‌তে যেতে হবে—আজ সন্ধ্যায় কাজের হেঙ্গামে তো যাওয়া হ'ল না।" তারপর—আর তাঁর ভাবনার অবসর হ'ল না—ঘুমের ঘোরে চোখ তখন আচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছে!

২৫

"আমায় তুমি ক'রবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে
বিশ্ব ভুবন মাত্‌লো যে তাই
হাসির কলরবে"

—গীতিমাল্য

তার পর দিন সকালে রাধারমণজীকে দর্শন ক'রে কালাচাঁদ মহাজনের সঙ্গে শিবরাজ কুর্ম্মির ধানের জমী নিয়ে যে বিবাদ চল্‌ছে তার একটা মিট্‌মাট্‌ ক'রে দিয়ে এসে নিজের আশ্রম পরিদর্শনে যেতেই মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনুযোগ কর্‌লে—"কাল সন্ধ্যায় কেন আমাদের পাঠ শোনাতে এলেন না কিশোরদা ?"

কিশোরদা বল্লেন, "আমার কতগুলো বেশী কাজ পড়েছে, তাই আস্‌তে পারিনি, আজও আমি সন্ধ্যায় আস্‌তে পার্‌বো না বোধ হয়। কিন্তু তোমরা পড়া বন্ধ করো না, কণিকা তো বেশ পড়্‌তে পারে—ঐ গীতার দশম অধ্যায় আর ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধ পড়্‌বে, তোমরা সবাই বসে শুনো। তোমাদের মধ্যে কে কে সুস্থ ? মালতী আর ব্রজরাণী অনেকটা ভালো, না ?"

তারা দু'জনেই বল্লে তারা সুস্থ হয়েছে।

তাদের দেখে শুনে কমলিনীর জন্য টাকা জোগাড় কর্‌বার কি উপায় করা যেতে পারে, এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে রামচন্দ্র জ্যেঠ্‌মলের বাড়ীর দিকে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় একটী আধা-বয়সী ভদ্র বাঙ্গালী তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বল্লেন—"আনন্দকিশোর আশ্রম কোন্ দিকে মশায় ?"

একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আনন্দকিশোর বল্লেন—"কেন বলুন তো ?"

—"আমার মনিব মথুরার এক বিখ্যাত ধনী। তাঁর একটীমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—এই দু'বছর হয়নি। সে বিধবা হ'য়েছে। তাই আমার মুনিবের ইচ্ছে, কোন একটী ভালো সাধুর আশ্রমে রাখেন। 'আনন্দকিশোর আশ্রমের' কথা তিনি অনেকের মুখে শুনেছেন, তাই এখানে তাকে পাঠাতে চান্। কিন্তু শুন্‌ছি অক্ষম বা রুগ্ন ব'লে যারা অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে তাদের জন্যেই এ আশ্রম খোলা হয়েছে। আমাদের মণিয়া অক্ষমও নয়, তার টাকার অভাবও নেই; তাই তাকে যদি আশ্রমে রাখ্‌লে নিয়ম-বিরুদ্ধ কিছু না হয়, তা হ'লে লালচাঁদ শেঠ তাঁর মেয়ের নামে আশ্রমের জন্য দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।"

বৃন্দাবনজীর দয়ার কথা মনে মনে ভেবে আনন্দ-কিশোর বল্লেন, "বেশ তো, তা হ'লে মণিয়াকে কালই

আশ্রমে রেখে যাবেন—তার নামে তার বাবা যে টাকা দেবেন তা ভালো কাজেই ব্যয় করা হবে।"

—"আপনিই কি শ্রীআনন্দকিশোর।"

—"হ্যাঁ, সেই অধমই বটে। আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, আমার কুটীরে বিশ্রাম করে, আশ্রমটা একবার দেখে, তারপরে মথুরায় ফিরে যাবেন'খুনি—এই যে আমার কুটীর—আসুন।"

আনন্দকিশোরের আতিথ্যে ও সৌজন্যে খুবই প্রীত হ'য়ে বিশ্রামের পর আশ্রম দেখে লালচাঁদ শেঠের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী খুব খুসী হ'য়ে বলে উঠ্‌লো—"বাঃ, কি চমৎকার বন্দোবস্ত! মেয়েদের রোগ ও দারিদ্র্যই শুধু ঘোচান নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ঘোচাবার জন্যে জ্ঞান-ভক্তির চর্চ্চাও প্রচুর! আমি গিয়ে শেঠজীকে এ সব বল্লে পরে তিনি তাঁর মেয়ের হাত দিয়ে আরো কত দান এই আশ্রমের উদ্দেশ্যে দিইয়ে দেবেন! আর কিছু ভাবনা নেই আপনার! ধন নাই বা থাক্‌লো, মনের সম্পদ্ যখন আপনি পেয়েছেন তখন বাইরের সম্পদ্ ভগবানের বিধানে আপনিই এসে পড়্‌বে যে!"

মণিয়ার সঙ্গে যে টাকা আস্‌ছে তার থেকে তিনি কমলিনীর ছেলের জন্যে দিতে পার্‌বেন ভেবে আনন্দকিশোর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। শেঠজীর কর্ম্মচারীকে মথুরাগামী ট্রেণে তুলে দিয়ে রূপার কুঞ্জের

উদ্দেশ্যে যেতে যেতে সহজ আনন্দে আনন্দকিশোর গান ধর্‌লেন—

"ইচ্ছাময়ী তারা তুমি !
তোমার কাজ তুমি করাও মা
লোকে বলে করি আমি !"

"সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি প'ড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্ত-রাতে মিলন-শয়নে—

*　　*　　*

চুরি করি লইয়াছ কার মুখ ? কার—
—আঁখি হ'তে ! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ! তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !"

—চয়নিকা

তখন অস্ত-যাওয়া সূর্য্যের রাঙ্গা আলো মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় রঙ্-বেরঙের জলুস্ ঝল্‌কাচ্ছে। কাশফুলের শুভ্রতা ধানক্ষেতের হরিৎ রঙের পাশাপাশি মাঠে মাঠে গঙ্গা-যমুনার কাপড় বুন্‌ছিল। "বিশাখাকুণ্ড" ও "ললিতা কুণ্ড"এর ফুটন্ত কমলদল মুদে আস্‌ছিল। "কুমুদবন"এর সুরভি-ভরা সন্ধ্যার মন্থর বাতাস শূন্য "মধুবন"এর শ্রীহীন বুকে বিরহ-তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে মরণ-কামনায় আছ্‌ড়ে পড়্‌ছিল—আঁধারতর নীলসলিলার নীলে! তমাল ও

তালীবনের ঘনচ্ছায়ার পাশ কাটিয়ে, নিকুঞ্জের মাধব-মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দকিশোর রূপার কুটীরে পৌঁছলেন। তাঁকে আস্‌তে দেখে রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার দিকে চেয়ে আনন্দকিশোর বল্লেন, "এত কাজ প'ড়েছিল তাই ছ'দিন আস্‌তে পারিনি—"

রূপা হেসে বল্লে—"কেন আসেননি তা তো আমি জান্‌তে চাইনি।"

—"তুমি না চাইলেও আমি না জানিয়ে পারি কই।"

কাজের কাহিনী শুনে রূপা বল্লে—"আমি তাই চন্দ্রাকে বল্‌ছিলুম যে, আপনাকে কাজ দেবার জন্যে রোজ রোজ নতুন নতুন দুঃখীর সৃষ্টি হ'চ্ছে—"

হাস্‌তে হাসতে আনন্দকিশোর বল্লেন, "চন্দ্রা কি জানে বলো? তুমি যে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করছ যে আমি কতটা নগণ্য, তার জন্যে সত্যই আমি খুসী।"

রূপার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। আনন্দকিশোরের জন্য আসন পেতে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়িয়ে রূপা খানিকটা ভাব্‌লে, তার পরে বলে ফেল্লে—"আপনার মতন তো সবাই নয় যে, নিজের মনগড়া কথার সৃষ্টি কর্‌বে! বেশ তো, আপনি তাই জেনেই খুসী হ'ন্‌ যে, সকলের কাছে আমি আপনার নিন্দে করে বেড়াই। কিন্তু তাই যদি ক'রে থাকি, সেও ঢের ভালো আপনি যা করেছেন তার চেয়ে!"

"কি ক'রেছি তা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"যে সুন্দর নয় তাকে সুন্দর ব'লে আমরা কখন কাউকে ঠকাইনি।" আনন্দকিশোরের হাসিমুখ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি মিনতি-ভরা চোখে রূপার দিকে চেয়ে বল্লেন—"তুমি আমার নিন্দে কর না, তা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি। আর আমিও তোমায় ঠকাইনি, এটাও তোমার বিশ্বাস করা উচিৎ।"

রূপা এ কথা চাপা দেবার জন্য বল্লে—"আচ্ছা, আপনি যখন কমলিনীর জন্যে অত ভাব্‌ছিলেন, তখন আমায় জানালেন না কেন? এই বুঝি আত্মীয়তার পরিচয়?"

"তোমাকেও তো আর কারো কাছ থেকে চাইতে হ'ত, কেন তোমায় সে কষ্ট দেওয়াবো, তাই তোমায় বলিনি। আমি জানি, অরুণবাবুর কাছ থেকে চাইতে তোমার কত বড় লজ্জা আজ!"

"সে লজ্জা কাটিয়ে উঠেছি যে! পরের দুঃখ মোচনের জন্য যদি নিজের অভিমানটুকুও ত্যাগ করতে না পারি, তা হ'লে আর কি হ'ল বলুন!"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "তা সত্যি।" একটু পরে আবার বল্লেন—"আবার 'আপনি' 'আপনি' আরম্ভ হ'ল কেন? আমিও এইবার বল্‌তে পারি—এই কি আত্মীয়তার পরিচয়?"

রূপা বল্লে—"সবাই যাঁকে ভক্তি করে তাঁকে বুঝি তুমি বলা সহজ?"

"যারা তুমি বলে, তাদের ভক্তিই সহজ; দেখো না

কেন, ভগবান্‌কে যারা খুব ভালবাসে, তারা কেউ বলে না যে "হে কৃষ্ণ! আপনি আমায় রক্ষা করুন!" তারা বলে, "হে কৃষ্ণ প্রাণের প্রাণ! তুমি আমায় নাও, আমি তোমারি।" যশোদা "তুই" বলেছিলেন, তাঁর ভালবাসার গভীরত্ব মাতৃত্বের অমর স্নেহে—সে কথা ছেড়েই দাও। তেমনি মানুষের মধ্যেও যাঁকে আমরা জানি ভালো লোক, তাঁকে যখন 'তুমি' বলি, তখনই তাঁকে যথার্থ আপনার মনে করি। এই দ্যাখো রামিয়ার মা আমায় 'তুই' বলে, সে আমায় যথার্থই মায়ের মত ভালোবাসে। সেদিন ছোঁওয়া খাওয়ার কথা বল্‌ছিলে—আদর ক'রে ভালবেসে যে যা দেয়, ভগবান্‌ পর্য্যন্ত তা গ্রহণ করেন, আর আমরা তা খেতে পারি না—? তা যদি হ'ত, তা হ'লে শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিতেন না। জাতিতে চণ্ডাল হ'য়েও সে গুণে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়েছে। সেদিন রামিয়ার মার স্নেহোপহার না পেলে আমার উপবাসে কাটাতে হ'ত—আমার জাত যাবার ভয়ে যেদিন তুমি আমায় খেতে দিলে না—"

স্তব্ধ হ'য়ে রূপা বল্লে—"সেদিন তোমায় খেতে না দিয়ে আমরা তা হ'লে অন্যায় করেছি?"

"নিশ্চয়! আমি তো জাত মানি না, আমি সকলের হাতেই খাই।"

"তা হ'লে আমাদের শাস্ত্রে বারণ করে কেন?"

"শাস্ত্রে বারণ করে না রূপা, সংস্কারে বারণ করে।

শাস্ত্রে যা বলেছে তার মানে আমরা উল্টো ক'রে ধরি বলেই সব ভুল বুঝি। নীচ-প্রবৃত্তির সঙ্গ নিতে বারণ ক'রেছে। ব্রাহ্মণ হ'য়েও যদি তাঁর প্রবৃত্তি নীচ হয়, তবে তাঁর সঙ্গও ত্যাগ কর্‌তে হবে, আর শূদ্র হ'য়েও যিনি ব্রাহ্মণের গুণে ভূষিত তাঁর সাহচর্য্য সর্ব্বদা গ্রহণীয়! গুণ-গত—জাতিগত নয়—মানুষের পার্থক্য ও প্রবৃত্তি।"

রূপা বল্লে—"আপনি কিন্তু অনেক দিন আগে একদিন বলেছিলেন সংস্কারের মানে আছে—আজ আবার সংস্কার মান্‌ছেন না কেন?"

"সংস্কার আমি কোন দিনই মানি না, কিন্তু যখনই বলেছি সংস্কারের মানে আছে, তখনি সংস্কারকে ভেঙ্গে ফেলে ভিতরের অর্থটা বোঝা উচিৎ—এই বলেছি। এই ধরো, আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পূজো থেকে আরম্ভ করে যাগযজ্ঞ যা কিছু সবই যোগের এক একটী অবস্থা, যোগের এক একটী বাহ্যিক নির্দ্দেশ; কিন্তু আমরা তা না পারি বুঝ্‌তে, না পারি জান্‌তে। তাই পূজো ইত্যাদি যা হয়, সব ঘোর রাজসিক বা তামসিক হ'য়ে পড়ে। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের পূজোর তো কোন অনুষ্ঠানই নেই। কেবল শুদ্ধ ভক্তির ব্যাপার। কিন্তু সে রকম তো সহজে হয় না—তাই সাধনা কর্‌তে হয়। সাধনা অর্থাৎ যোগ অভ্যাস। এই যে গঙ্গাজল স্পর্শ থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বাজান—যা কিছু, সব যোগের ব্যাপার—"

রূপা অবাক্ হ'য়ে বল্লে—"সে কি রকম ?"

"গঙ্গা হ'চ্ছেন জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে স্পর্শ ক'রে বা জ্ঞান-সমুদ্রে স্নান ক'রে সব কাজ কর্‌তে হয়, তা হ'লে আর দোষ হয় না। কাঁসর-ঘণ্টা থেকে আরম্ভ ক'রে সানাইএর রাগরাগিনী—সবই কাণের মধ্যে শুন্‌তে পাওয়া যায়। যখন আমরা যথার্থই পূজো করি, বাজ্‌না তখন আর বাইরে বাজাতে হয় না।"

"সে কি রকম ক'রে শোনা যায় ?" একটু হেসে আনন্দকিশোর বল্লেন—"তা তোমায় শিখিয়ে দেবো'খুনি। তখন তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে আমি মিথ্যা বল্‌ছি কি সত্যি বল্‌ছি।"

"তা কখন হয় ?"

—"হয় কি না দেখ্‌তেই পাবে। যোগের একটী বিশেষ অবস্থা—যখন ঐ আরতির বাজনা বাজে—সেইটা আমরা ভিতরে আন্‌তে না পেরে বাইরে করি। পঞ্চপ্রদীপের যে আরতি হয়, তাও ভিতরে হয়; সে সব অবস্থার দুই রূপ—পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আহুতি দেওয়াই পঞ্চ-প্রদীপের আরতি, এই হ'ল বিশুদ্ধ জ্ঞান বিচারের দিক্ দিয়ে; আবার ভক্তিযোগ অভ্যাস ও ধারণার দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে সত্যিই পঞ্চপ্রদীপের আলো দিয়ে তাঁর আরতি হয়, বাজনা বাজে, সব হয়—সে যে কি চমৎকার, তুমিও এবার সব শুন্‌বে।"

"হ্যাঁ, আমার সে সাধ্য আছে কি না! আমার সে ভাগ্য নয়!"

"সাধ্য! ভাগ্য! ওসব কথা তুলে রেখে দাও। যদি বিশ্বাস আর ভক্তি থাকে, তা হ'লে শোনা কেন, দেখ্‌তেও পাবে।"

—"দেখ্‌তে পাওয়া যায়? কি ক'রে?"

".."

"তা আমায় তুমি যেমন শেখাবে আমি তাই কর্‌ব।"

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় তো?"

"নিশ্চয়!"

"তা হ'লে—এই শোনো যা বল্‌ছি......যদি ফল না পাও আমার কথা তোমায় আমি আর বিশ্বাস কর্‌তে বল্‌ব না, আর যদি পাও তুমি নিজেই বিশ্বাস কর্‌বে........."

* * * *

আনন্দকিশোর একটু পরে বল্লেন—"দেখো, ধর্ম্মজগতেও আবার ব্যবসা চলে! হায় রে দেশ! তাই আজ তার এত দুর্গতি! আসল জিনিয লুকিয়ে রেখে নকলের উপর দিয়ে গুরুর দীক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি চলে, তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মোহে ও সাজ-সজ্জায় আসলটা চাপা দিয়ে রাখে। দীক্ষা হবে, তার যোগাড়-যন্ত্র, আয়োজন, প্রয়োজন—সে কত রকমই হয়! অথচ গুরু জানেন না শিষ্যকে, শিষ্য জানেন না গুরুকে! যখন শিষ্য গুরু হ'লে

আর যখন গুরু শিষ্য হ'লে বাধবে না, গুরু-শিষ্যর সম্বন্ধ যখন দাঁড়াবে—ভক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যে যা সম্বন্ধ তাই অর্থাৎ অহেতুক প্রীতির সম্বন্ধ মাত্র—সেই হ'ল সার্থক।"

রূপা গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—"তুমি কি তা হ'লে আমায় এখন দীক্ষা দিলে ?" হো হো ক'রে হেসে উঠে আনন্দকিশোর বল্লেন—"একেবারেই না। রক্ষে করো, ওসব আমার দ্বারা হবে না, আমি অত্যন্ত অজ্ঞান, নগণ্য লোক, আমি কখন দীক্ষা দিতে পারি ? তুমিই আমার গুরু !"

"এ রকম সব কথা বলে কেবল আমায় লজ্জা দেওয়া—" রূপার মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল—আনন্দকিশোর কি যে বলেন, আর কি যে করেন তার কিছু যদি ঠিক্ ঠিকানা থাকে। আনন্দকিশোর রূপার রাঙা মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আমি তো সত্যি কথাই বল্‌ছি—এতে আর লজ্জা কিসের ? সব তাতে তুমি এত লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে কি ক'রে।"

"তুমি যে কত রকম বল্‌ছ কিছু বোঝ্‌বার যো নেই।"

"কত রকম তো বলিনি, এক রকম বল্‌ছি—যা যা কাজ কর্‌তে বল্লুম সেগুলো অভ্যাস ক'রে যাও, সেগুলো ঠিক্ হ'লে আবার তখন ব'লে দেবো।"

রূপা ঘাড় নেড়ে বল্লে "তা কর্‌ব।"

২৭

"অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে
না কর হে যদি ক্ষমা
তবে পরাণ প্রিয় দিও হে দিও
বেদনা নব নব
আমি কি আর কব !"

রূপা বল্লে,—"আজ তো অনেক রাত্তির হ'য়ে গেলো। তা হ'লে তুমি খেয়ে যাও।"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "রাত্তিরে তো আমি খাইনে।"

—"কেন? রাত্তিরে খেলে কি হয়?"

"রাত্তিরে খাওয়াটা সংযম-বিরুদ্ধ।"

রূপা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে,—"তা একদিন না হয় সন্ন্যাসীঠাকুরের সংযম-বিরুদ্ধ খাওয়াই হ'বে—"

"তা তুমি যদি নেহাৎ না ছাড়ো, তা হ'লে তাই। ততক্ষণ গীতা আর কবীরখানা নিয়ে এসো।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে রূপা বল্লে,—"সে নেই।"

"কি হ'ল? যা দিয়েছিলুম?"

"জলে দিয়েছি—"

থম্‌কে গিয়ে আনন্দকিশোর বল্লেন, "কেন?"

এ "কেন"র উত্তর রূপা দিতে পার্‌লে না, তার

মাথাটা অপরাধের ভারে একেবারে নত হ'য়ে পড়েছিল—মুখ তুলে চাইতে বা কথা কইতে তার শক্তি ছিল না। তাকে নিরুত্তর দেখে আনন্দকিশোর দ্বিতীয় প্রশ্ন কর্লেন না,—শুধু বল্লেন, "তা বেশ করেছ—আবার কিনে নিলেই পার্তে"

"না, আর আমি কিনিনি—যেদিন তোমার দেওয়া বই ফেলে দিয়েছি সেই দিন থেকেই আমার অসুখের আরম্ভ।"

একটু চুপ্ ক'রে থেকে আনন্দকিশোর বল্লেন, "যখন তিনি যেমন করান। তাতে আর কি হয়েছে—"

রূপা বল্লে,—"তুমি ওকথা বল্তে পার, কিন্তু আমার বিশ্বাস—সেই অপরাধেই আমার অসুখ হয়েছিল।"

"তা কেন হবে? তুমি তার জন্যে আর ক্ষোভ রেখো না।"

পুরাণো বেদনার স্মৃতি রূপার মনে যেন নতুন করে জেগে উঠেছিল। সেই মনের সঙ্গে কত যুদ্ধ, কত দ্বন্দ্ব, তার পরে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর দান ফেলে দেবার ব্যবস্থা—কত ব্যথাই সয়েছে সে,—সেই ফেলে দেওয়ার জন্যে, সে সব তো আনন্দকিশোর কিছুই জানেন না—! ভাব্তে ভাব্তে রূপার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠেছিল, সে কাতর ভাবে বল্লে,—"তবু, তুমি একটীবার শুধু বলো—আমায় ক্ষমা করেছ—"

"অপরাধ কার? আমিই যে নিজেকে চির অপরাধী ভেবে ব'সে আছি এতদিন!—তার কি খোঁজ নিয়েছ?"

এর উত্তরে রূপা কিছু বল্লে না। তার মনে হ'চ্ছিল, কথায় যেন কথা বেড়ে যাচ্ছে। তাই সে একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য কথা পাড়্‌লে—"আমি যেদিন প্রথম এখানে এলুম, সেদিন আমায় দেখে তুমি চিন্‌তে পারলে?"

"নিশ্চয়ই—কেন পার্‌বো না?"

—"আমার চেহারা অন্য রকম হ'য়ে গেছে যে!"

—"তোমার চেহারা? তোমার চেহারা তো আমি কোন দিনই ভাল ক'রে দেখিনি! শুধু দেখেছিলুম—তোমার রক্ত-মাংসের শরীরটাকে বাদ দিয়ে যে সুন্দর আছেন—তাঁকে; আর দেখেছিলুম—তার মধ্যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত একখানি মুখ! আমার দেখা জিনিষ তো বদ্‌লায়নি—যেমন তেমনিই আছে। তাই না চিন্‌তে পার্‌বার কোন কারণ ছিল না—"

রূপা এবারও কোন কথা কইতে পার্‌লে না। কি উত্তর দেবে সে এসব কথার? কি জানে সে? শুধু অবাক্ হ'য়ে শুনে যাবে—এই নতুন জাগা জগতের আলোয় ভরা শোভায় সুন্দর মধুময় কথার বীণা!

আমার এ গান শুন্‌বে তুমি যদি
শোনাই কখন বলো ?
ভরা চোখের মত যখন নদী
ক'র্‌বে ছল ছলো।
ঘনিয়ে যখন আস্‌বে মেঘের ভার
বহু কালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নাম্‌বে তোমার ঘরে !
তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
গাইতে যদি বলো,
নব মেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছল্‌-ছলো !
ম্লান আলোয় দখিণ বাতায়নে
বস্‌বে তুমি একা,
আমি গাব ব'সে ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।

—চয়নিকা

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, আনন্দকিশোর ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বাল্‌ছিলেন। প্রদীপ ও উপনিষদ্‌খানা হাতে নিয়ে তিনি আশ্রমে যাবার জোগাড় কর্‌ছিলেন—এমন সময় চন্দ্রার গলার আওয়াজ শোনা গেলো—"আমরা এসেছি !"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "সৌভাগ্য!—এত দেরী যে?"

"আমরা মন্দিরে গিয়েছিলুম তাই দেরী হ'ল।"

ঘরের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ছবি সাজানো ছিল, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে রূপা বল্লে—"কি সুন্দর সব ছবি! এমন চমৎকার দেব-দেবীর ছবি কোথায় পেলে?"

আনন্দকিশোর কিছু বল্লেন না, শুধু একটু হাস্‌লেন। রূপা ছাড়্‌বার পাত্র নয়, সে ফের বল্লে,—"বলো না কোথায় পেলে? বল্‌বে না? না, বল্‌তেই হ'বে তোমায়।"

আনন্দকিশোর একটু হেসে বল্লেন, "কোথায় আর পাবো? ঐ অমনি আছে!"

—"তা কখন হয়! নিশ্চয়ই দোকানে কিনেছ? বলো না কোন্ দোকানে!"

আনন্দকিশোর হাসিমুখে বল্লেন, "আচ্ছা, সে কথা পরে হ'বে, এখন ছবিগুলো দেখোই না আগে!"

চন্দ্রা আগেই উঠে গিয়েছিল, সে ওধার থেকে বল্লে,—"দেখো, দেখো, কি সুন্দর! মহাদেব আর গৌরীর বিয়ে—রামসীতার বনবাস সুখ! এখানা কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর লাগ্‌ছে শ্রীকৃষ্ণের রাধাকে বাঁশী শেখান। এ সব নিশ্চয়ই আপনি নিজে এঁকেছেন!"

ধরা পড়ে গিয়ে আনন্দকিশোর বল্লেন, "অবসর পেলে একটু আধটু হয়। তা ব'লে কি আর ও বিষয়ে

শিক্ষা আছে কিছু যে ভালো হ'বে, আপনি আপনি যেটুকু হয়!"

"আর এতক্ষণ ধ'রে জিগ্‌গেস্ কর্‌ছি, কিছুতে মান্‌ছিলে না! আচ্ছা, সারাদিন কাজ করে এ সব চর্চ্চার সময় পাও কখন?"

আনন্দকিশোর বল্লেন, "তুমি তো দিনটারই হিসেব দিলে, এত বড় রাত্তিরটার কথা ভুলে যাচ্ছ যে!"

"কি অদ্ভূত কথা! রাত্তিরে বুঝি না ঘুমিয়ে মানুষ কাজ করে?"

"সারাটা রাত ঘুমিয়ে কাটান সহজও নয়, আর আমার মনে হয় তা উচিতও নয়—ছবি আঁকি, কখন বা গান লিখি।"

"কি গান লেখো দেখাও না।"

—"সে আর কি দেখ্‌বে—? ছেলেদের মুখ থেকে শুনো বরং, তারা এখনি গান শিখ্‌তে আস্‌বে।"

—রূপা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, "তোমার তৈরী গান তুমি ছেলেদের শেখাও?"

"হ্যাঁ, তারা গরীব, ঐ গান গেয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে দু'পয়সা পায়।"

"আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি যে তুমি কি ক'রে এত পারো?"

—"এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? যারা সংসারী

তাদের কত দিকে কত রকমের কত কাজ, কত রকমের চিন্তা সর্ব্বদা কর্‌তে হয়। সংসার নেই—তাই এই সব কাজে সময় পাই—”

আবার ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে রূপা বল্লে, “এ রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি তুমি কি ক’রে আঁক্‌লে? এত সুন্দর, এত চমৎকার হয়েছে! যে সব ছবি বিক্রী হয় সে তো এ রকম সুন্দর হয় না!”

“না, তারা অমনি আঁকে তাই সুন্দর হয় না; মনে মনে দেখে অনুরাগের তুলি দিয়ে আঁক্‌লে সে জিনিষই আলাদা হ’য়ে যায়।”

“মনে মনে কি ক’রে দেখ্‌তে হয়?”

“সমস্তই যোগের অবস্থাবিশেষে অন্তরে দর্শন হয়—সাধকেরা সেই সব গুলি ছবিতে ধরে রেখে গেছেন—নতুনদের পক্ষে ধারণার সুবিধে হ’বে বলে।” একটু থেমে আবার আনন্দকিশোর বল্লেন, “এইবার তোমার একখানা ছবি আঁক্‌বো।”

একটু চম্‌কে, শুখ্‌নো হাসি হেসে রূপা বল্লে, “এই দগ্ধ কাষ্ঠের আবার ছবি! খুব তো তোমার রসবোধ!”

মৃদু হেসে আনন্দকিশোর বল্লেন, “আচ্ছা, দেখাই যাবে রসবোধ আছে কি না!”

তাঁদের কথাবার্ত্তা এইখানে থেমে গেলো—ছেলেদের ডাকে। তারা দল বেঁধে এসেছিল। আনন্দকিশোরের

কথা আর থামে না দেখে তারা বল্লে, "আমরা যে অনেকক্ষণ ব'সে আছি কিশোরদা! আজ আমাদের গান শেখাবে না ?"

"এই যে ভাই আস্‌ছি, এই কথা কইতে কইতে একটু দেরী হ'য়ে গেলো" ব'লে আনন্দকিশোর বাইরে এসে গান সুরু করলেন।

২৯

আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গা'ব নীরব অবসরে !

—গীতিমাল্য

দিনের পর দিন যে সুখস্বপ্নের উচ্ছ্বাসে রূপার দিন কাট্‌ছিল, তা তার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ জান্‌তো না ; এমন কি চন্দ্রাও না। এই নতুন পাওয়া জগতের নাটমন্দিরে যে অভিনব দৃশ্যপট তার অন্তর-চক্ষুর সাম্‌নে খুলে গিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে সে দেখ্‌লে—এক আনন্দময় ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই কোথাও নেই ! সেই বলার অতীত আনন্দ ও উপলব্ধিতে যখন বিশ্বময় চিরসুন্দরের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে, তখন তার সমস্ত হৃদয় আনন্দকিশোরের উদ্দেশে ভক্তিতে নু'য়ে প'ড়্‌তে চাইছিল—তিনিই তো তাকে এ সন্ধান দিয়েছেন ও শিখিয়েছেন ! তাঁকে সে কি দেবে এর বদলে ? কিছু না !—তাঁকে আবার দেবে কি ? বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবসর আর দেওয়া হ'বে না। এমন কি, তাঁকে সে জান্‌তে পর্য্যন্ত দেবে না যে, তাঁর দেওয়া সাধনা সার্থক !

সেদিন সকালে উপাসনার শেষে হাত জোড় ক'রে রূপা প্রার্থনা ক'র্‌ছিল—তার দুই মুদিত চোখ বেয়ে জলধারার চিহ্ন তখনো শুখোয়নি। আনন্দকিশোর নিঃশব্দপদে কখন যে পাশের জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সে জান্‌তো না। রূপার উপাসনা শেষ হ'বার আগেই আনন্দকিশোরের ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, তবু তিনি দু'একটা রেখা এখনো নতুন ক'রে আঁক্‌ছিলেন; রূপা যে এখনি উঠে প'ড়্‌বে ও তাঁকে দেখ্‌তে পাবে, ততটা খেয়াল ছিল না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, মনটাকে উপর থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টায় রূপা তার চোখ দুটো চার দিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌লে—ক'র্‌তেই একেবারে সাম্‌নে প'ড়্‌লেন—আনন্দকিশোর! এই অসময়ে এখানে তিনি কি ক'র্‌ছেন? রূপা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাতের জিনিষটা দেখে ফেলে ব'লে উঠ্‌লো—"কি ভয়ানক দুষ্টু তুমি। যত সব অন্যায় কাজ! তাই বলি, এত সকালে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে!"

আনন্দকিশোর মৃদু হেসে বল্লেন, "আর তুমি বুঝি ভারী লক্ষ্মী। কখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা হচ্ছি, এখনো পর্য্যন্ত ব'স্‌তে বল্লে না। নিজের আনন্দে নিজেই মত্ত।" রূপা একটু চম্‌কে গিয়ে বল্লে, "কি রকম, আনন্দ কিসের?"

আনন্দকিশোর শান্তভাবে বল্লেন, "কেন, সাধনা ক'রে আনন্দ হচ্ছে না?"

অবাক্ হ'য়ে রূপা বল্লে, "তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

"যা জানা, তা আর জান্‌বো না!—তুমি যেগুলো পাও বা দেখো বা বোধ করো, আমাকেও সেগুলো বোধ ক'র্‌তে, পেতে ও দেখ্‌তে হয়।"

রূপার আশ্চর্য্য হওয়ার মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল, সে কিছুতেই এই লোকটিকে বুঝে উঠ্‌তে পারবে না দেখ্‌ছি। অন্য সময় ঠিক্ সাধারণ লোকের মত; আবার যখন এ সব কথা বলেন, তখন মনে হয়—তিনি যেন একজন মহাযোগী। এই সকালে উপাসনার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তার উচিৎ ছিল দেখ্‌বামাত্রই তাঁকে ভক্তি ক'রে প্রণাম করা; কিন্তু তা করা তো দূরের কথা, সে ঘর থেকে এসেই তাঁকে "তুষ্টু" সম্বোধনে আপ্যায়িত ক'রে সমবয়সীর মত তর্কাতর্কি লাগিয়েছে! এক এক সময় মনে হয়, তিনি যেন দেবতার মত শুধু পূজার পাত্র; আবার এক এক সময় এমনি ভুলিয়ে রাখেন যে, তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মত হাসিকথা না ক'য়ে কিছুতেই থাকা যায় না। না যাক্, এত সে ভাব্‌তে পারে না। এই তরুণ একজন অনাত্মীয়, ইনি কখনই গুরু হ'বার যোগ্য নন্—কেন সে এত ভাব্‌ছে তাই নিয়ে! যা অসম্ভব তা হয় কখনো! এই তো অল্প বয়েস, আর এই ছেলেমানুষী

কথাবার্ত্তা, এক এক সময় এম্‌নি পাগ্‌লামি করেন যে, তাঁকেই উল্‌টে বোঝাতে হয়। মনে মনে এই মত বোঝা-পাড়া ক'রে নিয়ে রূপা বল্লে, "তুমি যে কত কি ব'ক্‌ছ, তার আর ঠিক্‌-ঠিকানা নেই—আমি যা দেখ্‌বো, বোধ ক'র্‌ব, তুমি তাই ক'র্‌বে? তা হ'লে বল না কেন তুমি সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী।"

আনন্দকিশোর ব্যথা পেয়ে বল্লেন, "তুমি যদি বিশ্বাস না করো, তা হ'লে আর ব'ল্‌ব না। কিন্তু রূপা! অন্তর্য্যামী তো আমাদের সকলেব অন্তরেই আছেন—সে-ই তো আমাদের আসল রূপ, আশ্চর্য্য হওয়ার তো এতে কিছু নেই! আত্মার স্বভাব—ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া; হ'তেও হবে তাই—একে তো কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।" আবার সেই সব কথা—তবু রূপা তার সঙ্কল্প ছাড়্‌লে না; সে বল্লে, "ও সব কথা এখন থাক্‌। আগে বলো দিকিন্‌ এই ছবিখানা আঁকার মানে?"

—আনন্দকিশোর ছবিখানার নীচে নাম লিখ্‌তে লিখ্‌তে বল্লেন, "মানে আবার কি।"

"কি লিখ্‌লে দেখি?"

"ছবির নাম লিখ্‌লুম—"

—"কি নাম—দেখি।"

—"রূপহীনার রূপ।"

—"নামটা তো বেশ সুন্দ !"

আনন্দকিশোর এবার বলে ফেল্লেন, "কল্‌কাতার প্রদর্শনীতে পাঠাবো।"

রূপা ভয় পেয়ে বল্লে, "ও সব হবে না—কিছুতেই হবে না।"

—"কেন হবে না? আমার ছবি আমি যেখানে খুসী পাঠাতে পারি।"

—"এ জেদ্‌ তোমার ভাল নয়; আমি তা হ'তে দেব না।"

আনন্দকিশোর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আর দেবো না বল্লে কি হ'বে বলো? এঁকে নিয়েছি, এখন পাঠালেই হ'ল।"

রূপা বিরক্ত হ'য়ে বল্লে, "তা হ'লে সে অধিকার তোমাকে দেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে।"

আনন্দকিশোর আবার একটু হেসে বল্লেন, "সেটা তোমার আগে ভাবা উচিৎ ছিল—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'।"

এই কথা ও হাসি রূপাকে আরো চটিয়ে দিল। এই লোককেই আবার সে ভাব্‌ছিল যোগীপুরুষ—হায় রে! কেবল জানেন মানুষকে কি ক'রে জ্বালাতন ক'রতে হয়! সে এবার স্পষ্ট বল্লে, "তুমি একবার ভেবে দেখ্‌ছ না যে, নিজের নাম জাহির কর্‌বার লোভে কত বড় অন্যায় আমার উপর কর্‌তে যাচ্ছ!"

"এতে আর অন্যায় কি।"

—"অন্যায় না? এ ছবি যখন আমার স্বামীর চোখে প'ড়্‌বে তখন?"

—"তখন আর কি? তোমার ছবি দেখে হয় তো তিনি তোমায় নিতে আস্‌বেন—তোমায় মনে প'ড়ে যাবে!"

—"কখনই না—তিনি উল্‌টে ভয়ানক রেগে যাবেন।"

—"যদি রাগেন তো আমারই উপর রাগ্‌বেন, তাতে আর ক্ষতি কি?"

"নিশ্চয়ই ক্ষতি আছে।"

—"আমার পক্ষে ক্ষতি-বৃদ্ধি দুই-ই সমান; ওতে কিছু এসে যায় না।"

রূপা বল্লে, "শুধু শুধু কি দরকার একজনের অপ্রিয়-ভাজন হ'য়ে?"

—"শুধু শুধু তো নয়! যদি ধরো মন বদ্‌লায়, তখন তোমায় নিয়ে যেতেও পারেন।"

রূপার এতক্ষণে মনে হ'ল—তবে নাম জাহির কর্‌বার জন্যে আনন্দকিশোর প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাচ্ছেন না—এই উদ্দেশ্যই ছবি পাঠাবার কারণ! তা হ'লে সে তো ভয়ানক অন্যায় ক'রেছে এতক্ষণ তাঁকে এই সব ব'লে! সে তো এতটা বুঝ্‌তে পারেনি। এবার সে বল্লে, "আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলুম, এর মধ্যেও যে তোমার পরোপকারের উদ্দেশ্য আছে তা বুঝ্‌তে পারিনি"—

বিষণ্ণমুখে আনন্দকিশোর বল্লেন, "যখন এঁকেছিলুম, তখন এ উদ্দেশ্য মনে ছিল না; আঁকার আবেগেই এঁকেছিলুম! তারপর যখন শেষ হ'য়ে গেলো, তখন দেখ্‌লুম খুব সুন্দর হয়েছে; তখন মনে হ'ল প্রদর্শনীর কথা! রচনা যখন রচিত হয়, তখন উদ্দেশ্য নিয়ে ক'রতে গেলে তার সহজলীলা নষ্ট হ'য়ে যায়। ভাবের আবেগে, কল্পনার সৃজনীশক্তিতে শিল্পীরও অজ্ঞাতে যে রচনা রচিত হ'য়ে ওঠে—সেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জিনিষের এমনি নিয়ম যে, তার মধ্যে আপনা থেকেই শিবসুন্দর ও সত্য এসে ধরা দেন্! হিতোদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পী রচনা করে না; কিন্তু হিতোদ্দেশ্য আপনি এসে তার রচনার মধ্যে ধরা দেয়।"

কবির কাব্যের এ সব নিগূঢ় রহস্য রূপা বুঝ্‌লে কি না, জানি না; তার মনের মধ্যে তখন একটা অনাগত বেদনার ভয় আসা-যাওয়া কর্‌ছিল। শুষ্ক মুখে সে বল্লে, "আমার আর কোথাও নড়্‌বার ইচ্ছে নেই।"

তার শুখ্‌নো মুখের দিকে চেয়ে ততোধিক বিষণ্ণমুখে আনন্দকিশোর বল্লেন, "আমিও যে তা ভাব্‌তে পারিনি কখন—কিন্তু কেমন ক'রে যে কি হ'য়ে যায়! মানুষ অজ্ঞাতসারে নিজের অচাওয়া জিনিষও চেয়ে ফেলে—এইটাই আশ্চর্য্য—!"

সেদিন কাজকর্ম্ম সেরে আনন্দকিশোর যখন বাড়ীর

পথে ফির্‌ছেন তখন শীতের সন্ধ্যা। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস আনন্দের গায়ে শিহরণ দিয়ে ব'য়ে গেলো। একটা নীড়-ভোলা পাখী পথের ধারের একটা ঝোপে ব'সে এদিক্‌-ওদিক্‌ চেয়ে নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীদের অনুসন্ধানে হতাশ হ'য়ে কি ক'রে রাত কাটাবে ভেবে পাচ্ছিল না। কুঞ্জে পৌঁছে আনন্দকিশোর দেখ্‌লেন—চড়া-পড়া যমুনার সুদূর কালো জলে তরঙ্গ নেই, উচ্ছ্বাস নেই; যেন একটা নির্জীব, নিশ্চল দেহপিণ্ড। তাই তো, যমুনার উজান বওয়া যে সেই কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার দিন থেকে ফুরিয়ে গেছে! আনন্দকিশোরের বুক কেঁপে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যমুনার মৌন ব্যথাভরা বুকের উপর গভীর সমবেদনা নিয়ে মিশিয়ে গেলো!

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে,
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে !

—কবিমানস

পল্লীগ্রামে বেড়াতে গিয়ে অরুণ ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরেছিল। যে ক'খানা নতুন ছবি সে এবারে এক্‌জিবিসানের জন্য ঠিক্ ক'রে রেখেছিল, সেইগুলো অন্ততঃ শেষ দিনেও সে এক্‌জিবিসানে পৌঁছে দিতে পার্‌বে ভেবে তাড়াতাড়ি অসম্পূর্ণ আঁকাগুলো শেষ ক'রে নিচ্ছিল। এক্‌জিবিসান্ খোল্‌বার দু'দিন আগে সে তাড়াতাড়ি সেগুলো দিয়ে এলো, কিন্তু কি কি ছবি ও কত ছবি এসেছে না এসেছে, সে সব ঘুরে দেখ্‌বার তখন তার সময় ছিল না।

স্বপ্নপুরীর নিদ্‌মহলে, চুণির ঝালর-ঝোলা মণির পালঙ্কে, পারিজাত ফুলের বিছানায়, ঘুমন্ত যে রাজকন্যা তার ঘুম ভাঙ্গাতে সাতটী দুধ-সাগরের বুক বেয়ে রাজকুমার

আস্‌তেন; এসে সোণার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙ্গাতেন—অরুণ ছিল সেই সোণার কাঠি দিয়ে জাগিয়ে তোল্‌বার মতন মানুষ। সে যে নেহাৎই রঙ্‌-চঙ্‌ নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌তো, আর তার অন্তরে সত্য ও সুন্দরের কোনো ছবিই ছিল না, তা ঠিক্‌ নয়—ছিল; একটু আবরণে, লঘু মেঘে লুকিয়ে থাকা চাঁদের মত—পাতার আড়ালে ফুটি ফুটি কুঁড়িটীর মত তার শিল্প-প্রতিভা একটু যেন আবড়ালে আধজাগা ছিল—দরকার হ'য়েছিল তাঁর সোণার কাঠি ছোঁয়ানর।

এবারের এক্‌জিবিসানে আনন্দকিশোরের নাম লেখা রূপার ছবিখানা চোখে প'ড়বামাত্র সে অবাক্‌ হয়ে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল যেন সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্ত রহস্য এক সঙ্গে হয়ে, তার এই আজকের অভাবনীয় অভিজ্ঞতার সমস্যা পূরণ ক'র্‌তে গিয়ে, মস্তিষ্কের সমস্ত ক্রিয়মাণ যন্ত্রগুলোকে ওলট্‌-পালট্‌ ও নাস্তানাবুদ্‌ ক'রে ফেল্‌ছে। সেই কুৎসিৎ কদর্য্য চেহারার আবার ছবি আঁকা! সেই ছবিই আবার মনোহরণ ক'রেছে রূপ-দক্ষদের! তারই প্রশংসা কাগজে কাগজে, তারই প্রভাবে এবারের এক্‌জিবিসানের সমস্ত ছবিই হেরে গেলো! সেই তারই ফ্রেমের নীচে "প্রথম পুরস্কার—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র" বড় বড় অক্ষরে লেখা! তার চেয়ে একটা এফ্রিকান্‌ বা অন্য কোন দেশের বিশ্রী চেহারা এঁকে যদি কেউ ছবি দেয়,

তা হ'লে তাকেও তো পুরস্কার দেওয়া উচিৎ ? এ যে একেবারে ন্যায়ের লেশশূন্য অবিচার ; একে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারা যায় না। এ রকম পক্ষপাতীত্ব ও ভুল বিচারে তাদের এই প্রদর্শনীভুক্ত সমস্ত শিল্পীদের উপরেই অন্যায় করা হয়েছে। এর প্রতিকার নিশ্চয়ই দরকার।

অরুণের চেয়েও ঢের বেশী রেগে উঠেছিল অন্য শিল্পীরা। যোগীন্ ও নীরেশ অরুণের কাছে এসে স্পষ্ট ব'লে ফেল্লে, "আপনি আগে থেকে এলেন না ব'লেই এমন বিচার হ'ল, অরুণবাবু! নইলে কার সাধ্য আপনার কথার উপর কথা কয়! আর আপনি যে এত বড় একটা মিথ্যাকে অনায়াসে প্রশ্রয় দিতে পার্তেন তা কখনই না। না বোঝে আর্ট, না বোঝে কিছু; এই রকম সব মেড়ো-ফেড়োদের দলে নেওয়াই ভুল। অরুণ বল্লে, "আমি যে কিছুতেই আস্তে পার্লুম না, যোগীন্ বাবু! এই মাসখানেক হ'ল এম্নি জ্বরে ভুগ্ছি—ছবি-বিচারের দিন আস্বার খুবই ইচ্ছে হ'য়েছিল, কিন্তু সেই দিন সকাল থেকেই কেঁপে ১০২ জ্বর! নইলে কি আমি আসিনে! তারপর কাগজে দেখি "রূপহীনার রূপ" প্রথম পুরস্কার। প্রথমটা প'ড়েই তো তাক্ লেগে গেলো, তারপর ছুট্তে ছুট্তে এসে দেখি এই কাণ্ড! তা কি ব'লছিলেন ? মেড়ো-টেড়ো কেউ এর মধ্যে আছে না কি ?"

নীরেশ তাড়াতাড়ি বল্লে,—"তা বুঝি জানেন না ? তবে

আর বল্‌ছি কি—লোকটা খুব পয়সা করেছে কি না। সে যে কি ক'রে এখানে ঢুকেছে জানি না—আসল কথা হচ্ছে, শেঠজী পয়সাওলা লোক, টাকা দিয়েছে অনেক; কাজেই তার একটা জোর আছে তো?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে অরুণ বল্লে, "তার সঙ্গে যে ছবিখানার কি বিশেষ সম্বন্ধ তা তো বুঝ্‌লুম না।"

যোগীন্ বল্লে,—"তার মানে আনন্দকিশোরের সঙ্গে শেঠ্‌জীর যে খুব ঘনিষ্ঠতা মশায়!" পাশে আর একজন ছেলেমানুষ শিল্পী দাঁড়িয়েছিল। সে একটু হেসে ফেলে বল্লে, "শেঠ্‌জীর মেয়ে যে আনন্দকিশোর-আশ্রমের কর্ত্রী কি না, সেই জন্যে আনন্দকিশোরের গুণগানে শেঠ্‌জীর ভারী আস্থা।" অরুণ এবার কতকটা বুঝে বল্লে—"তা হ'লে আপনাদের মতে শেঠ্‌জীর জন্যেই আনন্দকিশোর প্রথম পুরস্কার পেয়েছে?"

সবাই বল্লে,—"তা নয় তো কি। নইলে হরিৎ বাবুর এমন সব ছবি, আপনার এমন পাকা হাতের রচনা; তা ছাড়া, অতীনবাবু, পুলিনবাবু এঁরাও তো কম নয়। এঁরা না পেয়ে কি আর সেই কোথাকার এক পশ্চিমের গণ্ডমূর্খ আনন্দ-কিশোর, সেই কি প্রাইজ পাবার যোগ্য হ'ল? আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিন্, আমরা না হয় পাবার অযোগ্য, তা ব'লে আপনারা থাক্‌তে, আপনারা পেলেন না আর পেলে কি না সেই একটা কেলেভূত অশিক্ষিত—!"

এমনি সব মন্তব্য জানিয়ে খানিক বাদে তারা তো চ'লে গেলো। একজিবিসান্ তখন প্রায় নিরিবিলি হ'য়ে এসেছে; রূপার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে অরুণ ভাব্ছিল—শেঠ্জী ধনী, না হয় টাকা দিয়েছে, তাই ব'লে তার কথায় যে বিচারকদের সায় দিতে হবে, তার কোন মানেই নেই। খারাপ ছবিকে ভালো ব'লে প্রাইজ দেওয়াতে সে কখনই পারে না। এই গুজব্গুলো যে যোগীন্ নীরেশদের বিদ্বেষ-আগুনের ফুল্কী থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে, তা বেশ স্পষ্টই অরুণ বুঝ্তে পার্লে। গুজব ও নিন্দে মানুষের নামে রটাবার সময় তার আর কোন সম্ভব অসম্ভব থাকে না, প্রায়ই অদ্ভুত ও অসম্ভব কথাগুলো প্রচার করাই এর উদ্দেশ্য।

অরুণ এবার ভালো ক'রে ছবিখানা আবার দেখ্লে—দেখ্তেও ভালো লাগ্ছে, মনেও ছুঁয়েছে! বসন্তের দাগ-আঁকা মুখখানি, তার মধ্যে ঐ টানা টানা ভাসা ভাসা ঘনপাতায় ঢাকা চোখ দুটী গভীর ভাবের আবেগে ছল ছল উজ্জ্বল, যেন সর্ব্বস্ব নিবেদন করার গৌরবে শান্ত সুন্দর মহিমায় উদ্দীপ্ত! পূজারত জোড়করা হাত দু'খানি, তাও কি সুন্দর, কত সুন্দর! উপমার জন্য শিল্পী আবার দু'খানি চরণের উপর সচন্দন তুলসীপত্র এঁকেছেন, নীচে লেখা—

রঙ্ কালো শোভাহীন তুলসীর পাতা,
তবু কবি তার নামে লেখে জয়গাথা—

রূপ আছে রূপহীনার সবাই না দেখে,
যে দেখে সে রাখে তারে বুকে বুকে এঁকে,
কালোয় আছে যে আলো মলিনে সুন্দর,
শিল্পী বলে সে মাধুরী চির মনোহর!

সুন্দর! অন্যে যাই বলুক্, অরুণকে মান্‌তেই হ'বে যে, যোগ্যতম স্থানেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তা যদি সে না মানে, তা হ'লে কলাবিৎ হ'বার কোন দাবীই সে রাখে না! এটা বাহ্যিক ভাবে সে স্বীকার করুক্ আর না করুক্, অন্তরাত্মার কাছে তো অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই।

যাকে সে বিশ্রী বলে দূরে রেখে দিয়েছে, তাকে কি আবার কাছে নিয়ে আসা যায় না? চিরদিন তার বাইরের রূপটাই দু'চোখ দিয়ে আস্বাদ করা হ'য়েছে, তার অন্তরের মাধুরী তো কখন উপভোগ করা হয়নি! এবার তা হ'লে সেই সুন্দরকে, যা শিল্পীর সাধনার ধন, তাকেই সে বরণ করে নিয়ে নিজেকে ও তাকে সার্থক করে ফেল্‌বে না কি? হ্যাঁ, তাই সে কর্‌বে এবার। অনেক ঘোরা ঘুরেছে সে। পৃথিবী বেড়ান শ্রান্ত তীর্থ-যাত্রীর ভুল-ভাঙ্গা মনের সর্ব্বস্থানেই ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করায়, নিজের ঘরে ফিরে আসার মত অরুণও তার বাইরের রঙ্‌রূপের একটানা উপভোগের শ্রান্তিতে যেন এলিয়ে গিয়েই শান্তি-ভরা গৃহের পানে চাইলে, কিন্তু গৃহলক্ষ্মী

কোথায়? তাকে যে সে নিজেই তাড়িয়ে দিয়েছে। এতটুকুও তার বাধেনি, সবার সাম্‌নে তাকে অমন ভাবে লাঞ্ছিত ক'র্‌তে। কিন্তু স্ত্রীকে সে ত্যাগ ক'রেছে ব'লে তার আর কি কোনো দাবীই নেই তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আন্‌বার? নিশ্চয়ই আছে।

তার পর অরুণের মনে হ'ল—রূপার মুখের যে ঐ দুরন্ত ব্যাধির বিশ্রী দাগ, তা যেন তারই ইন্দ্রিয়-প্রবণতার চিহ্ন হ'য়ে রূপার মুখে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। উঃ! কি ভয়ানক! আর রূপা যেন সর্ব্বংসহার মত তার সেই দান সহ্য ক'রে নিয়েছে ব'লে ত্যাগ ও ধৈর্য্যের অপরূপ সুষমা তার নষ্টশ্রীর মধ্যেও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—আজ যে তার চোখে সবই ধরা পড়ে গেছে!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে অরুণ বাড়ী ফিরে এলো, এসেই সে হুকুম দিলে, কাল সে রূপাকে আন্‌তে বৃন্দাবনে যাবে; তার যাবার আয়োজন যেন সব ঠিক্ থাকে। চাকর-দাসীদের মহলে খুব একটা আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেলো, কারণ রূপাকে ভালবাস্‌তো না এমন প্রাণী তার স্বামীগৃহে একটীও ছিল না। কিন্তু বিধাতার কলম থেকে অন্য কথা বেরিয়েছিল, তাই অরুণের ইচ্ছাকে কেটে দিয়ে তাঁর কলমের রায় প্রকাশ হ'ল—সেই রাত্তির থেকেই অরুণের আবার কেঁপে জ্বর এলো—একেবারে ১০৫!

দুর্গাবতী প্রসাদপুরেই ছিলেন। ছেলের অসুখের খবর

পেয়ে তিনি সেই দিনই রওনা হ'লেন। ভয়ে ভাবনায় অস্থির হ'য়ে তিনি যখন অরুণের মাথার কাছে এসে ব'সে প'ড়্লেন, তখন অরুণ জ্বরে বেহুঁস্! ছেলের কপালে হাত দিতেই মায়ের প্রাণ-ফাটা অশ্রু ঝর্ ঝর্ ক'রে ছেলের মুখের উপর ঝ'রে প'ড়্ল। রক্তচক্ষু মেলে অরুণ বল্লে "মা এসেছ? কাঁদ্ছ বুঝি? ঐ জন্মেই তোমায় খবর দিতে চাইনি।"

অনুযোগ ও ভৎর্সনা-মাখা স্বরে মা ব'লে উঠ্লেন, "ঠাকুরপূজো মাথায় থাকুন্, আর কখন তোকে ফেলে যদি এক পা নড়ি! সেখানে আমার মনটা দিনরাত ছট্‌ফট্ ক'র্ছে, অথচ না দেয় কেউ একটা খবর, না পাই নিয়মিত চিঠি! অমন শরীর! এ কি করেছিস্ বল্ দেখি? আর বৌমার হ'ল কি? এতদিন ধ'রে কেউ হাওয়া বদলায় তাও তো কখন শুনিনি! সে কি চিরদিন ঘর ছেড়ে থাক্‌বে না কি? ভালো জ্বালাতেও পড়া গেছে যা হ'ক্! এমন সৃষ্টিছাড়া মেয়ে সাত জন্মেও দেখিনি!" অরুণ কোন উত্তর দিলে না। তার ও রূপার মধ্যে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তা তো আর মা জানেন না, আর তা বলাও যায় না, বল্‌তে গেলে তার নিজের অনেক কথা এসে পড়ে, অনেক দোষও।

ছেলেকে নিরুত্তর দেখে দুর্গাবতী আবার বল্লেন, "তোর যে ঐ কি এক বাতিক হ'য়েছে ছবি আঁকা, ঐ বিদ্‌ঘুটে

সখের জন্যে সব মাটী হ'ল। আর দেখাশুনো না কর্‌লে বিষয়-আশয়ই কি থাকে, সব পাঁচভূতে লুটে নিচ্ছে, ব্যয়ের কম্‌তি নেই, অথচ আয় গেছে, তুই রইলি এখানে আর জমিদারী রহিল পড়ে নায়েব-সুমারনবিশের হাতে—তাদেরও মজা, পরের টাকায় প্রভুত্ব ক'রে দু'পয়সা জমিয়ে তুল্‌ছে। এবার ভালো হ'য়ে দেশে চল্‌—নইলে দেনায় জমিদারী বাঁচান যাবে না।"

মায়ের এতগুলো উত্তেজিত কথার উত্তরে অরুণ শুধু একটু হেসে বল্লে,—"তুমি কেন অত অস্থির হ'চ্ছ মা? সব ঠিক্ হবে।"

এর উত্তর না দিয়ে নবীনকে ডেকে দুর্গাবতী বল্লেন, "আমার নাম দিয়ে বৌমাকে টেলিগ্রাম ক'রে দাও, তুমি তাঁকে কাল আন্‌তে যাচ্ছ—এক্ষণি—দেরী করো না।"

বৃদ্ধ নবীন হাত জোড় ক'রে বল্লে, "যে আজ্ঞে। আপনি না এলে ছেলেমানুষের সংসার ভেসে যাচ্ছিল।"

———

ভালোমানুষ নইরে মোরা
ভালোমানুষ নই,
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ !
দেশে দেশে নিন্দে রটে
পদে পদে বিপদ্ ঘটে
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথাই কই !

—ফাল্গুনী

•

ফাল্গুনের দখিণ্ বাতাস ফুলের পরাগ উড়িয়ে পাপিয়ার পাঁচ সুরের ঢেউ ব'য়ে, তারহীন বীণার মত আপনি বেজে সবার প্রাণের তার বাজিয়ে বাজিয়ে অপরূপ দোলদার ছন্দে নাচ্তে নাচ্তে চলেছিল—নাচের এক এক তালে তার পায়ের নূপুর ঘিরে ফুটে উঠ্ছিল—অশোক, করবী, পারুল, কাঞ্চন, শিমূল, পলাশ আরো কত কি লাল্ গুলাল্। ডালিম ফুলের রক্ত কুঁড়ি তার অ-তার বীণার মাথায় চূড়ার মত সে পরিয়ে নিলে, আর সজ্‌নে আর বাতাবীনেবুর গন্ধভরা ফুলের তবক্ কবচ ক'রে উপর হাতে বেঁধে, মাথায় পর্‌লে বকুলের মুকুট ! সকাল সন্ধ্যায় সেই মুকুট থেকে বকুলরাশি যমুনাপুলিনে ঝ'রে

প'ড়ে, কালিন্দীর কালো বুক মাধবীর শাদা মুখের ছায়ায় ঝক্ ঝক্ করে! কুঞ্জে কাননে নতুন পাতার রাঙা রাঙা আভা, সহকারের মাথায় পরা নব মঞ্জরীর সোণার টোপর, গায়ে অস্তরবির রাঙা আলোয় চেলীর বেনারসী মোড়া, নতুন বরের মত উচ্ছ্বাস আবেগে কাঁপা বুক!

রূপারও বিগতশ্রী মুখখানিতে আবার দুধে আল্তা গোলা রঙের গোলাপ ফুটে ওঠ্বার আভাস দিচ্ছিল। তার রোগ-মলিন রোগা শরীর বসন্তের মাধবীলতার মত আবার সুন্দর ও পেলব হ'য়ে উঠেছিল।

কাল যেমন সৌন্দর্য্য হরণ ক'রেছিল, কালই আবার তা ফিরিয়ে দিতে এসেছে; কিন্তু রূপ নষ্ট হওয়ার দিনেও রূপা যেমন তা সহজে টের পায়নি, আবার ফিরে আসার দিনেও তা সহজে মেনে নিতে কিসের একটা অজানা লজ্জায় সে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্ছিল! আজ এই বসন্তের দিনে হাতে কোন কাজ ছিল না, তাই সে সেই অবসরে গাইছিল—

যায়নি এখনো যায়নি!
তরুর তলায় বকুল এখনো
হয়নি মলিন হয়নি শুখ্নো,
কত যে মুকুল পড়ে অযতনে
আদর যে তারা পায়নি!
বসন্ত আজো যায়নি!

তুলে নে না ফুল পাতিয়া আঁচল্
আন্ সখি সাজি মালা গাঁথি চল্
এই বেলা সখি পারুল পাটল্
তুলে নে যতনে তুলে নে,
নবমল্লিকা গন্ধরাজায়
হারাণো সেদিন ভুলে নে !
নবকিশলয় চপল স্তবক
কবরীতে দে'না শোভিবে অলক
হাসিবে জ্যোছ্না ঝলক্ ঝলক্
দে দোল্ দে দোল্ দোল্ দে !
কিংশুক আর স্বর্ণ কেশর
মাধবী করবী কামিনী অধর •
মালতী বিতানে ছড়ায়ে দে' সই
কনক চাঁপার হ'ল্‌দে !

চন্দ্রা চুপি চুপি এসে তার কাঁধের উপর হাত রেখে বল্লে—"আর গানে কাজ নেই।"

রূপা চম্‌কে উঠে বল্লে, "তোর কথায় কিনা ! কাজ আছে !"

"বৃন্দাবনের ভাঙ্গা কুঁড়েয় আর থাকে না, অরুণবাবুকে খবর দেওয়া যাক্ !"

চোখ তুলে রূপা বল্লে, "বসন্তের হাওয়া তোর মনেও সাড়া দিয়েছে দেখ্‌ছি, তাই বুঝি গায়ের জ্বালাটা আমার উপর দিয়ে মেটাচ্ছিস্ ?"

চন্দ্রা গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "না, তা নয়, তুমি আবার তেমনি সুন্দর হ'য়েছ, যেন রূপের বাণ—"

—"তুই না হয় সেই বাণের স্রোতে ডুবে মর্‌বি, আর তো কেউ মর্‌ছে না যে অত ভয়!"

চন্দ্রার মুখখানা আরো যেন গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো—যার স্ত্রী তার কাছে একে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লেই যেন সে বাঁচে! এত শোভনীয় ও লোভনীয় রত্ন পথের ধারে বিনা জিম্মায় ফেলে রাখ্‌তে ভয় করে যে!

সে বল্লে—"না, ঠাট্টা ভালো লাগে না; আজই তুমি অরুণবাবুকে চিঠি লেখো—তোমায় নিয়ে যেতে।"

"আমি এমন কি আপদ হ'য়েছি, চন্দ্রা তোদের?"

রূপার কাতর মুখের এই করুণ কথাও চন্দ্রাকে টলাতে পার্‌লে না; সে তেমনি ভাবেই বল্লে, "আজ চিঠি লিখ্‌লে কাল পাবেন, নয় তো পরশু নিশ্চয়ই পাবেন।"

চন্দ্রা ফের সেই কথা বলায় রূপার মাথাটা যেন আগুন হ'য়ে উঠ্‌লো, রেগে গিয়ে সে ব'লে ফেল্লে—"তোর তো আস্পর্দ্ধা কম নয়, চন্দ্রা! আমি যাব না, তোর কি তাতে? সুখ-সম্পদের এত বড় কাঙ্গাল আমি নই! আর আমার সতীত্ব, আমার ধর্ম্ম—সে আমারই হাতে, তার জন্যে অরুণ-বাবুর পাহারার দরকার নেই! সীতা-সতীর দেশের মেয়ের পক্ষে এ কথা হয় তো অসম্ভব রকম দূষিত, কিন্তু আমি সে উচ্চ আদর্শের মেয়ে নই, তা আমি স্পষ্ট ক'রেই

বল্‌ছি। আমার ভিতরে যে দেবতা আছেন, তাঁকে আমি হাজার সতী বা সীতার জন্যেও হীন কর্‌তে পার্‌বো না—তাতে ক'রে আমার সমস্ত অহঙ্কার যদি চূর্ণ হ'য়ে যায়, সকলের দেওয়া লজ্জায় ও অপযশে—তাও আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি। লোক আমার নিন্দে ক'র্‌লে কিছু এসে যাবে না; আমার ধর্ম্ম যদি ঠিক্ থাকে, তা হ'লেই আমি আনন্দে ও শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বো। নিজের অধিকার বজায় রাখ্‌বার জন্যে কামনা ও তুচ্ছ সুখের বশ হওয়ার চেয়ে নিজের সমস্ত অধিকার নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলে মিথ্যা অপযশের ভাগী হওয়াও শত-গুণে ভালো।"

এত কথা শুনেও চন্দ্রা আবার বল্লে—"তোমার ও অভিমান ছাড়্‌তে হ'বে, দিদি! স্বামীর ওপর মান-অভিমান নিয়ে নিজের ইহ-পরকাল খোয়াবে শেষে! তার চেয়ে একটু না হয়—"

চন্দ্রার কথা তখনো শেষ হয়নি, আনন্দকিশোরের উতলা উত্তরীয়ের খানিকটা নবমল্লিকার নূতন পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল। দুই সখীর উত্তেজিত কথার স্বর শুন্‌তে পেয়ে তিনি কাছে এসে বল্লেন, "আজ এত ঝগড়া কিসের?"

আসন পেতে তাঁকে বস্‌তে দিয়ে চন্দ্রা বল্লে—"এই দেখুন না, মিছিমিছি রাগ!"

একঝাড় কামিনীর ফুলফোটা ঘনশাখার খানিকটা লতিয়ে এসেছিল, তার উপর হাত রেখে রূপা চুপ্টী ক'রেই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ; চন্দ্রার কথায় এবার সে মুখ ফিরিয়ে আনন্দকিশোরের দিকে চাইলে ; তার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে আনন্দকিশোর বল্লেন—"কি হয়েছে ?"

রূপা উত্তর দিলে না, চন্দ্রাই আবার বল্লে—"বলেছি অরুণবাবুকে চিঠি লিখ্তে—নিয়ে যাবার জন্মে ; এই, আর কিছু হয়নি !"

এর পর আনন্দকিশোর চুপ ক'রেই রইলেন ; কি যেন একটা মন্ত্রবলে বল্বার মত কথা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চন্দ্রাই আবার কথা কইলে—"আপনিই বলুন, যাওয়া উচিৎ কি না ?"

—"আমি কি বল্ব ? তোমাদের যা ভালো বিবেচনা হয়।"

এ কথা চাপা দেবার জন্মে একটু পরে মৃদু হেসে রূপা বল্লে—"মণিয়ার সঙ্গে না কি শেঠ্জী তোমার বিয়ে দেবেন ?"

অবাক্ চোখ তুলে আনন্দকিশোর বল্লেন "এ আবার কি কথা !"

"এই রকম কথাই তো শুন্ছি।"

"কে বল্লে ?"

"গুজব্ শুন্লুম"

"মণিয়ার বাবা আমার আশ্রমে টাকা দিয়েছেন বলে ঐ সব গুজব্ রট্‌ছে—শেঠ্‌জী অত্যন্ত ভালো লোক, এ সবে কাণ দেন্ না। তা ছাড়া মণিয়া বিধবা, বিয়ে কি ক'রে হ'বে ?"

রূপা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"বিধবা-বিয়ে হ'বে, একটা ভালো কাজও।"

আনন্দকিশোর গম্ভীর মুখে বল্লেন—"মণিয়া ভালো মেয়ে, তার নাম নিয়ে এ সব কথা যে রট্‌ছে এই দুঃখের বিষয়।"

রূপা বল্লে—"তা মণিয়ার মতন অমন সুন্দরী মেয়ে কোথায় পাবে আর ? বিয়ে কর্‌লেই পারো—"

—"আমার সে অভিরুচি নেই,—তুমি কি তা এখনো জানো না ?"

—"জানা-জানির এতে কিছু নেই। চিরদিন কি আর তা বলে এম্‌নি চলে কখন ? অসময়ে দেখ্‌বে কে ?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দকিশোর বল্লেন—"দেখ্‌বেন সেই ভগবান্ !"

বাহিরে ভুল হান্‌বে যখন অন্তরে ভুল ভাঙ্‌বে কি ?
রৌদ্রদাহ হ'লে সারা, নাম্‌বে কি ওর বর্ষাধারা,
লাজের রাঙা মিট্‌লে হৃদয়, প্রেমের রঙে রাঙ্‌বে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে,
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে
টান্‌বে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে, বাদল হাওয়া লাগ্‌বে বেগে,
নয়ন-জলের আবেগ তখন, কোনোই বাধা মান্‌বে কি ?

—অরূপরতন

টেলিগ্রামখানা রূপার হাত থেকে নিয়ে হাসিমুখে চন্দ্রা বল্লে—"এই তো বাপু, মনে প'ড়েছে, নেহাৎ-ই কি আর পাষাণ ! তা নয়, তবে—"

রূপা তার কথা থামিয়ে দিয়ে বল্লে—"তোর ব্যাখ্যা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার প্রাণটা গেলো, থাম্ দিকিন্।"

"থাম্‌তে বল্লেই আমি থাম্‌ছি কিনা ! অরুণবাবুর অসুখটা শুনেই যা খারাপ লাগ্‌ছে, নইলে আজ কি থাম্‌বার দিন্ ! তোমায় তাঁর মনে প'ড়েছে—"

রূপা এবার একটু বিরক্ত হ'য়ে আবার চন্দ্রার কথা থামিয়ে দিয়ে বল্লে—"মনে-টনে পড়া ও সব কিছু নয়; আমি তো তাঁকে জানি। আনন্দকিশোরের আঁকা ছবি-

খানাই তাঁর খেয়ালী মনের দরজায় ঘা দিয়েছে, তাই আমার ডাক্ প'ড়েছে—"

"অত হিসেব-নিকেশ স্বামীর ভালবাসার ওজন নিয়ে না-ই কর্‌লে দিদি! আর ব'সে থাকারও সময় নেই—সব গুছিয়ে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে না?"

চন্দ্রার এই ব্যস্ততার উত্তরে রূপা বেশ ধীরভাবে বল্লে—"গেলে তো?"

—"তোমার ঐ ধারার কথাগুলো আমার গা যেন পুড়িয়ে দেয়।"

ঝগড়ার সূত্রপাতেই বাড়ীর দরজায় আনন্দকিশোরের মূর্ত্তি তাদের চোখে প'ড়ে গেলো! চন্দ্রা বল্লে—"এই যে, আসুন্, আজ আপনাকেই এর নিষ্পত্তি ক'র্‌তে হ'বে।"

আনন্দকিশোর এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বল্লেন—"আবার ঝগড়া?"

—"শুধু ঝগড়া নয়! অরুণবাবুর অসুখ, যেতে লিখেছেন; —আপনিই এর বিচার করুন এবার—"

আনন্দকিশোর রূপার দিকে চেয়ে বল্লেন—"অসুখ যখন, তখন নিশ্চয়ই যাওয়া উচিৎ; বিশেষতঃ যেতে লিখেছেন যখন—"

তাঁর এই কথায় রূপার মুখটা আরো যেন ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো, সে তাঁর দিকে না চেয়েই বল্লে—"সকল বিষয়ে কি সকলের অভিরুচি থাকে? কারো কারো বা ঘুরে

বেড়াতে ভালো লাগে; কারো বা এক জায়গায় চুপ্‌টী ক'রে বাস কর্‌তে ইচ্ছে হয়; কেউ বা বিয়ে ক'র্‌বার জন্যে পাগল; কারো বা বিয়ে করার. অভিরুচি নেই! আমারও এখান থেকে ন'ড়্‌বার অভিরুচি নেই—"

আনন্দকিশোর অবাক্ হ'য়ে একটুক্ষণের জন্যে রূপার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই তরুণীটীর কাছে তিনি যে পদে পদেই হেরে আস্‌ছেন! রূপার কথা যে কোথা গিয়ে বিঁধেছে, তা মনে মনে বুঝ্‌তে তাঁর একটু দেরীও লাগ্‌লো না—বল্লেন—"কর্ত্তব্য যেখানে দাবী ক'র্‌ছে, সেখানে অভিরুচির দাঁড়াবার এতটুকুও জায়গা নেই—"

রূপা তেমনি রুক্ষ স্বরেই বল্লে—"অভিরুচির জায়গা নেই বা কর্ত্তব্যের দাবী আছে কি না, সে কথা ভাবা তোমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা—"

এই রূঢ় কথাগুলো গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—"তুমি বল্লেও আমি চর্চ্চা ছাড়্‌ছিনে, যেটা উচিৎ সেটা তো কর্‌তে হ'বে—"

রূপা বল্লে—"আমার ওপর দিয়ে তোমার ইচ্ছা প্রয়োগের কোন দাবীই তোমার নেই—আমার যা ইচ্ছে আমি করব—তুমি কেউ নও বাধা দেবার—"

রূপার এই নিষ্ঠুর অভদ্র ভাষায় আনন্দকিশোরের সমস্ত মুখখানা দুঃখে ও ব্যথায় কালি হ'য়ে উঠেছিল; তবু তাঁর চট্ ক'রে রাগ-টাগ বড় একটা হয় না; বিশেষতঃ,

এই মেয়েটীর উপর! বল্লেন—“একজন অনাত্মীয় গরীবের তোমার কোন বিষয়ে কথা কইবার অধিকার যে থাক্‌তে পারে না, তা কি আর আমি জানিনে।” আনন্দকিশোর চ'লে গেলেন। তাঁর মূর্ত্তি যখন দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো তখন চন্দ্রা বল্লে—“কি কর্‌লে ভাই! এমন মানুষকেও ব্যথা দিতে পার্‌লে?”

—“আমি নিষ্ঠুর, তাই দিয়েছি; আমার যা স্বভাব তাই তো কর্‌ব!”

“তুমি তো আগে এমন ছিলে না!”

—“না, এখন হ'য়েছি। তুই এখন গিয়ে রান্নার যোগাড় করতো, আমি আজ ভালো ভালো তরকারী রাঁধ্‌বো!”

চন্দ্রা চ'লে গেলো। এতক্ষণে এক্‌লা থাক্‌তে পেয়ে রূপা যেন একটু আরাম পেলে। তার দুই চোখ দিয়ে এতক্ষণের জমা করা কান্না অজস্রধারে নেমে এলো—কেন সে তাঁকে এত ব্যথা দিলে, তা কি তিনি বুঝ্‌তে পারেন নি? নিশ্চয়ই পেরেছেন। তার কোন্ কথাটা তিনি রাখেন, যে সে তাঁর কথা শুনে কাজ কর্‌বে? সে যে এতবার ক'রে তাঁকে বিয়ে করতে বল্‌ছে, তিনি কি তা শুনেছেন? তবে তার বেলায় সে কেন তাঁর কথা শুন্‌বে? তাঁর কোন বিষয়ে যখন তার কিছু বল্‌বার অধিকার নেই, তখন তার বিষয়ে তাঁরই বা অধিকার থাক্‌বে কেন? তাই তো সে রাগ করে তাঁকে অপ্রিয় কথাগুলো বলে ফেলেছে! কিন্তু তাঁকে

ব্যথা দিয়ে তারই কি খুব শান্তি হচ্ছে মনে ? বুকের ভিতর যে কেবলি কান্না উথ্‌লে উঠ্‌ছে। ইচ্ছে কর্‌ছে এখনি ছুটে গিয়ে তাঁকে বলে, তুমি রাগ করো না, একারটীর মত মাপ করো তাকে, আর সে অমন কথা বল্‌বে না কখন! ব্যথা না দিয়েও যেখানে উপায় নেই, অথচ ব্যথা দিয়েও যে ব্যথা নিজের বুকেই হাজার গুণ উগ্র হ'য়ে ফিরে আসে, সে যে কি ভয়ানক গোপন দুঃখ, কেমন ক'রে সে আজ বোঝাবে তা। এমনিতর ভাবনায় ও কান্নায় রূপার চোখ মুখ ফুলে রাঙা হ'য়ে উঠেছিল, আরো হয় তো খানিকটা সময় এম্‌নি ভাবেই কাট্‌তো, হঠাৎ তার মনে হ'ল—আজ হয়তো বাড়ী গিয়ে তিনি কিছুই খাবেন না, সেটাতে যে তাকে গোপনে জব্দ করা হবে, তা তিনি জেনেই এমনি কর্‌বেন। তাকে ব্যথা দিতে তাঁরও তো কসুর নেই! না, সে তা হ'তে দেবে না। আজ এই বিদায়ের দিনে তাঁকে উপোসী রেখে সে চলে গেছে—এ স্মৃতি চিরদিন যে তাকে পীড়ন দেবে; তা তো সে হ'তে দেবে না!

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কান্নার চিহ্ন মুছে ফেল্‌তে সে যখন ব্যস্ত, তখন সে শুন্‌তে পেলে নবীনের সঙ্গে চন্দ্রার কথার আওয়াজ! একটু পরেই চন্দ্রা এসে বল্লে, "নবীন এসেছে—বল্‌ছে কালকেই যেতে হবে!"

এবার বেশ শান্তভাবে রূপা বল্লে, "বেশ তো, যাবো। তুই গিয়ে তাঁকে এগুলো দিয়ে আয়। অরুণবাবু

এতদিন যে টাকা পাঠিয়েছিলেন, তা আমি সব জমিয়েছি। "আনন্দকিশোর আশ্রম"এর জন্যে আর নয় তো কমলিনীর জন্যে দান কর্‌তে বলে আসিস্‌!"

আনন্দকিশোর তখন স্নান সেরে চন্দনের ছাপ আঁক্‌ছিলেন; চন্দ্রার কথা শুনে বল্লেন, "তাঁকে ধন্যবাদ দিও, কিন্তু আমাকে পাঠাবার তো কোনো দরকার ছিল না, তিনি নিজের নামে কোথাও যেন নিজেই দান করে যান্‌—তা হ'লেই হ'ল।"

চন্দ্রা আনন্দকিশোরের বিরক্তি লক্ষ্য ক'রে একটু চুপ্‌ করে রইল; তারপরে বল্লে, "আবার ফিরে নিয়ে গেলে হয় তো রাগ কর্‌বেন।"

আনন্দকিশোর স্পষ্ট বল্লেন, "রাগ্‌বার অধিকারও তো তিনি রাখেন নি!"

এ রকম সব কথা চন্দ্রা বড় বুঝ্‌তে পারে না, তাই এ সবের উত্তর দেওয়াও তার পক্ষে সহজ নয়। সে আর কিছু না বলে নোটগুলো আঁচলে বাঁধ্‌লে, তার পরে বল্লে, "নবীন এসেছে, তার সঙ্গে কাল চলে যাচ্ছেন, এ কথাও আপনাকে বল্‌তে বল্লেন।"

উত্তরে আনন্দকিশোর বল্লেন,—"ও!"

যমুনার জলে রৌদ্রকিরণ ঝক্‌মক্‌ কর্‌ছিল। কুঞ্জের গায়ে জড়ান অপরাজিতার লতায় ও গুলঞ্চ ফুলে প্রজাপতির দল মধু খেয়ে গুণ্‌ গুণ্‌ গাইছিল। চন্দ্রা চলে গেলে আনন্দ-

কিশোর খানিকটা চেয়ে থেকে প্রসাদ পাবার জন্যে মন্দিরের পথে যাচ্ছিলেন—আবার কি মনে করে কুঞ্জে ফিরে এসে ঘরের একটী ঠাণ্ডা কোণে মাতুর বিছিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন। রূপা যেদিন প্রথম এখানে এলো, সেদিনও তাঁর খাওয়া হয় নি; আবার তার যাবার আগের দিনেও তাঁর ভাগ্যে খাওয়া নেই; নইলে পথে বেরিয়েও কেন তিনি শ্রান্ত বোধ কর্‌লেন? কত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শৈত্যে যিনি অভ্যস্ত, আজ তাঁর রৌদ্রের তাপ অসহ্য বোধ হ'ল কেন? আজ তাঁর কেন এত শ্রান্তিতে দেহমন লুটীয়ে দিলে? যে চির-তুঃখী, তার আবার নতুন করে তুঃখকে ভয় করা কেন? যে চির-বঞ্চিত, তার আবার হতাশা আসে কেন? তবু—তবু—আজ কেন সে যাবার বেলায় এমন করে কঠোর হয়ে উঠ্‌লো? ভাব্‌তে ভাব্‌তে আনন্দকিশোর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আবার চন্দ্রার ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তাড়াতাড়ি তিনি বেরিয়ে এসে বল্লেন, "আবার এই এত রোদ্দুরে এলে?"

"নিজে রেঁধেছেন—এখনি খেতে বল্লেন।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দকিশোর বল্লেন, "কেন আবার কষ্ট করে এ সব করা!"

—"বল্লেন, আজ হয় তো আপনার খাওয়া হয় নি।"

আনন্দকিশোরের দৃষ্টি মন্দিরের সোণার চূড়ায় ছিল, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। চন্দ্রা আবার বল্লে, "সত্যিই কি আজ আপনার খাওয়া হয় নি?"

শ্রান্ত দৃষ্টি নামিয়ে এবার আনন্দকিশোর বল্লেন, "তা সত্যিই হয় নি।"

"তা হ'লে তো তিনি ঠিক্ ধ'রেছেন। কেন হয় নি?"

"কি জানি, কেন বড় শ্রান্ত বোধ হ'ল—তাই শুয়ে পড়েছিলুম।"

"নিন্, তবে খেতে বসুন—অনেক বেলা হয়ে গেছে যে।"

"চমৎকার রান্না হয়েছে, তাঁকে ব'লো!"

"তবে এখন আসি—ও বেলা তো আপনি আস্ছেন?"

—"হ্যাঁ—তা—একবার যাবো।"

চন্দ্রা ফিরে গেলে রূপা বল্লে, "খেয়েছেন?"

চন্দ্রার চোখের পাতা তখনো ভিজে, সে নত চোখেই বল্লে, "হ্যাঁ, বল্লেন—খুব ভালো রান্না হ'য়েছে।"

"তখন মন্দির থেকে ফিরেছিলেন?"

"মন্দিরে যান্‌নি—উপোস করে ঘুমোচ্ছিলেন। তুমি যা বলেছিলে তাই।"

এই কথা শুনে রূপা স্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌ছিল, চন্দ্রা যেন তার মনের কথা বুঝেই বল্লে, "আমি থাকি।"

রূপা তাড়াতাড়ি বল্লে,—"তা, বেশ তো, তুই থাক্ না।"

"তুমি কিন্তু সেখানে একেবারে এক্‌লাটী—"

শুখ্‌নো হাসি হেসে রূপা বল্লে, "আমার আবার এক্‌লা কিসে! সেখানে তো অনেক লোক আছেন।"

৩৩

জানিনে ভাই ভাবিনে তাই কি হবে মোর দশা।
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা,
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজ্‌বে সেদিন তালে তালে,
"চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধু-যামিনী রে!"

—বসন্ত।

সন্ধ্যায় আনন্দকিশোর যখন এলেন তখন রূপা বাড়ী ছিল না। চন্দ্রা ছিল; সে বল্লে—গাড়ী করে রূপা মন্দিরে গিয়েছে, তাকে কিছুতেই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। তাই তিনি ভাব্‌ছিলেন চন্দ্রাকে না নিয়ে একলা গেলো কেন? খানিক পরে রূপার গাড়ী এসে থাম্‌লো, তার গায়ে একটা গরম মোটা শাল ঢাকা, পায়ের কাপড় যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তার থেকে টস্ টস্ করে জল ঝর্‌ছে। ভিজে সপ্‌সপে কাপড়ে, এই সন্ধ্যায় এতদূর থেকে স্নান করে ফেরার কি দরকার ছিল? এগিয়ে এসে তিনি বল্লেন, "এই সন্ধ্যায় স্নান কর্‌তে গিছলে? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ কর্‌বে এইবার।" রূপা তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেলো, আনন্দকিশোর আবার বল্লেন, "পুণ্যি করে ফিরে এলে বুঝি কথা কইতে নেই?"

ঘরের ভিতর থেকেই সে এর উত্তর দিলে, "পুণ্যি কর্‌বার মত সুবুদ্ধি থাক্‌লে নিরর্থকতার প্রশ্রয় দেবার জন্যে জন্মাবে কারা? পুণ্যি করার চেয়ে না করার দিকেই ঝোঁক বেশী।"

ভিজে কাপড় ছেড়ে, ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে দিয়ে, উজ্জ্বল আলোদানী হাতে নিয়ে, রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার সদ্যস্নাত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে আনন্দকিশোর চোখ নামিয়ে নিলেন, যে কথা কইতে এসেছিলেন তার খেই হারিয়ে গিয়েছিল, বল্লেন—"কথার উত্তরও ভালো ক'রে পাওয়া যায় না।" মুখের উপর থেকে হাওয়ায় ওড়া চুলগুলি সরাতে সরাতে রূপা বল্লে, "তা সত্যি, কথা কেমন আসে না।"

রূপার এই স্পষ্ট কথা আনন্দকিশোরকে চম্‌কে দিলে। তিনি বল্লেন, "আচ্ছা এই সন্ধ্যায় স্নান কর্‌তে যাওয়ার মানে?"

"সকালে লোকের সাম্‌নে পার্‌বো না, তাই অন্ধকারে সেরে এলুম।"

"চন্দ্রাকে সঙ্গে নিলে না কেন?"

"তার কারণ ছিল—"

"তা স্নান কর্‌তে হঠাৎ এত ইচ্ছে হ'ল যে?"

"কারণ ছিল তাই"

আনন্দকিশোর এবার বল্লেন—"আমায় কি সে কারণ বল্‌তে তোমার আপত্তি আছে?"

রূপার গলাটা একটু যেন কেঁপে গেলো—তবু সে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"আপত্তি? না, আপত্তি নেই। সেই টাকাটা, যেটা তুমি ফিরে দিলে সেটা যমুনায় ফেলে দিয়ে আস্‌বার জন্যে এই স্নানের ছুতো।"

সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার ম্লানছায়ায় এই দু'টী নর-নারীর অন্তর বলার অতীত একটা দুঃখ ও কান্নায় তোলপাড় কর্‌ছিল। খানিকটা স্তব্ধ হ'য়ে থাক্‌বার পর রূপার রক্তরাঙা মুখখানার দিকে চেয়ে আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—"আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে এত বড় একটা অন্যায়ও কর্‌লে—কিন্তু দণ্ড কি অপরাধের চেয়েও বেশী হ'য়ে যাচ্ছে না? সেদিকেও একটু লক্ষ্য রাখা উচিৎ।"

"অন্যায় কিসের?"

"অন্যায় না? যা গরীব-দুঃখীর ক্ষিধে মেটাতে পার্‌তো, তুমি তা অনায়াসে জলে দিয়ে এলে! এত টাকা কেঁউ কখন এমন নিশ্চিন্তমনে জলে দিয়ে আস্‌তে পারে, তাও ধারণা ছিল না।"

এ কথার উত্তরে রূপার গম্ভীর মুখে একটু হাসি দেখা দিলে; সে বল্লে—"এত টাকা নিশ্চিন্ত মনে জলে দিতে পারা এমন কিছু বেশী নয়, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী সঞ্চয়-বিসর্জ্জন দেবার শক্তি যাদের বুকের মধ্যে সর্ব্বদা রাখ্‌তে হয়!"

এ কথার পর আনন্দকিশোরকে আবার চুপ কর্‌তে

হ'ল, এ কথার উত্তর নেই, আর থাক্‌লেও তা দিতে পারা অসম্ভব। তাই তিনি বল্লেন—"তুমি আমায় বলেছিলে তোমার কোন বিষয়ে কিছু বল্‌বার আমার অধিকার নেই, তাই আমি চন্দ্রাকে দানের সম্বন্ধেও তাই বলেছিলুম।"

আনন্দকিশোরের মুখের উপর জ্বল্-জ্বলে দৃষ্টিতে চেয়ে রূপা বল্লে—"তুমিও কি আমাকে তোমার বিষয়ে কথা কইবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করনি—?"

"আমি? কক্ষণো না!"

"তা যদি না হ'ত, তা হ'লে এত কথা উঠ্‌তোই না সেদিন—"

"সে তো তোমার যাওয়া নিয়ে।"

মাথা নেড়ে রূপা বল্লে—"না, তা নয়; আমি তোমায় বলেছিলুম বিয়ে কর্‌তে, তুমি আমার সে কথা গ্রাহ্যই কর্‌লে না—"

সে অনুরোধ আবার এড়িয়ে চলবার মৎলবেই আনন্দ-কিশোর বল্লেন—"কি জানি, ঠিক্ মনে পড়্‌ছে না।"

"তুমি বড় ভুলে যাও।"

"তা যাই, তোমার সাম্‌নে সব ভুল হ'য়ে যায়—"

"এবার আর ভুলের অবসর থাক্‌বে না তা হ'লে, —কারণ আমি কাল যাচ্ছি।"

ম্লান হাসি হেসে আনন্দকিশোর বল্লেন—"যাচ্ছ, সে তো ভালোই।"

"তা ভালো বই কি, তোমাদের আপদ ঘুচ্‌বে—"

—"এতে তো রাগের কিছু নেই, এতো আনন্দের বিষয়, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেকের পালা পড়েছে যখন—"

রূপার ধৈর্য্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়্‌ছিল, এবার সে বলে ফেল্লে, "ও সব ঠাট্টা গুলো রাখো ঠাকুর। সহ্যেরও একটা সীমা আছে।"

"আমি তো কোনো অন্যায় বলিনি, তুমি যে শুধু শুধু কেন রাগ কর্‌ছ তা জানি না—"

"তা জান্‌বে কেন, তা জান্‌লে আজ আমায় এই সন্ধ্যাবেলায় যমুনায় যেতে হ'ত না—"

নিরুপায়ভাবে রূপার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি বল্লেন, "আমি তো বল্‌ছি যে আমার দোষ হ'য়েছে, তাই শাস্তি চাচ্ছি—"

রূপার গলার স্বর অসম্ভব রকম কর্কশ শোনাল—সে ব'ল্লে—"যেখানে বিদায়েই শান্তি—সেখানে মৌখিক আত্মীয়তা দেখাবার চেষ্টা মিথ্যা আয়োজনই হ'য়ে যায়।"

অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি বল্লেন—"আমি কি করেছি যে আজ তুমি আমায় অমন করে ব্যথা দিচ্ছ!"

ভয় করবনারে, বিদায় বেদনারে
আপন সুধা দিয়ে ভ'রে দেব তারে
চোখের জলে সে যে নবীন রবে
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে
পরব বুকের হারে
নয়ন হ'তে তুমি আস্‌বে প্রাণে
মিল্‌বে তোমার বাণী আমার গানে
বিরহ-ব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে
এ মোর সাধনারে !

—বসন্ত

একটা নিঃশ্বাস ফেলে রূপা বল্লে, "আর ব্যথা দেবো না, কাল যাচ্ছি।" আনন্দকিশোর কোন উত্তর দিলেন না। একটু পরে রূপা আবার বল্লে, "আমি ভেবে পাই না, মানুষ কি করে একই মন নিয়ে প্রতিমা পূজো করে, আবার তা ভাসানও দেয়—আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে!"

আনন্দকিশোর হাস্‌লেন—"আবাহন আর বিসর্জ্জনের ভাবটুকু বুঝ্‌লে আর আশ্চর্য্যের বেশী কিছু থাকে না।"

রূপা জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বল্লে, "বুঝিয়ে দাও তবে—আমি তো বুঝিনে।"

"বোধন মানে—যখন আমরা তাঁকে ডাক্‌বার ইচ্ছা বোধ করি; তার পরেই কল্প বসে, কল্পনায় তাঁর যাওয়া-আসা চলে, তারপরে সঙ্কল্প, মানে—স্থিরভাবের দ্বারা নিত্য-বস্তুতে স্থিতি! তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর মহোৎসব!—মানে, উপলব্ধির অশেষ আনন্দ। তারপর বিসর্জ্জন বা নিরঞ্জন, এ দুটী কথার অর্থ একই। পূজোর শেষে বিসর্জ্জনের মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে, প্রতিমার চরণপদ্ম, কমণ্ডলুর জলে দর্পণ ফেলে দেখ্‌বার রীতি আছে—তার আসল অর্থ মৃণ্ময়ী প্রতিমা আরাধনা করে চিণ্ময়ী প্রতিমার দর্শন পাওয়ায় বাইরের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হ'লেন—আর হৃদয়-দর্পণে চিণ্ময়ী প্রতিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লেন! তাই বিসর্জ্জনের আর একটী নাম নিরঞ্জন—মানে, নিত্য আনন্দে ভাসমান্ অবস্থা—নিরঞ্জন তাই জন্যে ব্রহ্মের একটী নাম বা সংজ্ঞা! সাধক যখন বোধন আরম্ভ করেন তখন তাঁর সাধনার সূচনা, আর যখন বিসর্জ্জন দেন, তখন তিনি সিদ্ধ! তা হ'লে বুঝ্‌তেই পারছ, আবাহনের চেয়ে বিসর্জ্জনের পরে ভক্তির গভীরতা কত বেশী!" রূপা স্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌ছিল। আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—"বিসর্জ্জনের মধ্যে ভাল-বাসার যে অপরূপ তত্ত্ব নিহিত আছে, তা বোঝা আর বোঝান দুই-ই শক্ত। কিন্তু বড় চমৎকার এর ভাব—যা খুব প্রিয় তা অতিশয় প্রিয় বলেই বাইরের দিক্ দিয়ে তার বিসর্জ্জন করায় অন্তরে তার সত্ত্বা ঘনীভূত প্রেমের মধ্যে

পরিপূর্ণরূপে ফিরে পাওয়া! কিন্তু সেই বিসর্জ্জন দেওয়া যে কত কঠিন, আর কি অফুরন্ত কান্নায় ভরা তা জানিয়ে গেছেন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ত্রেতায় ও দ্বাপরে শ্রীরাধা ও সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে—এখনো পর্য্যন্ত তাঁদের সেই কান্নার গান আমাদের চোখের জলে বেঁচে রয়েছে, আর চিরদিন থাক্‌বেও!"

আনন্দকিশোর থাম্‌লেন—মনে হ'ল তাঁর চোখের কোণায় জল টল্-টল্ কর্‌ছে। রূপার এতক্ষণের জোর ক'রে ধ'রে রাখা রাগ ও বিরক্তি আর ধ'রে রাখা যাচ্ছিল না—সে তার এই কোমল হওয়া মনকে তাড়াতাড়ি আবার কড়িতে বেঁধে নেবার চেষ্টা করে ব'ল্লে, "তুমি এতও জানো—নিজে বুঝি এমনি করে পূজোটুজো করেছিলে?"

"না, তা আর কই হ'ল বলো? পূজোটুজো কিছুই তো হয় নি, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিসর্জ্জনের বাজ্‌নাই তো বেজে চলেছে!"

এ কথার উত্তর না দিয়ে রূপা বল্লে—"চন্দ্রা এখানে থাক্‌বে বল্‌ছে।"

আনন্দকিশোর মুখ তুলে বল্লেন, "কেন, কিছু তো দরকার নেই।"

"তার থাকাতে তোমার অনিচ্ছারও তো দরকার নেই, সে যদি তোমায় যত্ন কর্‌তে চায়, তাতেও তো তোমার আপত্তির নেই কিছু।"

আনন্দকিশোর স্পষ্ট বল্লেন, “যার কেউ নেই, তাকে নিজেকেই নিজে যত্ন কর্‌তে হয়—অপরের যত্নের দাবী করা তার উচিৎ নয়।”

রূপা বল্লে, “কেউ নেই যখন তখন কাউকে নিয়ে এসো, এক্‌লা তো আর চিরদিন চলে না।”

একটু হেসে আনন্দকিশোর উত্তর দিলেন—“দোক্‌লা না পেলে তাই চল্‌তে হবে বই কি!”

“পাওয়ার তো অভাব নেই—এখন নিলেই হয়—মণিয়াকে বিয়ে কর্‌তে তোমার যে কেন আপত্তি তাও বুঝি নে।”

আনন্দকিশোর তেমনিই স্থির স্বরে বল্লেন, “নেওয়ার মত মন তো নেই।”

বিরক্ত হ’য়ে রূপা বল্লে, “আমায় জ্বালাতন করা তোমার কেমন একটা অভ্যাস হ’য়ে দাঁড়িয়েছে!”

রূপার স্বরে অধীরতা যত বাড়্‌ছিল, আনন্দকিশোর ততই অত্যধিক ধীর হ’য়ে উঠ্‌ছিলেন। রূপার অধীরতা লক্ষ্য করে এবার তিনি খুব বেশী আস্তেই বল্লেন, “এতে আর জ্বালাতনের কি আছে রাণী?”

“খুব আছে।”

“তা সত্যি।”

রূপার মুখ লজ্জার আভায় আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে এবার বল্লে, “না, তোমার সঙ্গে পারা আমার সাত জন্মেও সাধ্যি নেই।”

"আমারই বরং তা বলা সাজে, তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা আমারই পক্ষে অসাধ্য।"

"কার সাধ্য আর কার অসাধ্য তা দেখ্‌তে হ'লে আমাকে আর একবার জলে নেমে দাঁড়াতে হয়।"

আদেশের সুরে তিনি শুধু বল্লেন—"না।"

"তুমি না বল্লে-ই হ'বে কি না!"

"লক্ষ্মীটি! ওসব ভেবো না আর!"

এবার রূপার দুই চোখ বেয়ে অজস্র অশ্রু ঝরে পড়্‌ল, যা সে অনেক চেষ্টাতেও প্রতিরোধ কর্‌তে পারলে না,—সে যতই দুঃখকে চেপে রাগ ও বিরক্তি দেখাতে যাচ্ছিল, ততই তার গলা কেঁপে দুঃখই বার হ'য়ে আস্‌তে চাইছিল—এবার সে কিছুতেই রাগের ভাণে দুঃখকে আর ঢাক্‌তে পার্‌লে না। তার চোখের জলে তার আঁচলখানা ভিজে উঠেছিল, একরাশ ঘন কালো পিঠভরা চুল এলোমেলো হাওয়ায় খানিক ধূলোয় ও খানিক তার কান্নাকাঁপা মুখে বুকে লুটোচ্ছিল—আনন্দকিশোর একান্ত অনুপায় হ'য়ে তার এই অবস্থা দেখ্‌ছিলেন। বাইরে শুধু ঘন অন্ধকার! প্রদীপের মৃদু আলোয় তাঁর শ্যামবর্ণ মুখখানাও যেন আরক্ত! ধূলায় ছড়ানো তার চুলের রাশ তিনি আসনের উপর সরিয়ে দিতেই রূপা চম্‌কে উঠে সরে ব'সে বল্লে—"ও থাক্‌—তুমি এখন যাও—অনেক রাত হ'ল!"

তাড়াতাড়ি সে ঘরের মধ্যে চ'লে গেলো। আনন্দ-

কিশোর আরো খানিকটা স্তব্ধ হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে পথে নাম্‌লেন।

মিলন মালার আজ বাঁধন তো টুট্‌বে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুট্‌বে,
উধাও মনের পাখা মেল্‌বি আয়!
অস্তগিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে,
কাল-বৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক্ তোর মরণ-বাঁচন্,
হাসি-কাঁদন পায়ে ঠেল্‌বি আয়!

—বসন্ত

ভবিষ্যৎ ভেবে দুর্গাবতী অরুণকে বল্লেন, "দেশে না গেলেই যে হবে না, তা তো নয়; এখানে থেকেই তো জমিদারীর হিসেব-পত্র দেখ্‌তে পারিস্। তা ছাড়া তাদের কাজের আদেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেই হ'ল—এখান থেকে যতটা সম্ভব ততটা।"

অরুণ একখানা নতুন ছবির বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছিল, মার কথায় সেটা রেখে দিয়ে বল্লে—"তোমায় তো আমি অনেকবার বলেছি মা, যে আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি যে ওই নীরস হিসেবের খাতা নিয়ে, আর প্রজাদের নালিশ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবো তা আমি পার্‌বো না—তবে আয়-ব্যয়ের হিসেবটা তারা পাঠালেই পারে।"

দুর্গাবতী মাথা নেড়ে বল্লেন, "পাঠিয়ে পাঠিয়ে তারা এলে গেছে, কেই বা দেখ্ছে, কেই বা কর্ছে! আম্‌লারা কি বলে জানিস্?"

"কি বলে?"

"বলে—চিঠি-পত্র একখানার উত্তরও পায় না—কাগজ-পত্র যা কিছু পাঠিয়েছে, তা ফেরৎও পায়নি, তার জবাবও পায়নি, কিছু না। সব গেলো রে সব গেলো! তার উপর কেবল তাদের কাছে টাকার জন্যে তাগিদ্ পাঠাস্, টাকা পাঠাবার জন্যে কেবল ধার আর বন্ধক এই চল্‌ছে! সরকারী খাজনা তো এবার ধারেই দিতে হবে, নয় তো জমীদারী বন্ধক থাক্‌বে—তোর কি সে সব হুঁস্ আছে?"

অরুণ বিরক্ত হ'য়ে বল্লে—"যেমন করে হ'ক্ চ'লে যাবে ঠিক্, তা নিয়ে তুমি আমায় আর বিরক্ত করো না মা! আমি তো স্পষ্টই বল্‌ছি, আমাকে যেন তারা চিঠি-পত্র না লেখে, হিসেব-পত্র দেখা আমার দ্বারা পোষাবে না। সরকারী খাজনা যেমন ক'রে হ'ক্ তাদেরই দেওয়া চাই।"

দুর্গাবতী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "তুই কি পাগল হয়েছিস্? তাদের দায় বেশী না তোর? তুই নিজে একেবারে দেখ্‌বিনে শুন্‌বিনে অথচ অনবরত টাকা চেয়ে পাঠাবি, আবার খাজ্‌না দেবার সময়ও তাদের উপর জুলুম কর্‌বি, এগুলো যে তোর অন্যায় অরুণ!"

"অন্যায় বই কি! আমার ছবি আঁকা জাহান্নামে যাক্,

আমি ঐ সব কাঁদুনি শুনে, অঙ্ক ক'ষে আর আম্‌লাদের ভীষণ চিঠিগুলো হজম ক'রে দিন কাটাই আর কি! সেই ভয়ে জমীদারীর চিঠি এলেই আমি তা না খুলেই 'ওয়েষ্ট্‌ পেপার' বাস্‌কেটে ফেলে দি!"

ছেলের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব বুঝে দুর্গাবতী আর কিছু বল্লেন না। একটু পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বল্লেন—"তা ছবি-টবিই বা কই আঁকিস্‌ আজ কাল! তাও তো কই আঁক্‌তে দেখিনে?"

মার এই কথায় অরুণ এবার সত্যিই রেগে গেলো, অন্য কেউ হ'লে এর জবাব যে কেমন ক'রে দিত, তা অরুণের মনে মনেই রইল। কিন্তু মাকে সে অন্ততঃপক্ষে একটু-আধটু ভক্তি যে না কর্‌ত তা নয়; তাই সে রাগটা যথাসম্ভব দাবিয়ে রেখে বল্লে, "এই তো ক'দিন একটু ভালো আছি, এর মধ্যে আর কত ছবি হবে? ছবির বিষয় কিছু জান না, বোঝ না, ওবিষয় বল্‌তে এসো না—ছবি কি আঁক্‌লেই হ'ল, মনে আস্‌বে তবে তো আঁক্‌বো!"

দুর্গাবতী আর কিছু ব'ল্লেন না, শুধু উপরে গিয়ে ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করে আঁচলে চোখ মুছ্‌লেন।

শাসনের অভাবে, শিক্ষার বৈপরীত্যে, অরুণের যথেচ্ছাচার যে কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা মনে মনে বুঝ্‌লেও লোকের কাছে বা বধূর কাছে তা তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন নি!

অরুণের প্রতিভা মনুষ্যত্বের অভাবে দিন দিন অন্তর্হিত হচ্ছিল—সূর্য্য তো আছেন, কিন্তু মেঘ না সর্‌লে তাঁকে দেখ্‌বার উপায় নেই। মনের যে সকল মহৎ ভাব ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুভূতি অন্তরের বিশুদ্ধতায় প্রেমে ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তারই বুকের সহস্রদলে প্রতিভার স্বর্ণ-বীণা বীণাপাণির বরে গান সুরু করে। কিন্তু হৃদয়হীনতার পুরু পর্দ্দায় সে মন্দির দিন দিন যতই গাঢ়তর আচ্ছাদনে ঢাকা প'ড়তে থাকে, প্রতিভাও ততই লুকিয়ে পড়ে; কবিত্ব ভয় পায় সেদিকে চাইতে। হৃদয় দিয়ে যে বিশ্বের হৃদয় বোঝে না—কলা-লক্ষ্মীর চরণ-কমল তার হৃদয়ে নূপুর বাজিয়ে অপূর্ব্ব নাচ নাচে না। রূপার ছবি দেখে রূপাকে নিয়ে আসার জন্যে যে করুণা ও বেদনা অরুণের মনে জেগেছিল, রূপা এসে পৌঁছুবামাত্র তার দিকে চেয়ে সে ভাব অরুণের মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেলো। অরুণ ভেবেছিল—রূপা তেমনিই আছে। কিন্তু রূপার নিটোল স্বাস্থ্য, লাবণ্যভরা সুন্দর চেহারা অরুণের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি কর্‌লে—সে এখানে অসুখে ভুগে আর্থিক ভাবনায় অস্থির হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে, আর ও তো সেখানে খুব সুখেই ছিল, নইলে কি আর এমনি সুন্দর চেহারা হয়! এই রকম চিন্তায় অরুণের সমস্ত মন রূপার উপর বিতৃষ্ণায় বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো, এমনি মনের অবস্থা নিয়ে রূপার প্রতি কাজে অকাজে সে তীরাক্ষী মেজাজে প্রতিবাদ সুরু কর্‌লে।

এমনিই তার ভাগ্য! একদিন রূপহীনতার জন্যে তাকে তাড়িত হ'তে হয়েছিল, আজ আবার সু-রূপের জন্যে তার অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনা! সে যে কোন রকম হবে, আর কোনটা কর্‌বে, তা ভেবে ঠিক্ করা তার পক্ষে চির দুষ্কর হয়ে পড়্‌ছিল!

বৃন্দাবন থেকে রূপা যখন সেদিন পৌঁছল তখন অরুণ ভাত খাচ্ছে, দুর্গাবতী তাকে সাম্‌নে ব'সে খাওয়াচ্ছিলেন। রূপা এসে তাঁদের প্রণাম ক'রে দাঁড়ালে কিন্তু কারো কাছ থেকে সে একটুও সাড়া পেলে না। অরুণ স্বচ্ছন্দ মনে খেয়েই চলেছিল, দুর্গাবতী বেদানা ও আঙ্গুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রূপার সমস্ত মুখটা লজ্জায় ও ব্যথায় শুকিয়ে যেন কালী হ'য়ে গিয়েছিল—তবে তাঁরা তাকে ডেকে আন্‌লেন কেন? এই রকম আচরণ করার জন্যেই কি তাকে নিয়ে এলেন? অনেকক্ষণ পরে দুর্গাবতী চোখ তুলে চাইলেন ও ব'ল্লেন, "দেখ্‌ছো তো অরুণকে, কি হ'য়ে গেছে? কি ক'রেই এতদিন এমন ক'রে রইলে? আমি যদি না আস্‌তুম কে দেখ্‌তো ওকে?"

রূপার কোন দিনই শাশুড়ীর কথায় কথা কওয়া অভ্যাস নেই, সে অভ্যাস মত চুপ্ ক'রে রইল। অরুণের খাওয়া হ'য়ে গেলে দুর্গাবতী সে ঘর থেকে চ'লে গেলেন। রূপার কুণ্ঠিত ব্যথিত মুখখানার দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে,—"কি, এবার সখ্ মিট্‌লো?"

রূপা ভয়ে ভয়ে বল্লে,—"তুমি আমায় যেতে বলেছিলে তাই গিয়েছিলুম, সখের জন্যে তো যাই নি।"

অরুণ মুখটা আরো গম্ভীর করে বল্লে, "আচ্ছা, এখন তুমি নিজের ঘরে যাও—" রূপা নিঃশব্দে নিজের পরিত্যক্ত ঘরখানায় এসে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌ল! আবার সেই ঘর। কয়েদখানার সঙ্গে যে কি প্রভেদ তা সে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। এই বান্ধবহীন পুরীতে, কেবল তিরস্কার আর লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে জীবন কাটাতে হবে—এই নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ নিষ্ফল জীবন সহ্য কর্‌বার শক্তি ঈশ্বর তাকে দিন। তাঁর দয়ায় সে নিশ্চয়ই কাটাতে পার্‌বে, তিনি তাকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দিন্—নীরবে দুঃখ অপমান বহন কর্‌তে।

তার পরে এমনি অনাদর ও বেদনার বোঝা ব'য়ে আরো মাস কতক কেটে গেলো। এই ক'মাসে রূপা এত রোগা ও বিশ্রী হ'য়ে গেছে যে তাকে চেনা শক্ত। তবু সে শুক্‌নো মুখে হাসির আভাস লেগেই থাকে, বিরক্তি কখন কেউ দেখ্‌তে পায় না। দুর্গাবতীর শরীর খারাপ, এদানী তাঁর অল্প অল্প জ্বর হয়। এখানেও অরুণের অনেক দোকানে ভারী ভারী দেনা হয়ে গেছে—আর জমীদারীতেও তাই, দশ বার টাকার জন্যে তাগাদা করলে একবার আসে। দুর্গাবতী ছেলের দোষ ঢেকে নিয়ে বৌকে বলেন—"সে তো আর অরুণের দোষ নয়, মকর্দ্দমার জন্যেই সব গেলো। অবস্থা খারাপ হ'য়েছে বলেই আজকাল বুঝে সুজে চলা।"

সেদিন মাইনে না পেয়ে বামুন আসে নি ; খালি একটী ছেলে চাকর, সেই বাজার করে এনে উনুন্ ধরিয়ে দিলে। এই রকম প্রায়ই হয়। রূপাই রান্না-বান্না করে, সমস্ত কাজ সেরে ফেলে। সেদিনও তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকে রূপা আগে অরুণের খাবার তৈরী কর্‌তে ব্যস্ত ছিল। খাবার যখন আগুনে তৈরী হ'চ্ছে তখন সে অন্য [illegible]কারীগুলো ঠিক্ করে নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে খাবার পুড়ে গিয়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌লো—রূপা হাতের তরকারী [illegible] ছুটে এলো! সে এ সব বিষয়ে একেই অনভ্যস্ত, তার উপর আগুন জ্বলে ওঠাতে স্বামী ও শাশুড়ীর বিরক্তির ভয়ে তার পা হাতগুলো ভয়ে ভাবনায় থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। এই রকম অসাবধানতার দরুণ একদিন গরম দুধের বাটী হাত থেকে প'ড়ে গিয়েছিল, একদিন চাবি হারিয়েছিল, আর একদিন রান্না খারাপ হয়েছিল ; তার প্রতিফলে সে সব দিন যা যা শাস্তি হয়েছিল, তা যে তার খুব ভাল করেই মনে আছে! সেই রকম সব অজস্র ঘটনা উপর্য্যুপরি রোজই তো ঘট্‌ছে, তবু আজ যে সেই রকমই একটা রাগারাগি বকাবকি এক্ষণি হবে, সেই আশঙ্কায় রূপার হাত পা যেন বরফের মত হিম হয়ে গিয়েছিল। আগুনের লক্‌লকে শিখায় ঘরখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে দেখে দুর্গাবতী চীৎকার ক'রে উপর থেকে বল্লেন, "ওমা, একি কাণ্ড! বৌমা, পুড়ে গেলে নাকি? কি মেয়ে বাপু! গলা থেকে আওয়াজ কি

বেরোয় না! তাই কাউকে ডেকে আগুন নেভাতে বলো! যদি পুড়ে যেতে!” ততক্ষণে চাকর এসে আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছে। রূপা কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শাশুড়ীর কথা শুনে তার মনে হ’ল, সে যদি পুড়ে যেতো, তা হ’লে তো বেঁচেই যেতো; কিন্তু সে সুখ তার অদৃষ্টে এত শীঘ্র নেই।

দুর্গাবতী ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন, রূপার স্তম্ভিত মূর্ত্তির দিকে তিনি বল্লেন—“কাঠের পুতুলের মত নিঃসাড় হ’য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তো আর পেট ভর্‌বে না; নাও, এখন হাত পা নেড়ে চট্‌পট্‌ অরুণের খাবারটা গুছিয়ে ফেলো—সে খেতে আস্‌ছে; তার স্নান অনেকক্ষণ হ’য়ে গেছে।” ভয়ে রূপার গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না, অনেক কষ্টে সে বল্লে, “কি খাবার দেবো—সব তো পুড়ে গেছে!”

রাগে জ্বলে উঠে দুর্গাবতী বল্লেন, “তা হ’লে উপোস ক’রে ছেলে কাজে যাবে। একে তো পয়সা কড়ির অভাব, তাও যদি এমন ক’রে নষ্ট কর্‌বে তা হ’লে যে শেষে ভিক্ষে কর্‌তে হবে—তুমি সরো বাপু, আমি এক মিনিটে রান্না করে দিচ্ছি।”

রূপা মিনতি করে বল্লে, “আমিই করি—আপনি বসুন্‌!”

বিরক্ত হ’য়ে দুর্গাবতী বল্লেন, “না, তোমার কর্‌তে হবে না, তোমার কাজের রকম দেখ্‌লে আমার বিরক্ত লাগে।”

গোলমাল শুনে অরুণ সেখানে এসে প'ড়্‌ল, রূপা তাড়াতাড়ি আসন পেতে খাবার জায়গা কর্‌তে উঠে গেলো।

মাকে রাঁধ্‌তে দেখে অরুণ বল্লে, "তুমি যে আজ রাঁধ্‌ছ মা ? নবাব-নন্দিনীর বুঝি আজ এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি ?"

দুর্গাবতী বল্লেন, "ঘুম ভেঙ্গেছে !"

অরুণ বল্লে, "তবে তুমি এ সব কর্‌ছ যে ?"

দুর্গাবতী বল্লেন, "না কর্‌লে পোড়া খাবার খেয়ে কি কাজে যেতিস্‌ ?"

"খাবার বুঝি পুড়িয়ে ফেলেছে ?" বলেই অরুণ রূপার দিকে চাইলে। রূপা তখন বাটী আর গেলাস নিয়ে মাজ্‌তে বসেছিল। তার দিকে অরুণ চাইতেই ভয়ে সে মাথার কাপড়টা আরো একটু বাড়িয়ে দিলে। অরুণ তাকে শুনিয়ে চিৎকার করেই বল্লে, "এমন অকেজো স্ত্রী নিয়ে সংসার চলে কখন ? খাওয়া হ'ল না, অথচ পয়সাগুলো জলে গেলো। বিপিন-টিপিন্‌ রমেশ-টমেশের স্ত্রীরা কিন্তু ঠিক্‌ কুলিয়ে নিয়ে সংসার চালাচ্ছে। ঐ তো অবস্থা, আর অত বড় সংসার। আর কমলের স্ত্রীকে যেমন কাজ কর্‌তে হয় না, তেমনি সে শ্বশুরের পয়সায় বড় মানুষ হ'য়ে গেলো, তার আর কাজ করার দরকারই বা কি ! আমার ভাগ্যেই শুধু এম্‌নি জুটেছে ; না পেলুম পয়সা-কড়ি, না হ'ল তেমন কাজুন্তি স্ত্রী !"

ছেলের এতগুলো উত্তপ্ত কথা ও আগুনের উত্তাপ দুর্গাবতীর মেজাজ আরো গরম করে তুল্লে। তিনি বধূর দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে অরুণকে শুনিয়ে বল্লেন—"এ মোটা চাল অরুণ খাবে কেমন করে? এতক্ষণে দশবার বাজার থেকে চাল আনা হ'য়ে যেতো—একটু যদি বুদ্ধি-শুদ্ধি হ'ল তোমার বৌমা। এতক্ষণ কোন্ চাকরটাকে পাঠিয়ে দিলে? তুমি খেতে পারো বলে কি অরুণ তাই খেতে পারে। তোমরা বাছা কিছুই বোঝ না। বনেদী-ঘরের খাওয়া-দাওয়া; তা বুঝ্বেই বা কেমন ক'রে, নিজে তো ঐ ব্যবসাদারের মেয়ে—দু'পয়সা ক'রেছিল তাই, নইলে কাপড়ওলার মেয়ে বই তো না।"

রূপার চোখ ছাপিয়ে জল আস্ছিল, তবু সে তাকে অনেক কষ্টে চেপে নিয়ে ব'ল্লে—"পয়সা তো আমার কাছে নেই, আপনি দিলে চাল আন্তে দিতুম—আপনি বল্লেন, 'ওতেই হবে, তাই—"

তাকে থামিয়ে অরুণ আবার চেঁচিয়ে বলে উঠ্লো, "তুমিই তো মা জোর ক'রে আমায় ছোটলোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে। এখন তার ধাক্কা সাম্‌লাও। আজ যদি বড় মানুষ শ্বশুর থাক্‌তো, তা হ'লে কি আমায় চাক্‌রীর জন্যে ছুটোছুটী করতে হ'ত, না কাল কি খাবো ভাব্‌তে হ'ত? এখন ভোগ, যেমন কাজ তেমনি ফল।"

রূপা চুপ্ ক'রে শুনে যাচ্ছিল। তার বাবাকে ছোটলোক

বলা হ'ল তাও সে শুন্‌লে, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করা তার অভ্যাস নয়, তাই সে মুখ খুল্‌তে পার্‌লে না।

দুর্গাবতী ছেলের কথার উত্তরে বল্লেন, "দয়া ক'রেই ওকে বৌ কর্‌লুম, কিন্তু তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লে কই? অভ্যাস না থাক্‌লেও দু'দিনেই মানুষ শিখে নেয়, কিন্তু এ যেন কোন চেষ্টাই নেই! এই দ্যাখো না বাসন মাজ্‌তে বসেছে, তা যেন বাসনের গায়ে হাত বুলোচ্ছে। ওতে কি বাসন ঝক্‌মক্‌ করে কখন!"

শাশুড়ীর কথায় রূপা জোরে জোরে বাসন মাজ্‌তে লাগ্‌লো,—কিন্তু তার হাতের নরম চাম্‌ড়া কাঁকর কয়লার ঘায়ে কেটে গিয়ে রক্ত ঝর্‌তে লাগ্‌লো। সে সেটা জান্‌তে দিলে না, হাত ধুয়ে, বাসন ধুয়ে, গেলাসে অরুণের জন্য জল গড়িয়ে রাখ্‌লে। অরুণের বকুনি তখনো থামেনি। সে তখন বল্‌ছিল—"মা-টাও তেমনি কৃপণের একশেষ—এক পয়সা দিয়ে গেলো না,—যেমন নীচমনা বাপ-মা তেমনিই তো তার মেয়ে হবে—" যে বাবা মা মারা গেছেন, তাঁদের নামে প্রতিদিন ক্রমাগত নিন্দে শুনে শুনে রূপার ধৈর্য্য যেন ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়্‌বার মত হ'চ্ছিল—তাকে ধ'রে মার্‌লেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু, তাঁদের নিন্দা আর সহ্য হ'চ্ছিল না। খুব নরম সুরেই সে বল্লে—"বাবা মা তো কোন দোষ করেন নি, তাঁদের কেন এর ভিতর টেনে আন্‌ছো। আমি দোষ করেছি আমায় বলো—"

চোখ রাঙিয়ে অরুণ বলে উঠ্‌লো—"বেশ কর্‌ব, বল্‌ব ; মুখের উপর কথা কওয়া ! দিন দিন আস্পর্দ্ধা বাড়্‌ছে ?" ইতিমধ্যে দুর্গাবতী খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে আসনের সাম্‌নে রাখলেন, ভাতের থালা নামিয়েই তাঁর চোখ পড়্‌ল—গেলাসের দিকে। "এ কি ! কি ভয়ানক ! খাবার জলের গেলাসে রক্ত কেন ? না, তোমার হাতে খাবার-দাবার দিয়ে আর বিশ্বাস নেই, ছেলেকে আমার পোকা মাকড় সাপ বিছে কখন কি খেতে দেবে—তার ঠিক্‌ কি ? এই এক গেলাস্‌ জল গড়িয়ে দিতে পার না গা ?" ছাইএর মত ফ্যাকাসে মুখখানা তুলে রূপা বল্লে—"কেন, কি হয়েছে ? খুব ঘষে-ভালো ক'রে গেলাস মেজেছি তো ?

দুর্গাবতী বল্লেন—"মেজেছ বই কি। আমার মাথা আর মুণ্ডু করেছ। দেখো দিকিনি এটা কি ? রক্ত কোথা থেকে এলো ?"

অরুণের তখন মাথার ঠিক্‌ নেই, এত রাগ হয়েছে। সে কট্‌মট্‌ ক'রে রূপার দিকে চেয়েছিল। রূপা আস্তে আস্তে কাটা হাতটা দেখিয়ে বল্লে—"বাসন মাজ্‌তে গিয়ে কেটে গেছে, আমি জল গড়াবার সময় দেখ্‌তে পাইনি।"

আক্রোশ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল, এবার গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অরুণ তার পরিসমাপ্তি কর্‌লে। গেলাসের ঘা লেগে রূপার হাতের কাঁচের চুড়ী ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ হ'য়ে গেলো, আর তারই একটা টুক্‌রো কাটা জায়গায় লেগে

ধরা রক্ত আবার ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়্‌ল। তার বড্ড লেগেছিল, তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো "উঃ।" অরুণ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বল্লে—"একটু লাগা-টাগা ভালো, ওগুলো অভ্যাস করো। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া স্ত্রী নিয়ে কাব্যি রচনা হয় কিন্তু সংসার চলে না।" অরুণকে উঠে যেতে দেখে দুর্গাবতী বল্লেন—"না খেয়ে যাচ্ছিস্ কোথা?"

"খেয়ে আর কাজ নেই, যে লোকের এমন স্ত্রী, তার ভাগ্যে খাওয়া জোটাই আশ্চর্য্য।"

জোর ক'রে ছেলেকে ফের আসনে বসিয়ে তিনি বধূর দিকে চেয়ে তীব্র স্বরে বল্লেন—"তুমি এখন সাম্‌নে থেকে যাও দিকিন্! ওকে ঠাণ্ডা হ'য়ে খেতে দাও, তোমার দিকে চাইলে আগুন হ'য়ে ওঠে, তার খাবে কোথা থেকে।" রূপা তবুও দাঁড়িয়ে ছিল, তার স্বামী এবার বল্লে, "নড়্‌ছ না যে? তোমার এখানে থাক্‌বার কিছু দরকার নেই, আমার সেবা ক'রে তো তুমি উল্‌টে যাচ্ছ।"

রূপা আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে এলো। কাটা হাতটা তখন দপ্‌দপ্ করছে, মাথাও ভয়ানক ধ'রেছে! —এ রকম ঘটনা তো রোজই হচ্ছে, এ তো কিছু নতুন নয়, তবে আর এ নিয়ে কেন সে বিচলিত হবে? রোজ যে জিনিষটা ঘট্‌ছে, সেটা তাকে সহনীয় ক'রে নিতে হবে বই কি। মেঝেয় শুয়ে পড়ে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে

চোখ বুজ্‌লে, তার চোখের দুই কোণ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়্‌ল। সকাল থেকে সে কিছু খায়নি—তার খাবার কথা কেউ বলে না তো! এ রকম তো তার প্রায়ই হ'চ্ছে; এতেই বা অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? ক্ষিধে তেষ্টা সবই সহ্য ক'রে নিতে হবে। দুপুরের প্রখর রৌদ্রের দিকে চেয়ে সে ভাব্‌লে—তার এ উপবাসের সুযোগ মিলেছে ভালোই—এত দুঃখেও তার শুখ্‌নো ঠোঁট দু'খানিতে একটুখানি হাসির আভাস খেলে গেলো।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী !
মুখর নুপূর বাজিছে সুদূর আকাশে
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী !
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-যামিনী
অকুল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি
একটী ভক্ত করিছে নিত্য আরতি
নাহি কাল দেশ তুমি অনিমেস মূরতি
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর বাসিনী !

—চয়নিকা

আনন্দকিশোর তাঁর কুটীরে ব'সে প্রদীপের স্তিমিত আলোয় একখানা পুঁথি প'ড়ছিলেন। কি মনে ক'রে পুঁথিখানা বন্ধ ক'রে খোলা জানালার সাম্‌নে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন; ফির্‌তেই রূপার ছবির দিকে চোখ

প'ড়্ল—মনে হ'ল ছবির ভিতর থেকে জীবন্ত রূপা যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আস্ছে, তাড়াতাড়ি তিনি চোখ বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। গাছের কচি কচি সবুজ পাতায় জ্যোৎস্নার তরল রূপালী মাখা, যমুনার সুনীল জলের ফেণাভরা ঢেউএর মালা, চাঁদের কিরণে হীরে মণির মত ঝক্-মক্ ক'রে আলো ঠিক্‌রে দিচ্ছিল। চারিদিক্ শান্ত, নীরব—আরতির বাজনা অনেকক্ষণ হ'ল থেমে গেছে! ঘুমন্ত তীর্থপুরীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে ভোরের আলো ভেবে দু'একটা কোকিল পঞ্চমে সুরের ঢেউ তুল্‌ছিল। মাঝে মাঝে খোল-করতালের আওয়াজ ও কীর্ত্তনের পদ শোনা যাচ্ছিল; তাও ক্রমশঃ থেমে এলো। একরাশ ফুলফোটা 'ব্রজমল্লি' ও বন্য যুঁইএর ঝাড় কুঞ্জের একধারে যেন মায়াপুরীর মায়া-কন্যার মত মানুষীর রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল।

আনন্দকিশোর ভাব্‌ছিলেন—রূপার বিস্মৃতিময় মনটীর কথা! নিশ্চয়ই সে তাঁদের এতদিনে একেবারেই ভুলে গেছে! এই যে বৎসর ঘুরে গেলো সে গিয়েছে, কিন্তু দু'লাইন চিঠি লিখেও খোঁজ নেবার অবসর হয়নি তার। তাঁকে লেখার কথা হ'চ্ছে না; চন্দ্রাকে, মণিয়াকে এদের তো সে ইচ্ছে কর্‌লেই লিখ্‌তে পার্‌তো। যে চন্দ্রাবলী তার অসময়ে অতটা ক'রেছে তাকেও যে একেবারে ভুলে ব'সে আছে, এইটাই আশ্চর্য্য! তাঁরা কেমন আছেন

তা বোধ হয় তার জান্‌তে ইচ্ছে করে না, তাই সে খবর না নিয়ে থাক্‌তে পারে; কিন্তু তাঁরা তো তা পারেন না। তাই প্রায়ই তাঁদের খবর নিতে হয়। তাকে লিখে কোনো উত্তর না পাওয়ায়, চন্দ্রা এবার বাণীকে লিখেছিল। বাণী উত্তরে লিখেছে—রূপার শাশুড়ী-মারা গেছেন, রূপার শরীরও ভালো নেই। রূপাকে চন্দ্রার চিঠির কথা বলায় সে বলেছে—চন্দ্রার কোন চিঠিই সে পায়নি। বাণীর চিঠি শুনে আনন্দকিশোর চন্দ্রাকে বল্লেন—"রূপার শরীর ভালো নেই লিখেছে? তার মানে?"

চন্দ্রা আঁচলে চোখের জল লুকিয়ে বলে গেলো—"মানে আর কি! অযত্ন কর্‌লে কেমন ক'রে শরীর ভালো থাক্‌বে?

আনন্দকিশোর ভাব্‌লেন,—তাই তো, কি অন্যায়! যদি দেখা হ'বার উপায় থাক্‌তো, তা হ'লে তিনি তাকে এর জন্যে খুব বক্‌তেন। কিন্তু তাকে কিছু বল্‌তে গেলে সেই যে তাঁকে আগে থেকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ে—যেন সবই তাঁর দোষ! সত্যি, এই মেয়েটীর সঙ্গে কিছুতেই তিনি পেরে উঠ্‌বেন না দেখ্‌ছি! অথচ এই না পেরে ওঠাটাই সমস্ত মন দিয়ে আস্বাদ কর্‌তে ভালো লাগে যে! হার্‌তে না পেলে সুখ নেই, তবুও পলে পলে যুদ্ধ-ঘোষণার আয়োজন! যেন সাধ ক'রে হারাই সে যুদ্ধের লক্ষ্য! এই সীমাময়ী তরুণীর অসীম

রূপ নিত্য নিত্য সকাল-সাঁঝে, গভীর রাতে, জড় ও জীব-জগতের নিত্য হৃদ্-স্পন্দনে কত বিচিত্রতায়, কত অনন্ততায় যে ফুটে উঠ্‌ছে, তার কে কিনারা করে? তার ওড়্‌না আকাশের মেঘে মেঘে উড়ে বেড়ায়, নক্ষত্রের চুম্‌কি তার আঁচলায় চর্চ্চিত, তার গতির ভঙ্গি বাতাসের ঢেউএ, নদীর ছল্‌-ছলে, লতাপাতার হেলাদোলায় খেলে যায়। চাঁপার বাস-ভরা তার এলো চুল, ঘন মেঘে, আঁধার রাতে, গহন বনে, ছোঁয়া দিয়ে মাতাল করে যে!

"প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে
আছে সে নয়ন তারায়,
আলোক ধারায়, তাই না হারায়
ওগো তাই দেখি তাই যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক্ পানে!"

গান যখন তাঁর শেষ হ'ল, তখন তাঁর মনে হ'ল—খুব শীত ক'রছে, গায়ের ভিতর মাঝে মাঝে এমনি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল! শেষ বসন্তের হাওয়ার কি শীত করে কখন? তবে আজ কেন এমন বোধ হ'চ্ছে তাঁর? ঘরে ঢুকে একটা মোটা কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে আনন্দকিশোর শুয়ে প'ড়্‌লেন—মনে হ'ল তাঁর জ্বর হ'য়েছে! সে রাত্রে তাঁর আর হুঁস্ তো হ'লই না, সকালেও নড়া-চড়ার কোনরূপ লক্ষণ পাওয়া গেলো না। অনেক বেলায় তাঁকে

আশ্রমে যেতে না দেখে চন্দ্রা তাঁর কুটীরে এসে দেখ্‌লে—তিনি তখনো বিছানায় প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন। কাক কোকিল ডাকবার আগে যিনি শয্যা ত্যাগ ক'রে স্তব স্তোত্র পাঠে আশ্রম আনন্দময় ক'রে তোলেন, পূজা-হোমের পবিত্র সুরভি অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর কুটীর সুবাস-ধূমে আচ্ছন্ন করে, সেই মানুষ এখনো ঘুমুচ্ছেন। চন্দ্রা খানিকটা অবাক্ হ'য়ে তাঁর শ্রান্ত, ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর কাছে গিয়ে ডাক্‌লে—"কেমন আছেন? কি হ'য়েছে?" তবু উত্তর নেই, চার পাঁচবার ডাক্‌তে ডাক্‌তে আনন্দকিশোর একটু পাশ ফের্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেন, কিন্তু শক্তিতে কুলালো না।—সর্ব্বাঙ্গ অবশ, অক্ষম। চন্দ্রা ভয় পেয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"কি হ'য়েছে আপনার? উঠ্‌তে পার্‌ছেন না কেন? অনেক বেলা হ'ল যে!"

আনন্দকিশোর কথা কইতে চেষ্টা ক'র্‌লেন কিন্তু পার্‌লেন না, একটু পরে অতি কষ্টে ব'ল্লেন—"অক্ষম—চন্দ্রা!"

"একেবারে কি নড়্‌তে পার্‌ছেন না?"

"না, সব অবশ!"

চন্দ্রা কেঁদে ফেল্লে। আকস্মিক এই দুঃখের ধাক্কায় তার বুকের নিয়মিত স্পন্দন যেন বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল। তার ছেলেকে হারিয়ে অবধি আনন্দকিশোরের মুখ চেয়েই সে যে বেঁচে আছে! পুত্রস্নেহের শূন্য স্থানটী দিনে দিনে কেমন ক'রে যে তিনি পূর্ণ ক'রে তুলেছেন, তা

শুধু চন্দ্রার মাতৃত্বই জেনেছে যে! মেঘ-ছাওয়া আসন্ন বর্ষার আকাশের মত বিষাদ-ভরা মুখ খানা তুলে চন্দ্রা বল্লে—"তা হ'লে আমি মণিয়াকে ব'লে আসি তার বাবাকে মথুরায় টেলিগ্রাম ক'র্‌তে। খবর পেলেই শেঠ্‌জী এক্ষুণি ভালো ডাক্তার নিয়ে আস্‌বেন।" আনন্দকিশোরের ব্যথা-জীর্ণ মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেলো। তিনি বল্লেন —"ডাক্তারের অসাধ্য! আমার মা তারকেশ্বরে মানৎ ক'রে সারিয়েছিলেন; আজ মাও নেই, রোগও সার্‌বার নয়।"

"তা কি হয়! সার্‌বে না ব'লে ব'সে থাক্‌লে তো হবে না।" হাত জোড় ক'রে আনন্দকিশোর বল্লেন— "শেঠ্‌জীকে খবর দেবার বা ডাক্তার আন্‌বার কিছু দরকার নেই, আমার শেষ দিনগুলি নিরিবিলিতে তাঁরই ধ্যানে কাটাতে দাও; আমি হাত জোড় ক'রে মিনতি ক'র্‌ছি।" অগত্যা চন্দ্রাকে চুপ্‌ ক'র্‌তে হ'ল। না হ'ল ডাক্তার ডাকা, না হ'ল সেবার বন্দোবস্ত করা। যদি এম্‌নি বিনা চিকিৎসায় কিছু একটা হ'য়ে যায়, তখন কত বড় আপ্‌শোষই চিরদিন মনের ভিতর থেকে যাবে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চন্দ্রার দুই গাল বেয়ে আবার অশ্রু ঝ'রে প'ড়্‌ল। চন্দ্রার কান্না থাম্‌ছে না দেখে এবার আনন্দকিশোর ব'ল্লেন—"তুমি যখন এত অস্থির হচ্ছ, তখন শেঠ্‌জীকে খবর দাও—ডাক্তার নিয়ে আসুন্‌।"

কিন্তু ডাক্তার নিয়ে আসার মত পেয়েও চন্দ্রার কান্না

থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—“কেঁদ না! মানুষ তো চিরদিন থাকে না, একদিন যেতেই হয়।” চন্দ্রা চোখ মুছে উঠে গেলো, খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লে—“শেঠ্‌জীকে খবর দেওয়া হয়েছে, কল্‌কাতাতেও খবর দিয়েছি।”

কল্‌কাতার নামে আনন্দকিশোর একটু চম্‌কানো ভাবে চোখ তুল্লেন কিন্তু কিছু বল্লেন না। তিনি বুঝ্‌তে পারেন নি ভেবে চন্দ্রা আবার বল্লে—“রূপাকেও আপনার অসুখের খবর জানিয়েছি।”

“ভালোই!” এর পর আনন্দকিশোর অনেকক্ষণের জন্য আর চোখ চান্ নি, তাঁকে ব্যস্ত করা হ’বে ভেবে চন্দ্রাও কোন কথা কয়নি। সন্ধ্যার দিকে চন্দ্রা এসে দেখ্‌লে—সেই এক ভাবেই তিনি শুয়ে আছেন। সে বল্লে—“এতক্ষণ এক ভাবে থাকৃতে কষ্ট হচ্ছে না?”

আনন্দকিশোর বল্লেন—“কষ্ট হচ্ছে বই কি! সে দুঃখ থেকে দুঃখতারণ নারায়ণ যতক্ষণ না উদ্ধার ক’র্‌বেন, ততক্ষণ সহ্য ক’র্‌তে হ’বে! তবে আমার বিশ্বাস, আর বেশী দিন তিনি এ কষ্ট সহ্য করাবেন না আমায়!”

চন্দ্রা বল্লে—“আপনার মত ভালো লোকের বেশী আর কম কিসের। এমন অসুখ হয় কেন? এই কি ভগবানের বিচার!”

"ভগবানের বিচারের কথা আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝ্‌বো। তবে তাঁর বিচার নিশ্চয়ই সুবিচার।"

"সুবিচার যদি তবে এত বড় একটা মহৎ প্রাণে তিনি ব্যথা দেন কেন? নিজের সুখের জন্যে তো কিছুই করেন নি, পরের জন্যেই যে সারা জীবনটা দান কর্‌লেন।"

"দান আর করা হ'ল কই? জীবনেই যে মৃত, সে আর জীবন দান কর্‌বে কোথা থেকে বলো? বরং দেওয়ার চেয়ে নেওয়াই চলেছে বেশী।"

চন্দ্রা বল্লে—"তা যা চলেছে তা এ সহরের কারো বুঝ্‌তে বাকী নেই আর। তাই মড়া ঘেঁটে, রোগ সেবা করে, নিজের খাবার অপরকে খাইয়ে ঘুরে বেড়ান্‌। আপনি বল্লে তো হবে না। লোকের মুখে তো ঢাকা দিতে পার্‌বেন না, লোকের মুখেই ভগবান্‌ কথা কন্‌। এখানকার সব লোক আপনাকে দেবতার চেয়েও বড় জানে।"

আনন্দকিশোরের ব্যথিত মুখে একটু যেন বিষাদের হাসি দেখা গেলো। আস্তে আস্তে চন্দ্রার হাতখানি হাতে নিয়ে বল্লেন—"যারা নিজে বড়, তারা অপরকেও বড় দেখে। আর যদিও এদের কিছু দিয়েও থাকি, কিন্তু চন্দ্রা! আমি যে একদিক থেকে অনেক নিয়েছি—অনেক—অনেক—! সে যে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বেশী! আমি যে পূর্ণর চেয়ে শূণ্যই কর্‌লুম বেশী, তাই বল্‌ছিলুম—দেওয়ার চেয়ে আমার নেওয়াই বেশী হ'য়ে যাচ্ছে।"

উত্তেজনায় আনন্দকিশোর হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তিনি চোখ বুঁজ্‌লেন। চন্দ্রা এর আগে কখনও এঁকে এমন বিচলিত হ'তে দেখেনি, চিরদিনই দেখে আস্‌ছে—স্থির, ধীর, প্রশান্ত! আজ অসুখের মুহূর্ত্তে তাঁর এই দুর্ব্বলতায় তাঁর নিত্য-স্বভাবের ব্যতিক্রম হ'তে দেখে সে আশ্চর্য্য হ'ল—দুঃখিত হ'ল! অসুখের সময় কথা কওয়া উচিৎ নয় ভেবে সে চুপ করে রইল।

তার পরদিন বেলা প্রায় ১২টার পর প্রখর রৌদ্রে তেতে পুড়ে মথুরার উদারপ্রাণ ধনী শেঠ্‌জী যখন আনন্দকিশোরের পাশে এসে বসে প'ড়্‌লেন, তখন ব্যথাতুর আনন্দকিশোরের আধ-চেতন মনটাও শেঠ্‌জীর অকৃত্রিম স্নেহদয়ার নমুনা পেয়ে যেন সচেতন হয়ে উঠ্‌লো! পূর্ব্ব অভ্যাস মত সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবার জন্যে আনন্দকিশোর তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আজ যে তিনি অপারক! অবশ শরীর, এতটুকুও নড়াবার ক্ষমতা নেই যে! তাঁর এই উদ্যমে বাধা দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে শেঠ্‌জী বল্লেন—"থাক্‌, থাক্‌, একেবারেই যে তোমার নড়্‌বার ক্ষমতা নেই আনন্দ! তুমি একটুও উঠ্‌তে চেষ্টা করো না।"

"এতদূর কষ্ট ক'রে এসেছেন, আমি কি বল্‌ব! কথা কইবারও শক্তি যেন ফুরিয়ে আস্‌ছে!" আনন্দকিশোরের চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়্‌ল। তাঁর অবস্থা দেখে ধার্ম্মিক শেঠ্‌জীর পরদুঃখকাতর মন ব্যথিত

হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে তিনি বল্লেন—"কিছু ভয় নেই, দু'জন ডাক্তার কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছেন, খুব ভালো চিকিৎসা করেন; দু'দিনেই সারিয়ে দেবেন। আপাততঃ এখানকার একজন ডাক্তার এখনি আস্‌বেন। মণিয়া কোথায়? সে সেবা কর্‌ছে না?"

পিতার কথার উত্তরে মণিয়া এসে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালে। শেঠ্‌জী আবার বল্লেন—"সেবা কর্! দু'দিনে সারিয়ে তোলা চাই! আনন্দকিশোরের দয়াতেই এমন পবিত্র আশ্রমের শিক্ষা ও কাজ পেয়েছিস্, এটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিস্! ভগবানের দয়া মানুষের হৃদয় দিয়েই ঝরে পড়ে, সে দয়ার উপর ভক্তি যেন চিরদিন থাকে।" মণিয়া পিতার উপদেশ হেঁটমুখে শুন্‌ছিল। আনন্দকিশোরও শুন্‌লেন—কিন্তু এসব কথার উত্তর দেবার মত সামর্থ্য আজ তাঁর ছিল না। তাঁর চোখের ভাবে শেঠ্‌জী বুঝ্‌লেন আবেগে ও ভাবে বুক ভ'রে উঠ্‌লেও তাকে ভাষায় প্রকাশ করার মত শক্তি আজ আনন্দের নেই। এই মৌন ব্যথা-কাতর রুগ্নের দিকে চেয়ে শেঠ্‌জীর সমস্ত অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে ভ'রে উঠ্‌লো—এই তরুণ বৈষ্ণব কেন যে এমন দারুণ যন্ত্রণা পেয়ে অকালে প্রাণ হারাতে বসেছে, তা কেউ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না; আর এই অকাল অনুচিত যাত্রার জন্য দায়ী বিধাতা পুরুষকেও কেউ ক্ষমা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না!

*　　*　　*　　*　　*

মণিয়া ও চন্দ্রার অশেষ যত্নে, সেবার সুবন্দোবস্তে, তা ছাড়া শেঠ্জীর উদারতায় চিকিৎসার কোন ত্রুটী ছিল না। বৈত্যুতিক চিকিৎসার প্রয়োগে এক মাসের মধ্যেই আনন্দ-কিশোর সুস্থ হ'য়ে উঠ্লেন। আরো কিছুদিন বাদে অল্প অল্প চল্‌তে ফির্‌তেও পার্‌ছিলেন, তবে যা, দুর্ব্বলতা তখনো সম্পূর্ণ যায় নি। অসুখ হ'য়ে মানুষের অসুখ সেরে গেলো কিন্তু রূপার কাছ থেকে চিঠির উত্তর এলো না। আনন্দ-কিশোর ভাব্‌লেন—এত বড় একটা অসুখেও খবর নেবার দরকার বোধ করে নি বোধ হয় সে! একটা প্রগাঢ় অভিমান তাঁর সারা হৃদয় ছেয়ে তাঁকে সে সম্বন্ধে একেবারে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক করে দিয়েছিল, তাই এদানী রূপার নাম তাঁর মুখ থেকে ভ্রমেও শোনা যেত না; তার চিঠি আসা না আসা সম্বন্ধেও তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন! এই টুকুই তাঁর এই নীরবতার মধ্যে দিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ পেতো। কিন্তু অন্তরের কাছে তো ফাঁকি দেওয়া চলে না, তাই রূপার খবর জান্‌বার অতটা প্রবল ইচ্ছা জোর ক'রে দমন ক'রে রাখা তাঁর দুর্ব্বল শরীরে বড় সহজ ছিল না; কিন্তু ব্যথায় রক্তাক্ত হ'লেও কাঁটাভরা ফুলের ডাল তিনি বুক পেতেই রেখে দিলেন, তাকে সরাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। দেখা না গেলেও, চন্দ্রার পক্ষে আর চুপ ক'রে থাকা সইছিল না। এতদিন মনে আস্‌তো

কিন্তু মুখে বল্‌তে তারও বেধে যেতো, কিন্তু আজ সে আর চুপ ক'রে থাকৃতে পারলে না। তখন আনন্দকিশোর সন্ধ্যার উপাসনা সেরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন—চন্দ্রা তাঁকে খাইয়ে নিজের কুটীরে ফিরে যাচ্ছিল, দরজার কাছে গিয়ে আবার সে তাঁর শয্যার কাছে এগিয়ে এলো। আনন্দ-কিশোর তাকে আবার ফির্‌তে দেখে বল্লেন—"কি চন্দ্রা ?"

—"না, কিছু না, শুধু—বল্‌ছিলাম আজও তো কই রূপার কোন চিঠি-পত্র এলো না, টেলিগ্রাম বোধ হয় তাঁর হাতে পড়ে নি তা হ'লে।"

আনন্দকিশোর কোন উত্তর দিলেন না; শুধু একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজ্‌লেন। চোখ বুজ্‌লেন যখন, তখন তো আর কথা কওয়া চলে না; নির্ব্বাক আনন্দকিশোরের দিকে আর একবাব চেয়ে দেখে চন্দ্রা যেন বড় অপরাধীর মতই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পথে চল্‌তে চল্‌তে, বাড়ী পৌঁছে, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সমস্তক্ষণই চন্দ্রার মনে হ'তে লাগ্‌লো, রূপা তো এমন ছিল না, দয়া-মায়া সহানুভূতি সবই কি সে এই কিছু দিনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে! পরিচিতের প্রতি পরিচিতের যে কর্ত্তব্য, সেটুকুও কি তার বুদ্ধিতে জোগাল না? তার যে রূপার বন্ধুত্ব বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল, আজ যে সব যেতে বসেছে!

৩৭

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়
(আমি) তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে
ভালবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায় !

—অরূপরতন

সেদিনের সেই ঘটনার পর আরো কতকগুলো ঐ রকম অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেছে, যাতে ক'রে নির্দ্দোষ রূপার শাস্তির অন্ত ছিল না। তার কিছুদিন পর অরুণের মা মারা গেলেন। মার মৃত্যুর পর থেকে অরুণ আরো কঠিন হ'য়ে উঠেছিল—রাত্তিরে বাড়ী আস্‌তে প্রায়ই তার ১টা ২টা বাজ্‌তো। এধারে পয়সা-কড়ির অভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। সেদিন সকালে অরুণ এসে বল্লে, "মাইনের টাকাতে কুলোনো দায় !"

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রূপা বল্লে, "প্রসাদপুর থেকে কি এদানী একেবারেই টাকা আস্‌ছে না ?"

"তোমার মত অবুঝ যদি দুনিয়ায় দুটী আছে। তাই যদি আস্‌বে, তবে এ অবস্থা হবে কেন ?"

হতাশভাবে রূপা বল্লে—"তবে কি হবে ?"

বিরক্ত হ'য়ে অরুণ বল্লে—"হবে আর কি ! কল্‌কাতার বাইরে গেলে ভালো চাকরী পাওয়া যায় !"

"তাই যাবে ?"

"যাবে না আরো কিছু ! সেখানে না আছে ক্লাব, না আছে থিয়েটার, না আছে কিছু। ও রকম সব জায়গায় আমার পোষায় না—তার চেয়ে একেবারেই দেশ ছেড়ে যাওয়া ভালো।"

ভয়ে ভয়ে রূপা বল্লে—"সেটা কিন্তু ঠিক্ না !"

উদ্ধত স্বরে অরুণ ব'লে গেলো—"ঠিক্ অ-ঠিক্ সে আমি বুঝ্‌বো, তোমার লেক্‌চার শুন্‌তে আমি আসিনি এখানে।"

অনর্থক কলহের ভয়ে রূপা আর কোন কথা কইলে না। খানিকটা পরে অরুণ খেয়ে দেয়ে কাজে বেরিয়ে গেলে রূপাও কাজ-কর্ম্ম সেরে ঘরে এসে ব'স্‌লো। ব'স্‌লেই কিন্তু যত রাজ্যের চিন্তা এসে মনটা তোলপাড় ক'র্‌তে থাকে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। বিশেষতঃ, কিছু দিন ধ'রে মনটা তার এমনি উদাস হ'য়ে রয়েছে যে, কিছুতেই তাকে ধরা ছোঁওয়া যাচ্ছে না। বাণী সেদিন তাকে বল্‌ছিল—চন্দ্রা তাকে চিঠি লিখেছে, কিন্তু কই ? সে চিঠি তো সে পায়নি। সে চায়ও না চন্দ্রাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে আর। যাঁর কৃপায় সে এত পেয়েছে, তাঁকেও সে কিছুই দিতে চায় না তার বদলে। তবুও ধ্যান-

ধারণা ও উপলব্ধির অশেষ আনন্দে তার শূন্য জীবন যখন পরিপূর্ণ আনন্দে টলমল্ ক'র্‌তে থাকে, তখন তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি আপনিই যে আনন্দকিশোরের উদ্দেশে ঝ'রে পড়ে! কিন্তু তখনি সে জোর ক'রে আবার মনকে ফিরিয়ে নেয়—ভাবে, এ রকম আর হ'তে দেবে না। তিনি তাকে যত বড় দানই দিয়ে থাকুন, তার বদলে সে তাঁকে এক কণাও দিতে অপারক! কিন্তু প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যা জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে, তাকে সে কেমন ক'রে বাদ দেবে? তাই দিয়েই যে তার এতদিনের সাধনা তৈরী হ'য়ে উঠ্‌লো। অনেক চেষ্টা করেছে সে তা ক'র্‌তে।—তবু সে পারেনি। যে ঋণ শোধ করা তার পক্ষে অসাধ্য, এমন দান কেন যে সে নিতে গেলো? সে তো নিতে চায়নি, তিনিই তো নিজে থেকে তাকে দিয়েছেন! সে তো তখন জান্‌তো না যে, কতখানি, আর কি দান সে নিচ্ছে! জান্‌লে সে যে কিছুতেই নিতো না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রূপা উঠে দাঁড়ালে। এ ঘর, ওঘর, সে ঘর, ঘুরে ঘুরে, খানিকটা বাগানে, খানিকটা ছাদে পায়চারি ক'রে আবার সে তার শূন্য ঘরে ফিরে এলো। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার কাপড় প'রে সে উপাসনায় ব'স্‌লে। কিন্তু উপাসনাতেও আজ তার মন ব'স্‌ছে না যে! আসন ছেড়ে সে উঠে প'ড়্‌লো। এই

নিঃসঙ্গ জীবন দিন দিন তার পক্ষে দুর্ব্বহ হ'য়ে প'ড়্‌ছিল। সঙ্গীর মধ্যে ছিল শুধু স্মৃতি, যাকে মুছে ফেল্‌বার শত প্রয়াস কেবল ব্যর্থ হ'য়েই চলেছিল। আবার সে ঘুরে ফিরে অরুণের ব'স্‌বার ঘরে এলো। সেখানে বাজ্‌না ছিল। সে বাজিয়ে গাইতে চেষ্টা ক'র্‌লে কিন্তু পার্‌লে না—বাজ্‌না ছেড়ে সে উঠে প'ড়্‌লো। ঘরের আর এক পাশে আর একটা বাজ্‌না ছিল। এ ধারে ওধারে অনেক গুলো চেয়ার, মধ্যে একটা গোল টেবিলে খান-কতক বই, কতকগুলো মাসিক পত্র, খবরের কাগজ ও চিঠি-পত্র ছড়ান ছিল। সেই গুলো নাড়া-চাড়া ক'র্‌তে গিয়ে এক খানা হল্‌দে খাম চোখে প'ড়্‌ল! হাতে তুলে নিয়ে সে দেখ্‌লে—সেটা একখানা অখোলা টেলিগ্রাম! খামের উপর লেখা রয়েছে—তারই নাম! তার নামে টেলিগ্রাম এসেছে অথচ সে পায়নি। তা না পাক্, অরুণ নিজেও তো খুলে দেখ্‌তে পার্‌তেন? নিজেও খোলেননি —তা হ'লে বোধ হয় তাঁর চোখেই পড়েনি! খামটা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে তার হাতটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো। না জানি কি দুঃসংবাদ আছে!

টেলিগ্রাম প'ড়ে সে মাটীতেই ব'সে প'ড়্‌ল—দুই মাস আগের খবর!—দুই মাস আগে আনন্দকিশোরের অসুস্থতার খবর নিয়ে মণিয়ার কাছ থেকে এই টেলিগ্রাম এসেছে!

এতদিনে তিনি কেমন আছেন তার ঠিক্ কি? হয়

তো বা এতদিনে অসুখ খুব বেড়েছে—হয় তো বা—।
রূপার মাথাটা ঘুরে গেলো, তার পায়ের নীচের সমস্ত মাটী
যেন সরে স'রে নেমে যাচ্ছিল, কড়িকাঠগুলো যেন
আকাশে ওঠা-নামা ক'র্ছিল—তারপরে সমস্ত অন্ধকার
হ'য়ে এলো—কেবল—অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার! সেই
অন্ধকারের অতল তলে সেও যেন তলিয়ে গেলো!! ... ..
......একটু বাদে যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন সে আস্তে
আস্তে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে মাটীতেই
ব'সে প'ড়্ল। ঠিক্ পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির, নিশ্চল হ'য়ে
সে যে কতক্ষণ বসে রইলো, তা বোধ হয় তার ঠিক্ ছিল না।
তার চোখে একটুও জল ছিল না—কান্না তার বুকের ভিতর
জমা ছিল কি না, জানা গেলো না; কিন্তু বাইরে কোথাও
তার চিহ্ন পাওয়া গেলো না। তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ
দুটো আঁধার-ঘন বাগানের তালশালের ভিতর স্থির দৃষ্টিতে
চেয়েছিল—সেই অকাঁপা উজ্জ্বল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে মাঝে
মাঝে যেন আগুনের চমক্ দিচ্ছিল।

বড় ঘড়ীতে রাত দশটা বেজে গেলো, রূপার কাণে সে
আওয়াজও গেলো না। তার একটু পরেই দরজায় সজোরে
ধাক্কা দিয়ে অরুণ চেঁচিয়ে বল্লে—"ঘুমটুম আজ ভাঙ্গবে? না,
আমাকে উপোসেই কাটাতে হবে!" অরুণের গলা কাণে
যেতেই রূপার চমক্ ভাঙ্গলো, সে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা
খুলে দিয়ে বল্লে—"এত শিগ্গির তুমি ফির্বে তা তো জান্তুম

না, রোজ অনেক রাত হয় কি না।" তার শুখ্‌নো সাদা মুখখানার দিকে চেয়ে অরুণ একটু চম্‌কে গেলো কিন্তু তার দয়া হ'ল না, সে বিরক্ত হ'য়েই বল্লে—"এখনি যে আমায় আবার বেরোতে হ'বে, সে হুঁস্‌ আছে ?"

রূপা নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্লে—"তা এখনি খাবার নিয়ে আস্‌ছি, সব তৈরী আছে।" সে তাড়াতাড়ি খাবার গুছিয়ে এনে অরুণের সাম্‌নে ধ'রে দিলে। অরুণ এক মনে খেয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে অনেক ভেবে চিন্তে অনেকবার ইতস্ততঃ ক'রে রূপা ব'লে ফেল্লে—"কোন চিঠি এসেছে কি ?"

তার স্বামী এতক্ষণে রাঙ্গা চোখ তুলে তার দিকে চাইলে ও বল্লে—"তার মানে ?"

রূপা আরো একটু সাহস ক'রে বল্লে—"বাণী সেদিন ব'ল্‌ছিল—চন্দ্রা আমায় লিখেছে, তা আমি কই পাইনি তো, তাই ব'ল্‌ছিলুম।"

"তার মানে, আমি তোমার চিঠিগুলো চুরি ক'রেছি, এই তো ?"

"না, না, তা তো ব'ল্‌ছি না, যদি ভুলে গিয়ে কোথাও রেখে থাকো—"

"নিশ্চয় ব'ল্‌ছ, একশ'বার ব'ল্‌ছ—"

আসন ছেড়ে অরুণ উঠে গেলো, একটু পরে তার মোটর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। স্বামীর এই আচরণ

সহ্য ক'রে ক'রে রূপার একরকম অভ্যেস হ'য়ে এসেছিল, —কি রাত্তির, কি দিন, কথা কইলেই অরুণের মেজাজ আজকাল অমনিতর হ'য়ে ওঠে। নিতান্ত শ্রান্ত দেহটা কোনো মতে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে রূপা গিয়ে বিছানার আশ্রয় নিলে। ক্ষিধেও নেই, তেষ্টাও নেই; আর তাকে কেউ খেতে বল্‌বারও লোক নেই; সব দিকেই তার একাদশ বৃহস্পতি কি না! সেই না-জাগা, না-ঘুম অবস্থায়, গভীর রাতের নিবিড় ছোঁয়ায়, স্মৃতির উচ্ছ্বাসে, তার দুই চোখ ভ'রে ভ'রে জলধারা নেমে এসে তার এতক্ষণের দাহ-তপ্ত বুকখানা যেন জুড়িয়ে দিলে!

* * * * *

তার পর দিন সকালে চা নিয়ে রূপা যখন তার স্বামীর সাম্‌নে গেলো, তখন অরুণ চরকায় সূতা কাট্‌ছে। খানিকটা অবাক্ হ'য়ে স্বামীর এই নতুন কাজের দিকে সে চেয়ে রইল কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে তার সাহস হ'ল না। চায়ের ট্রে-টা সাম্‌নে রাখ্‌তেই অরুণ স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে ব'স্‌লো। রূপা বুঝ্‌লে—আবার ঝড় আস্‌ছে! কিন্তু যে ঝড় প্রতিদিন হাজার বার তাকে সহ্য ক'র্‌তে হ'চ্ছে, তাকে ভয় ক'র্‌লেই বা চ'ল্‌বে কেন আর! সে বল্লে—"চা খাও—"

অরুণ তার উত্তর না দিয়ে চাকরকে ডেকে বল্লে—রূপাকে ব'ল্‌তে এ চা সে খাবে না চাকরকে দিয়ে তার

কথার জবাব দেওয়াতে রূপার বড় কষ্ট হ'ল—সে কিন্তু তা জান্‌তে দিলে না। সে ফের বল্লে—"যেদিন আমি করি, সেদিন বলো—চাকর কেন করেনি; আবার যেদিন চাকর করে, সেদিন আমি করিনি ব'লে খাও না। তুমি যে কি চাও, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।"

রূপার এই স্পষ্ট কথায় অরুণ ভয়ঙ্কর রেগে উঠ্‌লো, অথচ সে পণ ক'রেছে রূপার সঙ্গে কথা কইবে না; কাজেই রূপাকে কিছু ব'ল্‌তে না পেরে ভয়ে থতমত চাকরটার দিকে সে কট্ মট্ ক'রে চেয়ে বল্লে—"তোকে কি বল্লুম? হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বল্লুম? যা ব'ল্‌ছি আমার সাম্‌নে থেকে! যত সব বাঁদর এসে জুটেছে কেবল জ্বালাতন ক'র্‌তে!"

চাকরটা একে নতুন, তার উপর এই ব্যাপারে সে যেন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, এবার সে ঘর থেকে পালাতে পেরে যেন বাঁচ্‌লো! অরুণ আবার মুখ ফিরিয়ে চরকা নিয়ে ব'স্‌লে। আজ যে কতক্ষণ এই ব্যাপার চল্‌বে, আর কোথায় গিয়ে এই মিথ্যা মনোবিবাদের ফল দাঁড়াবে, তা রূপা ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না। তবে যেদিন যেদিন এমনি হ'য়েছে, সে সব দিনগুলো এখনো তার চোখের সাম্‌নে জ্বল্ জ্বল্ ক'র্‌ছে! কিছুই তো পুরোণো হয়নি, আবার সে বল্লে "খাবে না?" অরুণ ক্রমাগত চরকা ঘোরাতে লাগ্‌লো, কোনো উত্তর দিলে না। একটু পরে রূপা আবার বল্লে—

"কি দোষ হ'য়েছে, তা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, যদি তা হ'য়ে থাকে, মাপ করো; করে খাও—"

চরকা ছেড়ে অরুণ এবার চিৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "দিনরাত প'ড়ে প'ড়ে শুধু ঘুমোবে—আর আমি এধারে খেটে খেটে মরি!"

"ঘুমোই কখন আর। সমস্ত কাজ তো আমাকেই ক'র্‌তে হয়।"

"ওঃ! ভারী তো কাজ! এবার রাত জেগে ব'সে চরকা কাট্‌তে হবে।"

"বেশ, তাই হবে, এখন তুমি খাও আগে।"

"ওঃ! আমার খাবার কথা ভেবে তো তুমি উল্টে যাচ্ছ! আমার খাওয়া হ'ক্ না হ'ক্, আমি মরি কি বাচি, তোমার সে কথা ভাব্‌বার কিছু দরকার নেই।"

"তবে খাবে না?"

"যা অপরিষ্কার ক'রে ক'রেছ, ও জিনিষ আবার মানুষ-মুখে দেয়—তোমার বাপ মা খালি কাপড় বেচ্‌তেই জান্‌তো, যদি একটু বুদ্ধি ছিল আর! নইলে মেয়েটাকে এমনি পশু করে বানিয়ে গেছে!"

এবার রূপা আর কোন কথা কইতে পার্‌লে না। সে কাঠের মত আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। অরুণ তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"ওসব রাগ টাগ চ'ল্‌বে না আমার কাছে। স্ত্রীকে সায়েস্তা ক'র্‌তে আমি জানি—"

"রূপার সমস্ত মুখ ভয়ে ও ব্যথায় যেন কালী হ'য়ে গিয়েছিল—একে সে সেই রাত থেকে আর এখন অবধি কিছু খায়নি, তার উপর এই লাঞ্ছনায় তার শরীরের সমস্ত শিরাগুলো যেন থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছিল। এই অনাহার ও ঝগড়া যে কতক্ষণ চ'ল্‌বে তার কূলকিনারা না পেয়ে সে হতাশ হ'য়ে তার ব্যথা-মলিন মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যাবার জোগাড় ক'রছিল! এমন সময় এক ঝলক্ সোণালী আলোর মত তাকে সমস্ত ভাবনা উদ্বেগ থেকে রেহাই দিয়ে বাণী সেই ঘরে ঢুক্‌লো। রূপা জান্‌তো এবার অরুণকে খেতেই হ'বে। তাই হ'ল। বাণীকে দেখ্‌বামাত্র অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বল্লে—"এই যে আসুন্।" তারপরে নিজেই চা তৈরী ক'র্‌তে ক'র্‌তে রূপাকে বল্লে—"আরো ছ'টো পেয়ালা আন্‌তে বলো—সবাই এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।"

• রূপার কালী-পড়া চোখমুখের দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে বাণী বল্লে—"এ কি চেহারা হয়েছে ভাই, তোমার? কোনো অসুখ করেছে না কি?"

অসুখ করেছে কি করেনি রূপা তা কিছুই বল্লে না, শুধু মুখ নীচু ক'রে একটু শুখ্‌নো হাসি হাস্‌লে। অরুণই কথার উত্তর দিলে—"অসুখ ক'র্‌বে না! দিনরাত চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে!"

বাণী বল্লে—"চোখ বন্ধ ক'রে কিছু মিল্‌বে না ভাই

—রবিবাবুর সেই গানটা জান তো—"নয় কো শুধু আপন মনে, নয় কো বনে নয় বিজনে" আর একটা গানে "চক্ষু বুজে ক'র্‌ব না ধ্যান, খুঁজ্‌বো না জ্ঞান গো খুঁজ্‌বো না জ্ঞান।"

বাণীর এত কথার উত্তরে রূপা কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌লে না। তার বড় লজ্জা করে, এসব কথার উত্তর দিতে! আর উত্তর দেবেই বা কি সে! সে তো কিছু জানে না, অত বুদ্ধি তার নেই। চোখ যখন আপনি বুজে আসে, তখন কি তাকে খোলা যায় যে সে খুল্‌বে! এ সব কথা কেমন ক'রে সে বোঝাবে? নিজে যে না বুঝেছে, তাকে তো বোঝানো যাবে না! সে শুধু বল্লে—"দিনরাত চোখ বুজে তো থাকি না, ছু'এক মিনিট খালি যা একটু আধটু।" তার এই অসমাপ্ত অস্পষ্ট কথা শুনে বাণী তো হেসেই অস্থির, হাসি শেষ ক'রে সে বল্লে—"আমি কাল তারকেশ্বরে যাচ্ছি, আমার ছেলের জন্য মানসিক আছে। তাই তোমাদের একবার ব'ল্‌তে এলুম!"

রূপার মনে দপ্‌ ক'রে একটা আশার আলো জ্বলে উঠ্‌লো—সেও যদি যেতে পায়। তা কি তার ভাগ্যে হ'বে? তার নীরব ঔৎসুক্য যেন কতকটা বুঝ্‌তে পেরেই বাণী বল্লে—"তোমারও তো শরীর খারাপ, চলো না দিন কতক ঘুরে আস্‌বে। ঠাকুর-দেবতা দেখলে মনটাও ভালো হবে'খুনি—"

এর উত্তরে রূপা কিছু বল্লে না, শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাইলে,—তিনি যদি অনুমতি করেন, তবেই তো তার যাওয়া সম্ভব! কি ভেবে নিয়ে একটু পরে বাণীর দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে—"তা বেশ তো, আপনি নিয়ে যান্ না—"

বাণী একটু হেসে বল্লে—"আপনি সত্যিই ব'ল্‌ছেন? তা যদি বলেন, আমি খুব রাজী আছি।"

"বেশ তো, যাক্ না; আমার কোন আপত্তি নেই।" ইতস্ততঃ ক'রে রূপা বল্লে—"তা কি হয়, সে কি করে হ'বে। আমার যাওয়া হ'বে না।"

অরুণ আবার বল্লে—"খুব হ'বে—না হ'বার কোন কারণ নেই—"

বাণী আনন্দে রূপার হাত দু'খানা চেপে ধরে বল্লে—"যখন যেতে বলেছেন, তখন তোমায় যেতেই হবে ভাই; না গেলে কিছুতেই তো আমি ছাড়্‌বো না—বলো যাবে?"

সজল চোখে রূপা বল্লে—"আচ্ছা যাবো—"

আজ নিশি শেষে শেষ ক'রে দিই
চোখের জলের পালা
অভিমানের বদলে আজ
নেবো তোমার মালা

—অরূপরতন

তারকেশ্বরে পৌঁছে পূজো দিয়ে বাসায় ফিরে আসার সময় রূপা বল্লে—সে বাসায় ফির্‌বে না, মন্দিরের কোনো এক কোণে আঁচল পেতে শোবার জায়গা ক'রে নেবে। বাণী বল্লে—"সে সব হ'বে না, চলো বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আবার সন্ধ্যায় আরতির আগে আস্‌বে'খুনি।"

রূপা বল্লে—"তুমি হাজার বার বল্লেও আমি যাবো না, কেন তুমি মিথ্যা ব'ল্‌বে!"

বন্ধুর দিকে অবাক্ হ'য়ে খানিকটা চেয়ে থেকে বাণী বল্লে—"এমন জান্‌লে তোমায় নিয়ে আস্‌তুম না ভাই! যদি কিছু একটা অসুখ-বিসুখ হ'য়ে যায়, তখন যে আমাকেই দায়ী হ'তে হ'বে।"

রূপা বল্লে—"কেন অত ভাব্‌ছো বাণী, আমার অবস্থা তোমার তো অগোচর নেই। আমি ম'র্‌লে বা বাঁচ্‌লে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, তাই দায়ীত্বের ভাবনা থাকৃতে পারে না।"

রূপার এই জেদ্ দেখে বাণীকে একলাই ফির্‌তে হ'ল।

বাণীর অনুরোধ, মাটীর কাঠিন্য, উপবাসের কষ্ট, রৌদ্রের তাত, কিছুই তার সাধনাকে টলাতে পার্‌লে না। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ ঝড় উঠ্‌লো, ঝড়ের দোলায় গাছপালা গুলো সব মড়্‌ মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে প'ড়্‌বার মত হ'ল, শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে ধূলার রাশ আবীরের গুঁড়োর মত রূপার চোখ-মুখ ভরিয়ে দিলে। একটু পরেই ঝম্‌-ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি নেমে এলো। বৃষ্টি ধ'রে গেলে বাণীর দাসী দু'চার বার উঁকি-ঝুঁকি মেরে গেলো—যদি রূপা উঠে ; কিন্তু ওঠা তো দূরের কথা, রূপা কোন লক্ষ্যই নিলে না। দাসী চটিতে ফিরে গিয়ে বাণীকে বল্লে—"তাঁর নড়ন-চড়ন নেই—জলে ভেসে গেছে, তার মধ্যে প'ড়ে আছেন।"

ভিজে কাপড়ে থাকা কখন অভ্যাস নেই, ভোরের দিকে রূপার ভয়ানক শীত ক'র্‌তে লাগ্‌লো ; কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য—একান্ত চিন্তার ঝোঁকে শীত-গ্রীষ্ম সবই ভুলে গেলো ; রইল শুধু তার ছোট্ট সুন্দর দেহখানি—এক রাশ সাদা ফুলের মত—মন্দিরের দুয়ারে।

একবেলা, দুইবেলা, তিনবেলাও যায় যায় ; কিন্তু সে তো এখনো কিছু পেলে না। তাঁর মা পেয়েছিলেন মায়ের গৌরবেই—সে তো আর তা নয়। তবে কি তার এ কাজে অধিকার নেই ? তাই কি তার প্রার্থনা এখনো সফল হ'চ্ছে না ? হে ভগবন্‌! যেখানে সব দাবী কেটে গেছে, দায়ীত্ব যেখানে বিন্দুমাত্র উঁকি মার্‌তে পারে না, সেখানেই

কি নিঃশেষে নিজেকে শূন্য কর্‌বার আয়োজন! বিধির বিধানে বোধ করি এর জন্য অমোঘ দণ্ড নির্দ্ধারিত হ'য়ে আছে! কিন্তু দণ্ড-পুরস্কারের কথা ভাবা তার অভ্যাস নয়; ঈশ্বর শুধু তার প্রার্থনা সফল করুন। এমনি ভাবে রূপার সে সন্ধ্যাও কাট্‌লো, রাতও প্রায় কাবার হ'য়ে এলো। তখন ভোর রাত্রি, অন্ধকার তখনো দূর হয়নি, রাস্তায় আলো জ্বল্‌ছে—মনে হ'চ্ছে যেন তখনো দু'এক প্রহর রাত আছে। স্বপ্ন দেখে রূপার ঘুম ভেঙ্গে গেলো—এলোমেলো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সে শুধু এই টুকুই বুঝেছিল যে, তিনি ভালো আছেন। তা যখন আছেন, তখন সে উঠে এবার বাসায় যাবে, এই ভেবে যেমনি সে উঠে দাঁড়াতে যাবে, আর তার মাথাটা ঘুরে পা যেন ট'লে গেলো। তার দুর্ব্বল শরীরে একটুও জোর ছিল না। সে তখনি প'ড়ে যেতো, যদি না কার একখানা উদ্যত হাত তার হাত দু'খানা ধ'রে ফেলে তার ট'লে পড়া দেহটাকে তখনি সাম্‌লে নিত!......

রূপা প্রথমটা ভাব্‌লে—সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে! তারপরে মনে হ'ল—তার প্রার্থনা বুঝি এতই ঐকান্তিক হ'য়েছে, তাই প্রার্থনার চেয়েও বেশী রূপ ধ'রে দেখা দিলে!

আনন্দকিশোরের সবল হাত থেকে সে যখন নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে পার্‌লে না, তখন তার বিশ্বাস হ'ল যে, বাস্তবিকই তিনি তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে!—স্বপ্নে নয়, চিন্তায় নয়, কল্পনায়ও নয়! ক্ষিধে-তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে

গিয়েছিল, সে তাই অনেক কষ্টে বল্লে—"আমি ঠিক্ যেতে পার্‌বো, হাত ছাড়ো।"

আনন্দকিশোর তবুও বল্লেন—"দেখ্‌ছো না, এখনো কত অন্ধকার। আমাকেই দেখে দেখে চ'ল্‌তে হ'চ্ছে, তার উপর পিছ্‌ল—"

প্রতিবাদ কর্‌বার মত শক্তি আজ রূপার ছিল না। সে শুধু তার শ্রান্ত চোখ দু'টি তুলে আনন্দকিশোরের দিকে চাইলে—কোথা থেকে যেন গুলাল্ কুঙ্কুমের ছড়া এসে তাঁদের মুখ-চোখ রাঙিয়ে দিয়ে গেল···· ·················!

তখনো ভোর হয়নি, আকাশে দু'একটী তারা তখনো ফু'টে, মৃদুল বাতাস্ বেল-যূঁইএর গন্ধে ভরা ছিল! দেবালয়ের ওপাশ থেকে ফুটন্ত রজনীগন্ধা মুখ তুলে দেখ্‌লে।

আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না

ভালবাসায় ভোলাবো !

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্‌বো না গো,

গান দিয়ে দ্বার খোলাবো !

ভবাব না ভূষণ-ভারে

সাজাব না ফুলের হারে

প্রেমকে আমার মালা ক'রে

গলায় তোমার দোলাবো !

—অরূপরতন

পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আনন্দকিশোর বল্লেন—"তুমি যে এখানে ?"

—"বাণীর সঙ্গে এসেছি। তুমি যে হঠাৎ এখানে এলে ?"

—"পূজো দিতে। খুব অসুখ হ'য়েছিল, তাই ভেবে-ছিলেম—ভালো হ'লে পূজো দিয়ে যাবো।"

একটু থেমে আনন্দকিশোর আবার বল্লেন "তুমি এখানে এমন ক'রে প'ড়েছিলে কেন ?"

রূপা একটু হাস্‌লে। তার পরে বল্লে—"এত ক্ষিধে-তেষ্টা নিয়ে কথা কওয়া যায় না, এখন বাসায় পৌঁছতে পার্‌লে বাঁচি।" রূপা আনন্দকিশোরকে ছাড়িয়ে আগে

আগেই চ'লেছিল, এবার আনন্দকিশোর এগিয়ে এসে বল্লেন—"বাসা তো কাছেই—আমার কথার উত্তরটা দিয়ে যাও।" রূপা আবার একটু হাস্‌লে, কিন্তু কিছু ব'ল্লে না।

তার নিরুত্তর মুখের দিকে চেয়ে একটা অজানা খবরের আভাষ আনন্দকিশোরের অন্তরে সাড়া দিয়ে গেলো! প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল চোখ দুটী রূপার মুখের উপর রেখে, গাঢ় স্বরে তিনি বল্লেন—"কেন মিথ্যা এত কষ্ট ক'র্‌লে!"

রূপা শুধু বল্লে—"সে কষ্ট আমার সার্থক!" এর পর মিনিট দুই তিন কেউই কথা কইতে পার্‌লে না। রাস্তায় তখন বেশ লোক চলাচল সুরু হয়েছে।

আনন্দকিশোর তাড়াতাড়ি জিগেস্ ক'র্‌লেন—"এখানে তা হ'লে ক'দিন থাক্‌বে?"

রূপা বল্লে—"আজ রাত্তিরেই যাবো, নয় তো কাল"—

—"এত তাড়া?"

—"মোটে তিন দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি; কাল চার দিন হ'য়ে যাবে, বেশী দেরী হ'লে বিরক্ত হ'তে পারেন।"

—"বিরক্ত হওয়ার চেয়ে ছবি আঁকাই তো বেশী সম্ভব!"

—"ছবি তো আজ কাল আঁকেন না, আজ কাল চরকা কাটেন।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে আনন্দকিশোর বল্লেন—"তার মানে ?"

—"মানে তো জানিনে, তবে ছবির পাট একেবারে উঠে গেছে—"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দকিশোর বল্লেন—"একনিষ্ঠ হ'তে না পার্‌লে, মানুষের কখন কোন বিষয়ে উন্নতি হ'তে পারে না। নিষ্ঠা না থাক্‌লে মানুষ নিজের মনেও শান্তি পায় কি না সন্দেহ। শুধু কর্ম্মের দিক্ দিয়েই নয়, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নর্ম্ম—সব দিক্ দিয়েই—"

কথাগুলির গুরুত্ব হাল্কা ক'রে নেবার ছলে রূপা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"বেশ, তুমি খুব একনিষ্ঠ! নিষ্ঠা যা আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে—"

—"তা তো যাচ্ছেই! তার চাক্ষুষ প্রমাণ—তোমার মন্দিরে এসে প'ড়ে থাকা!"

এই ধরা পড়ে যাওয়ায় রূপার শুখ্‌নো সাদা মুখ একেবারে রাঙা গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌লো। তবু সে সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়, তাই ব'লে উঠ্‌লো—"খুব লোক যা হ'ক! মন্দিরে প'ড়ে থাকায় আমার নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, না তোমার? এবার দেখ্‌ছি কোন্ দিন ব'লে বস্‌বে—আমার যা কিছু পুণ্য-টুণ্য, তাও তোমার নিষ্ঠার জোরে! বড় মন্দ মজা নয়!"

আনন্দকিশোর আবার একটু হাস্‌লেন ও বল্লেন—"তা তো নয়ই রাণী! যা বলেছি, তার মধ্যে এমন

কিছু অসরল নেই, যা তোমার পক্ষে বোঝা অসহজ হ'বে।"

এ কথা চাপা দেবার জন্যে রূপা ব'লে উঠ্লো—"কি মানুষ! ক্ষিধেয় তেষ্টায় গলা, বুক ফেটে যাচ্ছে; তা যদি একটু জ্ঞান আছে! এ রকম না খেয়ে থাক্‌তে পারো?" কথা ক'টা ব'লে ফেলেই তার মনে হ'ল—আনন্দকিশোর যে অমন কতদিন অনাহারে থাকেন, তাই এ কথা তাঁকে বলা শোভা পায় না তো! কিন্তু এমনি ভুল হ'য়ে যায়! যখন তিনি দূরে থাকেন, তখন বার বার তাঁর মহত্ত্বই মনে পড়ে; কিন্তু যখন কাছে আসেন, তখন তাঁর সব যোগ্যতা ভুলে গিয়ে সে তাঁকে কত কি যে ব'লে ফেলে, তার ঠিক্ নেই। কথাটা শুধ্‌রে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বল্লে—"তোমার কথা ছেড়ে দাও, তা ব'লে আমরা পারি কখন? তা তো বুঝ্‌বে না! বক্তৃতা দিয়ে কেবল দেরী ক'রে দিচ্ছ—"

—"তোমাকেই বা কে তা থাক্‌তে ব'লেছিল রেণু? কেউ তো বলেনি—"

—"সে আমার ইচ্ছে—"

এই কথায় আনন্দকিশোর আবার একটু হাস্‌লেন ও বল্লেন—"নিজের ইচ্ছেতে যা করেছ, তার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি, রাণী?"

রূপা চলা থামিয়ে ফিরে দাঁড়ালে ও অসম্ভব রকম গম্ভীর মুখে বল্লে—"অত-শত নামের দরকার নেই; আমার

নাম রেণুও নয়, রাণীও নয়, এটুকু মনে রাখ্‌লে সুখী হবো।"

গম্ভীর মুখে আনন্দকিশোর বল্লেন—"ভূল হ'য়ে গিয়েছে; আর হ'বে না!" দু'এক মিনিট বাদে রূপা আবার দাঁড়িয়ে প'ড়্‌ল ও খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে বল্লে—"তোমার জন্যে এ পথ চলা আজ শেষ হ'বে না দেখ্‌ছি! দেখো দিকিনি, এ কোন দিকে নিয়ে এলে? এ তো অনেক দূর!"

আনন্দকিশোর এবার এধারে-ওধারে ফিরে দেখে বল্লেন "—তাই তো, একটু ঘুর হ'বে দেখ্‌ছি তোমার পৌঁছতে! আমার বাসায় এসে প'ড়েছি। এখন এখানেই এসো, একটু জল খেয়ে তার পরে যেও—" ঘরের দরজা খুলে আনন্দকিশোর রূপার দিকে চাইলেন।

আরো রাগ ক'রে রূপা বল্লে—"ইচ্ছে ক'রেই এ ভুল হয়েছে বোধ হয়! আমি যে এতদূর হাঁট্‌তে পার্‌বো না, এ কথা জেনেও—"

—"ইচ্ছে ক'রে করিনি। তুমি হয় তো বিশ্বাস ক'র্‌বে না; কিন্তু সত্যি! কথার ঝোঁকে পথ ভুল হ'য়েছে—"

"ঝোঁকই মানুষের বশ হয়। মানুষ যে ঝোঁকের বশ হয়, তা আগে জান্‌তুম না। মানুষ হ'য়ে এমন হয় কেন?"

রূপার এই কথায় আনন্দকিশোরের মুখে আবার একটু হাসি দেখা গেলো, বল্লেন—"বেশ, পথে দাঁড়িয়ে ঝগড়া

না ক'রে, ঘরে এসে তা করো, নইলে রাস্তায় লোক জমে যাবে।"

এর উত্তরে রূপা শুধু একবার মাত্র সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর ঘরের খোলা দরজার দিকে চেয়ে নিয়ে বল্লে—"রাস্তায় লোক জমার ভয় নেই, ঝগড়া থামিয়ে আমি এবার চল্লুম। ঐ যে বাণীর দাসী আমায় খুঁজ্‌তে এসেছে।"

—"একটু জল খেয়ে যাও, নইলে চ'ল্‌তে পার্‌বে কেন?"

—"হ্যাঁ, ওধারে বাণী ভেবে মরুক্, আর আমি এখানে দেরী করি— !"

—"দেরী আর কি—এক মিনিটও লাগ্‌বে না—"

—"তার দরকার নেই, খুব চ'ল্‌তে পার্‌বো—" ব'লে একটু হেসে আনন্দকিশোরকে প্রণাম ক'রে রূপা চ'লে গেলো। যে ঘরের দরজা রূপার জন্যই খোলা হ'য়েছিল, তা আবার বন্ধ ক'রে আনন্দকিশোর মন্দিরের পথে চ'লে গেলেন।

বাণী রূপার জন্যে খাবার দাবার গুছিয়ে রেখেছিল, সে সব ধরে দিয়ে বল্লে—"নাও, নাও, আগে খাও! এমনি ক'র্‌বে জান্‌লে কখন আন্‌তুম না। একেতো শরীরের এই অবস্থা, তার উপর এই অত্যাচার! তোমার কি অন্যায় ভাই?"

পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে রূপা বল্লে—"কেন

মিথ্যা ভাব্‌ছ ভাই বাণী, দেখো আমার কিছু হবে না। দু'দিন না খেলে মানুষ ম'রে যায় না।"

—"ম'রে না গেলেই কি হ'ল শুধু। শরীরে বল থাকা চাইতো, নইলে কি ক'রে কি হবে বলো? এখন যাবে কি ক'রে এই শরীর নিয়ে?" রূপা বল্লে—"এ বেলাটা বিশ্রাম ক'রে ওবেলা বেশ যেতে পার্‌বো।"

—"তা আর পার্‌তে হয় না। আজ যদি ভালো থাকো, তবে কাল যদি যাওয়া হয়—আজ তো হ'তেই পারে না —যা তোমার শরীর হ'য়েছে, টলে প'ড়্‌ছ একেবারে!"

উপবাসী রূপার মুখে আহারের আস্বাদ অমৃতের মতই লাগ্‌ছিল কিন্তু সে যতটা খাবে মনে ক'রেছিল ততটা খেতে পার্‌লে না। খাওয়া হ'লে যখন সে বিছানা পেতে শুলে, তখন তার মনে হ'ল, যেন বিশ্বের সমস্ত ঘুম তার চোখে জড়িয়ে এসেছে—অসীম তৃপ্তি ও শান্তিতে—এ ঘুম বুঝি আর ভাঙ্গবেনা তার! কোনো উদ্বেগ নেই, কামনা নেই, কোনো অতৃপ্তি নেই, অপাওয়া নেই, যেন একটা বিরাট শান্তি, নিবিড় পূর্ণতা, তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে লয়ের দিকে টান্‌ছে! মৃত্যুর সময়েও কি মানুষের ঠিক্ এমনি হয়? তখন কি এই রকম ইচ্ছার শেষ হ'য়ে যায়? নইলে মানুষ বুঝি মর্‌তে পার্‌তো না! এমন সবুজ পৃথিবী, পাতার দোলন, ফুলের শোভা, তরুবিথীর স্নিগ্ধ ছায়া, মেঘের লীলা, নদীর উজান, সূর্য্য-শশীর উদয়াস্ত, এ ছেড়ে মানুষ কেমন

ক'রে ম'রে যায়? তখন ইচ্ছে থাকে না ব'লেই পারে বোধ হয়—ভাবতে ভাবতে রূপার চোখ অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠলো, তারপরে তার ভিজে চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে তাকে কান্না-হাসির দুয়ার থেকে রেহাই দিলে।

রূপার ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে সে; তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলো কিন্তু পারলে না, কারণ মাথার ব্যথা, গায়ে হাতে ব্যথা ও শীত ক'রছে বোধ হ'ল। সে বুঝলে, বোধ হয় তার জ্বর এসেছে কিন্তু অসুখের কথা বাণীকে জানাতে তার সাহস হ'চ্ছিল না —কারণ একেইতো তার উপবাস করা নিয়ে বাণী চটে আছে, তার উপর অসুখের কথা শুনলে ভয়ঙ্কর রাগ যে অনিবার্য্য, তা রূপা সুনিশ্চয় রূপেই বুঝেছিল। তার চেয়ে এই জ্বর নিয়েই সে চ'লে যাবে, তারপর বাড়ী গিয়ে না হয় দু'দিন ভুগবে। এ সঙ্কল্প কিন্তু তার ব্যর্থই হ'ল, কারণ জ্বরের যাতনা তো বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায় না। সন্ধ্যার সময় আবার তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে বাণী তার অসুখ ধ'রে ফেল্লে—! রূপার উত্তপ্ত কপালে হাত দিয়ে সে ব'লে উঠলো—"এ যে বেশ জ্বর হ'য়েছে দেখছি। পরশু রাতে বৃষ্টি গেছে, সেই ঝড় বৃষ্টিতে জলের মধ্যে রইলে, ভিজে কাপড় গায়েই শুখোলো, জ্বর আর হবে না? এতক্ষণ যে হয়নি এই আশ্চর্য্য!"

বাণীর স্বামী অতিশয় ভালোমানুষ, শান্তিপ্রিয় লোক;

রূপার অসুখের কথা শুনে তাঁর তো চক্ষু স্থির। তিনি ডাক্তার আন্‌তে ছুট্‌লেন, ডাক্তার এসে বল্লেন—খুব সাবধানে রুগীকে রাখ্‌তে হবে; আর যেন ঠাণ্ডা না লাগে, কারণ নিমোনিয়ার ভয় আছে। ডাক্তার চ'লে গেলে রূপা বল্লে—"আমি কালই ভালো হ'য়ে যাবো, মিছে কেন এত ব্যস্ত হ'চ্ছ বাণী!"

তার পরে বাণীর স্বামীর দিকে চেয়ে সে আবার বল্লে—"মিছে আপনাদের এত কষ্ট দিলুম! ভাবনা, চিন্তা, সেবা, যত্ন, আমার জন্যে আপনাদের কতই ক'র্‌তে হ'ল!"

৪০

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিন্‌লে না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে
সবার নীচে ধূলার পরে
ফেলো যারে মৃত্যু শরে
সে যে তোমার কোলেয় পড়ে
ভয় কি বা তার পড়নকে !

—অরূপরতন

দিন সাতেকের মধ্যেই রূপা অনেকটা সুস্থ বোধ কর্‌লে ও কলকাতায় ফিরে এলো। সে বরাবর অরুণের বস্‌বার ঘরে এসে দেখ্‌লে—মাদুরীতে ব'সে অরুণ চরকা কাট্‌ছে, ঘরে একটিও চেয়ার নেই, টেবিল নেই, কৌচ নেই, একেবারে আস্‌বাব-শূন্য! অরুণের হাতের আঁকা যে সব ছবি বহু যত্নে বহু সমাদরে বিস্তৃত ঘরের দেয়ালে কাঁচের ও কাঠের নানা সুদৃশ্য ছবি-দানীতে ঘর জুড়ে শোভা পেতো, তার একখানিও নেই। যা অরুণের সব চেয়ে প্রিয় ছিল, যা সে প্রাণ দিয়ে রচনা ক'রেছিল, সেই সব ছবির বিচ্ছেদ যে অরুণ কি ক'রে সহ্য করে নিলে, তা সে ভেবে ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না। কত সূর্য্যাস্ত সূর্য্যোদয়, কত চাঁদ্‌নী রাত অমার আঁধার, কত বসন্ত বর্ষা, কত সুবেশা সুন্দরী, অপ্সরী, জলপরী, হুরীদের, নৃত্যবিলাসী, ছন্দমুখর, নুপূর-পরা

চরণ তার হাতের তুলির টান থেকে মূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়েছিল, সেই সব অত আদরের, অত সোহাগের ঘর-জোড়া রূপের জীবন ঘর থেকে নির্ব্বাসিত হ'ল কোন্ দুঃখে ? আবার সে চারধারে চেয়ে দেখ্‌লে ; এবার দেখ্‌তে পেলে—ঘরে একখানি ছোট্ট সূর্য্যাস্তের ছবি আছে মাত্র। ঘরের জিনিষ-পত্রই বা গেলো কোথায়, তাও সে কিছুই ভেবে পেলে না !

অরুণের চরকা সমানেই চলেছিল। স্ত্রীর ভাবগতিক দেখে সে এবার চরকাটা একটু বন্ধ ক'রে তার দিকে চাইলে ও বল্লে—"অবাক্ হ'চ্ছ না কি ?"

রূপা সাহস পেয়ে বল্লে—"জিনিষ-পত্র কোথা গেলো সব ?"

—"যাবে আর কোথা ? বিক্রী !"

—"সব ?"

—"হ্যাঁ, সব।"

—"কোনো ঘরেই কোনো জিনিষ নেই ?"

—"না।"

—এবার কৌতূহল শেষ ক'রে দিয়ে রূপা বল্লে—"তা হ'লে এবার আর টাকার অভাব হবে না ?"

বিরক্তির সূত্রপাত অরুণের মুখে ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেলো ; তবু সে যথাসাধ্য সংযত-স্বরে বল্লে—"হবে। কারণ পুরাণো আস্‌বাব্ বিক্রীর দামে কারো টাকার অভাব ঘোচে না, তার উপর ধার আছে। তোমার কিছু বুদ্ধি নেই—"

স্বামীর কাছ থেকে এরূপ ভদ্র ও মৃদু তিরস্কার রূপার বিবাহিত জীবনে এই বোধ হয় প্রথম বা দ্বিতীয়; তাই সে অসম্ভব রকম খুসী হ'য়ে উঠ্‌লো,—অরুণের প্রতি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতায় তার সমস্ত মনটা যেন ছাপিয়ে উঠেছিল—এবার সে নিশ্চিন্ত সাহসে প্রশ্ন ক'র্‌লে—"তোমার ছবিগুলো কোথায় রেখেছ? দেখ্‌ছি নে যে!"

এই কথায় কঠোর-চিত্ত অরুণের সমস্ত মুখটা যেন ব্যথায় দ্রবীভূত হ'য়ে এলো। নিজেকে সাম্‌লাতে তার বেশ একটু বেগ পেতে হ'ল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে এই দুর্ব্বলতা জয় ক'রে বল্লে—"সে সব বিক্রী ক'রে টাকাটা মহাত্মাজীর পায়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। যারা পরের দাসত্ব করে, তাদের রং তুলির শ্রাদ্ধ ক'রে বাহাদুরী কিন্‌তে যাওয়ার মত অপমান বোধ করি আর দুনিয়ায় কিছুতে নেই। গ্রামে যখন আগুণ ধ'রেছে তখন রং গুলে নক্সা ক'র্‌ছি—নিশ্চিন্ত মনে—সেটা তো মস্ত পাপ! ও পাপে আর না, দেশ স্বাধীন হ'ক, তার পর সব!"

রূপা আবার প্রশ্ন ক'র্‌লে, "ছবি আর আঁক্‌বে না?"

অরুণ বল্লে—"না"

—"যদি মনে আসে?"

—"এলে অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে, যতদিন না দেশ বাঁচে।"

রূপা ব'লে ফেল্লে—"কলা-লক্ষ্মী কি তোমার দেশ বাঁচার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বেন? তাঁকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে

না নিলে তিনি ফিরে যাবেনই, দেশ বাঁচা বা মরার কোন অপেক্ষা তিনি তো রাখ্‌বেন না। দেশ স্বাধীন হ'বার পরমুহূর্ত্তে তুমি যদি তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সাধ্য-সাধনাও করো, তখন তাঁর সোনালী আঁচলের এক খেই জরী, পায়ের আল্‌তার এক বিন্দু ছাপ, খোঁপার খসা ফুল বা মালার ছেঁড়া পাঁপ্‌ড়ি—কিছুই পাবে না আর। যদি ধরো, তোমার কোন বন্ধু যখন খুসী তোমার বাড়ী আস্‌তে চায়, তুমি যদি বলো—না, তা হবে না, বিচার ক'রে তাঁর আসা-যাওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখ, সন নির্দ্ধারিত করো, তা হ'লে কি তাঁর অভিমান হয় না? অভিমানে সে আর আসে না। আমি তোমায় কখন কিছু অনুরোধ করিনি, আজ আমার এই অনুরোধটা তুমি দয়া ক'রে রাখো।"

অরুণ যে এত লেক্‌চারেও কেন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লে না, তার গূঢ় কারণ কিছু বোঝা গেলো না। রূপা আবার বল্লে—"এতদিনের সাধনা, এতখানি শক্তি, তুমি লোকের কথার মোহে, হুজুকে প'ড়ে পায়ে ঠেলো না।"

অরুণের অপ্রত্যাশিত ঠাণ্ডা মেজাজ রূপাকে যথার্থই আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিল। রূপার কথা শেষ হ'লে অরুণ তার দিকে না চেয়েই বল্লে—"তোমার মতের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে চাইনে, কারণ, তুমি কিছু বোঝ না। যারা দেশের এই দুর্দ্দিনে আর্ট নিয়ে ডুবে আছে, তাদের মনুষ্যত্ব নেই, আমি তাদের হেয়

না ভেবে পারি না।" তারপর আবার বল্লে—"এই এলে, ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে এসো।"

পরের সাম্‌নে নিজের জেদ্‌ ও যুক্তি বজায় রাখ্‌বার জন্যে যতই বড় বড় কথা ও স্বদেশীকতার আগ্রহ দেখাক্‌ না কেন, অরুণের মনের ভিতর যে কত বড় পরিতাপ ও পরিবেদনা জমে উঠেছিল, তা তাকে গোপনে একলার অবসরে না দেখ্‌লে বোঝাবার উপায় ছিল না। তার জীবনে যদি কিছুর উপর অনুরক্তি হ'য়ে থাকে, তা হয়েছিল—ছবি আঁকাতেই; আর সে বিষয়ে তার শক্তিও কম ছিল না। কিন্তু নূতনত্বের মোহ তাকে এমনি কতকগুলো কু-অভ্যাস ও হুজুক্‌প্রিয়তার দাস ক'রে ফেলেছিল, যার থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রতিভাকে পুর্ণজীবিত ক'র্‌তে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন ছিল,—যা অরুণের নিষ্ঠাহীন বিকৃত অন্তরের পক্ষে বর্ত্তমানে একান্তই অসম্ভব। তাই সে নিজেকে ও তার প্রতিভাকে ফাঁকি দেবার বেশ একটা সহজ উপায় খুঁজে পেলে। উপায়টা হ'চ্ছে—দেশ-ভক্তির আড়ম্বর! চরকা-কাটা, সভা-সমিতিতে ঘুরে বেড়ান তো ছিলই; তা ছাড়া, সে সকলকে জানিয়ে দিলে যে, যতদিন না স্বরাজ লাভ হয়, ততদিন সে ছবি আকাতে হাতও দেবে না। তার এই আত্যন্তিক দেশ-ভক্তির প্রমাণ পেয়ে ভারত-রাজলক্ষ্মী খুসী হ'লেন বা সন্তানের যেটুকু গুণ-গৌরব ছিল, তাও হারাণোর সম্ভাবনায় গোপনে অশ্রু মুছ্‌লেন, তার

সঠিক বৃত্তান্ত গোচরীভূত হবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সবটুকুই অগোচর রইল না। এই ত্যাগস্বীকারের বাহাদুরীর ফলে, সাধারণ তাকে সসম্মানে শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত ভূয়সী খ্যাতি ও যশের বোঝা অরুণের মুখে বিন্দুমাত্র হাসি ও মনে এক কণাও শান্তি আন্‌তে পার্‌লে না।

রূপা চ'লে গেলে সে চরকা থামিয়ে চারধারে চেয়ে দেখ্‌লে—কেউ কোথাও আছে কি না। তারপরে আস্তে আস্তে স'রে গিয়ে দাঁড়ালে—তার রচনার শেষ-চিহ্ন সেই সূর্য্যাস্তের ছোট্ট ছবিখানির কাছে! তার প্রত্যেকটী রূপরেখা অনুভূতির তুলি দিয়ে অনুরাগের রঙে গড়ে উঠেছে, তাই যেন নিখিলের পুঞ্জীভূত স্নেহ জমা হ'য়ে উঠেছে ওর ভিতর। আজ সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এখান থেকে ফের্‌বার কি কোনো উপায়ই নেই আর? যদি থাক্‌তো, তা হ'লে সে এমনি ছবি আরো কত আঁক্‌তে পার্‌তো। অপর্য্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দু'পায়ে ঠেল্‌তে তার তো কোনো দিনই অবহেলা দেখা যায়নি—জীবনটা নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলাই খেলেছে সে! ভগবান তাকে দিয়েছিলেন অনেক, কিন্তু সে নিতে জানে না, তাই কোনো বিষয়েই নিষ্ঠা রাখ্‌তে পারেনি। জমিদারী, ছবি আঁকা, স্বদেশীকতা—কোনটার ভিতর দিয়েই তাই সে এপর্য্যন্ত সার্থকতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌লে না। কারণ, সবের কাছ থেকেই সে সবকে ফাঁকি

দিতে চেষ্টা ক'রেছে। সব কয়টা কাজের সামঞ্জস্য এনে জীবন গড়ে তুল্‌তে পারা যত বড় প্রতিভার কাজ, অরুণের প্রতিভা তত সমুজ্জ্বল ছিল না। অথচ লোকের কথা এড়িয়ে, হুজুকের মোহ কাটিয়ে, লক্ষ্য স্থির রেখে এক বিষয়ে লেগে থাকার মত সুদৃঢ় নিষ্ঠারও তার একান্ত অভাব ছিল। আর সব চেয়ে তার দুর্ব্বলতা ছিল—লোকের কথায় কাণ দেওয়া। অথচ, সে যে কারো উপদেশ-অনুশাসন মেনে চ'ল্‌ত, তাও নয়; বরং ঠিক তার উল্টো। যে সব লোকের কথায় সে কাণ দিত, তারা হ'চ্ছে সেই শ্রেণীর লোক, যে শ্রেণীর লোকের কাজই কেবলমাত্র—পরচর্চ্চা, পরনিন্দা বা পরপীড়ন ক'রে স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল খোস-গল্পে সময় কাটান। তাদের মন্তব্য ও রুচি-অভিরুচির মূল্য যে কতটুকু ও কখন কখন কত দূর অনিষ্ট-প্রয়াসী, তা কারোও অবিদিত নেই। রূপার কথাতেই হ'ক্, বা নিজের বিবেকের প্রেরণাতেই হ'ক্, আজ তার মনে হ'ল—আবার কি ফের্‌বার উপায় নেই?

বোধ হয় উত্তর পেলে—"ফের্‌বার উপায় আছে।" কিন্তু এ উত্তর সে অগ্রাহ্য ক'রে আবার নিজের মনকে জোর ক'রে এ চিন্তা থেকে সরিয়ে নিলে। কারণ, এ চিন্তা তার গর্ব্বে আঘাত ক'র্‌ছিল, তাই তার উদ্ধত, অহঙ্কারী চিত্ত সগর্ব্বে মাথা নেড়ে ব'লে উঠ্‌লো—এ দুর্ব্বলতা এলো কোথা থেকে? এ প্রলোভনকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না সে

আর! কিন্তু সত্য ও প্রকৃতির গতি যেমন দুর্নিবার, তেমনি অব্যাহত। তাকে রুকৃতে গেলে তার প্রচণ্ড শক্তি অধিকতর উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। অরুণ চরকা ঠেলে ফেলে বাক্স থেকে রঙ তুলি বার ক'রে ফেল্লে, আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সাদা কাগজে রেখার পর রেখা ফুটে উঠ্‌তো— যদি না তার হঠাৎ এই আত্মবিস্মৃতি কল্পিত পায়ের আওয়াজে চমক্ ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌তো। চোর যেমন ক'রে চোরাই মাল লুকায়, ঠিক্ তেমনি দ্রুত ও সন্তর্পণে অরুণ তার রঙ তুলি বাক্সে বন্ধ ক'রে, দরজার কাছ থেকে চার ধারে উঁকি মেরে দেখ্‌লে—কেউ আস্‌ছে কি না; যখন দেখলো—কেউ নেই, তখন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সূর্য্যাস্তের ছবি খানা সে দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে এলো। ভাব্‌লে—যে ছবি তাকে এমন ভাবে সঙ্কল্পচ্যুত ও প্রলোভিত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছিল, সে ছবি আর সে চোখের সাম্‌নে রাখ্‌বে না। কয়েক মুহূর্ত্ত আগের ভয় ও উদ্বেগে তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠ্‌ছিল, সে তাড়াতাড়ি গা মাথা মুছে ফেলে ছবিখানা কোথায় রাখ্‌বে তাই ভাব্‌ছে, এমন সময় রূপা আবার সে ঘরে এলো। রূপা আসার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে অরুণ চরকা ধ'র্‌লে। এইমাত্র যে ছবি টাঙ্গান ছিল, তা মাটীতে প'ড়ে থাকৃতে দেখে রূপা বল্লে —"বেশ তো টাঙ্গানো ছিল, নামালে যে?"

অরুণ গম্ভীর মুখেই বল্লে—"কেন, কি বৃত্তান্ত, অত আমি

কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌বো না তোমায়। সাম্‌নে থেকে সরিয়ে রাখ্‌বো, তাই নামিয়েছি।"

—"সরিয়ে কোথায় রাখ্‌বে ?"

—"যেখানে হয়, নীচের তলায় কোনো একটা কোণে-টোণে।"

রূপার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ; একটা ছবির এই অপমানে যেন নিখিল কাব্যের দরদী অন্তর ব্যথিত হ'য়ে উঠেছে, এইটুকুই তার মনে হ'ল! সে আঁচলে চোখ মুছে বল্লে —"আমায় দেবে ?"

রূপার এই ভিক্ষা অরুণকে আবার একটু স্তম্ভিত ক'রে দিলে কিন্তু বিচলিত না হ'য়ে সে যথাপূর্ব্ব দৃঢ়স্বরে বল্লে— "তোমার নিতে 'ইচ্ছে থাকে, নিতে পারো ; এ বিষয়ে আমার আপত্তি বা অনাপত্তি কিছুই নেই—"

এ কথা শুনে এই অনাগ্রহের দান নিতে রূপা প্রথমে ভয়ানক কুণ্ঠা বোধ করলে, কিন্তু যা একদিন অত যত্নে ও সমাদরে ঘরের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রেছিল, সেই অনাবিল সৌন্দর্য্য যে আজ এত অনাদরে লাঞ্ছিত হবে, এ ব্যথা তার পক্ষে একেবারে অসহ্য হ'য়ে প'ড়েছিল, তাই কুণ্ঠার লজ্জাকে সে অনায়াসে কাটিয়ে উঠ্‌লো ও দাতার উপেক্ষার দানও সাগ্রহে দু'হাতে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে ছবিখানি বারবার আঁচলে মুছে লোহার সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রাখ্‌লে। গহনার সিন্দুক

ছাড়া তার ঘরেও আর কোন আস্‌বাব্‌-পত্র ছিল না, তার অনুপস্থিতে সে সমস্তও নীলাম করা হ'য়েছিল—চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি—সব !

এবার যখন রূপা এলো, অরুণ বল্লে—"কাল কি খাব তা জানি না ; এধারে বাইরে বেরোবার যো নেই, ধারের টাকার জন্যে লোকগুলো তিতিবিরক্ত ক'রে তুলেছে।"

শুখ্‌নো মুখে রূপা বল্লে—"তা হ'লে একটা কিছু উপায় তো ক'র্‌তে হবে, না হয় দু'জনেই চাকরী করি কোথাও।"

অন্য দিন হ'লে এ কথায় অরুণের মেজাজ যে কতদূর তীব্র হ'য়ে উঠ্‌তো, তা রূপার অবিদিত ছিল না, কিন্তু আজ সে শান্ত স্বরেই বল্লে—"তা হয় না।"

—"তবে এই বাড়ীটাই বাঁধা দাও না কারো কাছে।"

—"বাড়ী অনেকদিন আগে বাঁধা দেওয়া হয়েছে, খুব সম্ভবতঃ আর দু'একদিনের মধ্যেই তারা এসে এ বাড়ী দখল কর্‌বে, তখন আমরা নিরাশ্রয়।"

খানিকটা ভেবে রূপা বলে উঠ্‌লো—"আমার সমস্ত গহনা গুলো দিয়ে কিছু হয় না ?"

অরুণের বিষণ্ণ মুখ একটু যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে বল্লে—"তোমার গয়নাতে আর এমন বেশী কি হবে—তবু নিয়ে এসো, দেখি।"

রূপা তাড়াতাড়ি ঘরে চ'লে গেলো ও হীরে, মতি, চুণি,

পান্নার বোঝাগুলো নিয়ে এসে স্বামীর পায়ের তলায় রেখে দিয়ে বল্লে—"এই নাও, সব এনেছি ; এতে হবে না ?"

অরুণের প্রলুব্ধ চক্ষু হীরে-পান্নায় যেন আঁকড়ে ধ'রেছিল ; সে জোর ক'রে তার চোখ দুটো তার থেকে টেনে নিয়ে মুখ ফেরালে, কিন্তু তার প্রাণের আনন্দ গম্ভীরতার ভাণে কিছুতেই ঢাকা প'ড়্ল না—যদিও রূপার সরল মনের কাছে এ বিষয় একেবারেই অলক্ষ্য রইল—অরুণ কিসে ঋণমুক্ত হবে, এই কথা ভাব্‌তেই সে তখন ব্যস্ত। তার উপর অরুণের মৃদু আচরণ, প্রসন্ন মুখ ও বিষণ্ণ কাতরতা রূপার মনকে সমবেদনায় অভিভূত না ক'রে পারেনি। অরুণ এবার উঠে জহরৎগুলো নিজের বাক্সে বন্ধ ক'রে রূপার দিকে চেয়ে বল্লে—"চট্ ক'রে দু'টী ভাত রেঁধে দিতে পার্‌বে রূপা ? তা হ'লে আমি এইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ; দেখি, কতদূর দাম ওঠে।"

স্বামীর এই স্নিগ্ধ কথায় রূপার ট্রেণে আসার সমস্ত শ্রান্তি যেন কোথায় চ'লে গেলো ! একেবাবে কৃতকৃতার্থ হওয়ার ভাব তার সমস্ত মুখ-চোখ ভরিয়ে দিলে। সে বল্লে—"এক্ষণি আমি খাবার আন্‌ছি, তুমি স্নান কর্‌তে যাও।"

ভাত খেতে ব'সে অরুণ বল্লে—"আজ খেয়ে যেন প্রাণটা বাঁচ্‌লো, ক'দিন যা খাবার !"

রূপা বল্লে—"কেন, আমি যে ক'দিন না আসি, বামুণ আস্‌বার কথা ছিল যে ?"

—"সে হ'য়ে উঠ্‌লো না, হোটেলে গিয়ে খেয়ে আস্‌তুম।" তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে পান খেতে খেতে অরুণ বল্লে—"এরি মধ্যে পানও সাজা হ'য়ে গেলো? এই তো তুমি ফির্‌লে!"

এই প্রশংসায় রূপার মুখ-চোখ যেন লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। এতদিন সে এত কাজ ক'রেছে, কখনও তো তার স্বামী এমন করে কথা বলেন নি! আজ তার কি সৌভাগ্য! অরুণের কথার উত্তরে সে কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, শুধু মুখ নীচু ক'রে একটু শুখ্‌নো হাসি হাস্‌লে।

অরুণ এবার তার হাতটা সস্নেহে নেড়ে দিয়ে বলে গেলো—"তবে এখন চল্লুম।"

এই হাত নাড়ায় রূপা চম্‌কে উঠ্‌লো। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তার সমস্ত হৃদয় ভেদ ক'রে যেন বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছিল, সে জোর করেই যেন সেটা চেপে রাখ্‌লে।

রূপা সেদিন খুবই শ্রান্ত ছিল, তাই না ঘুমিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। যখন তার ঘুম ভাঙ্গ্‌লো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি উঠে সুইচটা টেনে দিয়ে সে ঘড়ী দেখ্‌লে —৭টা বেজে ১৫ মিনিট! রাত অবধি সে ঘুমোচ্ছে, ডাক্‌বারও কেউ লোক নেই যে ডাক্‌বে। বোধ হয় অরুণ এখনো ফেরেন নি, ফির্‌লে হয় তো আজ তিনি নিজেই ডাক্‌তে আস্‌তেন তাকে!

মুখ হাত ধুয়ে সে অরুণের বস্‌বার ঘরে গেলো, গিয়ে দেখ্‌লে—সত্যিই তিনি তখনো ফেরেন নি। রাস্তার

দিকের জানালায় চোখ রেখে সে খানিকটা ব'সে রইল, তার পরে খবরের কাগজটায় চোখ বুলোচ্ছিল, এমন সময় অরুণের শুভাগমনে সে কাজগখানা ফেলে দিয়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিগেস ক'র্‌লে—"কি হ'ল ?"

অরুণের মেজাজ সকালের মতন নরম ছিল না, অন্য দিনের মতই গরম হ'য়ে উঠেছিল, তাই সে কড়া সুরে বল্লে—"হবে আর কি!" তার পর অরুণ খানিকটা গুম্ হয়ে ব'সে রইল।

রূপা সাহসে ভর করে আর একবার জিগেস্ কর্‌লে—"তা হ'লে কি হবে ?"

বিরক্ত হ'য়ে অরুণ বলে উঠলো—"যা অদেষ্টে আছে, তাই হবে—" যেন রূপার সঙ্গ এড়াবার জন্যেই অরুণ সে ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ব'স্‌ল। তার সাম্‌নে থাকা তার স্বামী পছন্দ কর্‌ছেন না, রূপা তা বুঝ্‌লে; তাই সে আর সে ঘরে গেলো না। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে আবার সে ঘরের দরজায় এসে উঁকি মার্‌লে, দেখ্‌তে পেয়ে অরুণ বল্লে—"আবার কি ?"

—"খাবে না ? সাড়ে ন'টা বেজে গেছে!"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অরুণ বল্লে—"চলো, যাচ্ছি—এই খাওয়াই শেষ!"

রূপা চলে যাচ্ছিল, এই কথায় ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"তার মানে ?"

—"পয়সা না থাক্‌লে খাওয়া জুট্‌বে কোথা থেকে ?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে রূপা বল্লে—"এই যে গয়না নিয়ে গেলে —তার দরুণ যে টাকা—"

চড়া গলায় অরুণ ব'লে উঠ্‌লো—"তোমার কাছে অত হিসেব দিতে আমি আসিনি—মিছে রাগিও না—"

তার পর নিঃশব্দেই খাওয়া শেষ ক'রে অরুণ উঠে গেলো, রূপাও নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুলে। শুয়ে শুয়ে সে কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তারা যে আজ নিরাশ্রয়, অপরে এসে বাড়ী দখল কর্‌বে,—এইটাই সব চেয়ে তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। লোকে বুদ্ধি খাটীয়ে কত রকম কি করে, কিন্তু অরুণ তো সে রকম নয়; কোনো কথা বল্লেই রেগে ওঠেন শুধু? গহনা-পত্র যা কিছু ছিল, তাও তো শেষ হ'য়ে গেলো, এখন আর কোনো উপায়ই নেই। কি যে হবে আর কি যে ক'র্‌বে, তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখে ঘুম ছিল না। অনেকক্ষণ পরে যখন তার শ্রান্ত চোখ দু'টী ঘুমে ঢুলে এসেছে, তখন হঠাৎ অরুণের গলার আওয়াজে তার চমক্ ভেঙ্গে গেলো, সে ভয় পেয়ে বিছানায় উঠে ব'স্‌লো।

এত রাত্রে অরুণ যখন তার ঘরে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে—এই কথাই তার মন ব'ল্‌ছিল। অরুণ ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ্‌টা টেনে দিয়ে রূপার বিছানার কাছে এসে বল্লে—"আমি যাচ্ছি—"

ভয় পেয়ে রূপা বল্লে—"যাচ্ছ ? কোথায় ?"

"পুলিশ আমাকে ধরবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই রাত্তিরেই পালাতে হবে—"

রূপা স্তব্ধ হ'য়ে খানিকটা অরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভয়ে তার হাত-পা যেন হিম হ'য়ে আস্‌ছিল ; এবার তার দুই চোখ জলে ভ'রে এলো, কথা যেন তার গলা দিয়ে বের করা দুঃসাধ্য বোধ হ'ল ; অনেক কষ্টে সে শুধু বল্লে—"যেয়ো না।"

—"না গিয়ে কি জেলে যাবো ?"

রূপা এবার আরো ভয়ে অরুণের হাত চেপে ধ'র্‌লে ও বল্লে—"যেখানে যাবে, আমাকেও নিয়ে যাও ; আমায় একলা ফেলে যেও না—"

রূপা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু তাতেও অরুণ কোন লক্ষ্য না নিয়ে বল্লে—"তোমাকে সঙ্গে নিলে দু'পাও এগোতে হবে না, আমায় ধরা প'ড়ে যেতে হবে !"

—"আমি তা হ'লে কোথায় থাক্‌বো ? বাড়ী নেই, ঘর নেই, কেউ নেই—"

তেমনিই কঠোরস্বরে অরুণ বল্লে—"তা আমি কি জানি। আমায় এখনি পালাতে হবে !"

—"আমার যে আর কেউ নেই, কিছু নেই !"

—"কান্না শোনার আমার সময় নেই—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—"

তবুও রূপা হাত ছাড়ে না দেখে সজোরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অরুণ বল্লে—"ব'ল্‌ছি ছাড়ো—এক মিনিটও সময় নেই আর।"

অরুণ হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। রূপার হাত-পাগুলো থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছিল, সে আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লে না। মিনিট দশেক বাদে তার মনে হ'ল—হয় তো এখনো তিনি যান্‌নি, আর একবার সে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বে। লুণ্ঠিত দেহকে টেনে তুলে সে তাড়াতাড়ি অরুণের ঘরে গেলো, গিয়ে দেখ্‌লে—ঘর শূন্য। ঘরে তখনো আলো জ্বল্‌ছে, ঘরময় জিনিষপত্র ছড়ানো, বাক্স-সিন্ধুক সব খোলা প'ড়ে আছে। সত্যিই সে চ'লে গেছে, এ কথা এতক্ষণে রূপার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল, আর এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রথম চিন্তা এই এলো যে, এত বড় বাড়ীতে সে আজ একেবারে এক্‌লা! এর ফলে এমন একটা আতঙ্কে তাকে অভিভূত ক'রে দিলে যে, নিজের ঘরে ফিরে যেতেও সে পার্‌লে না। ঘুমহীন চোখে সেখানেই সে ব'সে ব'সে সমস্ত রাতটা কাটিয়ে দিলে। ভোর বেলা চাকর ও মালী এসে তাকে বল্লে—রাত দুটো আড়াইটের সময় পুলিসের লোক এসেছিল—অরুণকে খুঁজ্‌তে, কিন্তু সন্ধান না পেয়ে ফিরে গেছে।

———

আমি যাব না গো অমনি চ'লে
মালা তোমার দেবো গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে,
তোমার বাণী নিলেম বুকে।
ফাগুন শেষে যাবার বেলা,
আমার বাণী যাবো ব'লে
কিছু হ'ল অনেক বাকি
ক্ষমা আমায় ক'র্‌বে না কি ?
গান এসেছে সুর আসে নাই,
হ'ল না যে শোনানো তাই।
সে সুর আমার রইল ঢাকা
নয়ন-জলে নয়ন-জলে !

—ফাল্গুনী

আর একটু বেলা হ'তেই কাগজওয়ালা নিয়মিত কাগজ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, রূপা তাকে ডেকে বল্লে—"কাল থেকে আর কাগজ দিতে হবে না, দরকার নেই।" তখনো তার কাছে যা ছিল, তার থেকে নিয়ে সে কাগজওয়ালার পাওনা চুকিয়ে দিলে। দিয়ে আবার সে তেমনিই নির্ব্বাক হ'য়ে বসে রইল। হঠাৎ খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলো তার হতাশ দৃষ্টিতে কৌতুহল জাগালে—সে তাড়াতাড়ি কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে দেখ্‌লে তাতে লেখা,—

"শিল্পীর বীরত্ব।"

"বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স এক্ট অনুসারে পুলিশ কিছু দিন হইতে অরুণকুমার মল্লিককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঘুরিতেছিল। প্রকাশ, সন্দেহ-জনক কাগজ-পত্র ও কার্য্যে সে সংশ্লিষ্ট আছে।

কল্য তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ গিয়াছিল কিন্তু বাড়ীতে তাহার সন্ধান পায় নাই। কেবল একটী ঘরে তাহার তরুণী স্ত্রীকে একখানা চেয়ারে নিদ্রিতা অবস্থায় দেখিতে পায়। চাকরকে জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব করে যে, 'বাবু পশ্চিম গিয়াছে।' অরুণকুমারের বিষয় সম্পত্তি গৃহাদি সমস্তই দেনায় বিকাইয়া গেছে, তাঁহার অসহায়া তরুণী পত্নীর ভরণ-পোষণের জন্য দেশেব হিতকামীরা সচেষ্ট হউন্।"

রূপার হাত থেকে কাগজখানা মাটীতে প'ড়ে গেলো। সে খানিকটা চোখ বন্ধ করে রইল। প্রথমটা তার চিন্তা কর্‌বার মত অবস্থা ছিল না—মাথা ঘোরাটা একটু কমে এলে সে ভাব্‌লে, তার জন্যে কারও ভাব্‌বার দরকার নেই; সে কারও গলগ্রহ হ'তে চায় না। দেশের হিতকামীরা দেশের হিত নিয়ে থাকুন্, তার মত অপদার্থের জন্যে তাঁদের অমূল্য সময় কেন তাঁরা নষ্ট ক'র্‌বেন—?

ঈশ্বর যখন তাকে একলা নিরাশ্রয় ও নিরুপায় করেছেন, তখন তাই সে মাথা ও বুক পেতে নেবে আজ। এখন

তো আর তার ভয় নেই ভাবনাও নেই! এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, তাঁর আশ্রয় থেকে কেউ তো বঞ্চিত হ'তে পারে না কখন! তিনি জগতের নাথ, তাই তাঁকে যে তারও হ'তেই হবে। সে তো জগৎ ছাড়া নয়! আজ তার মনে হচ্ছে—যদি সে পথ হারায়, তিনি তাকে নিশ্চয়ই হাতে ধ'রে পথ দেখিয়ে দেবেন, অলক্ষ্যে কখন চুপি চুপি এসে তার ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলটুকুও বুঝি রেখে যাবেন! তাঁর এই ফাঁকি দেওয়া রোজ সে সইবে না কিন্তু! একদিন না একদিন নিশ্চয়ই সে তাঁর এই লুকিয়ে যাওয়া-আসা ধ'রে ফেল্‌বে; সেদিন তার সব সার্থক, সব ধন্য, সব পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে যে!

এমনিধারা চিন্তায় রূপার মনে যেন অনেকখানি সাহস জমে উঠ্‌লো। যাকে তিনি দুঃখ দেন, তাকে তিনি সহ্যও দেন্। যাকে গহন বনে আঁধার পথে একলা যাত্রী করেন, তাকে তিনি সাহস দিয়ে নির্ভয়ও করেন। রূপার মত কোমল ও ভয়-তরাসে মেয়েও, এই অভাবনীয় বিপদের মাঝে প্রথমটা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেও, শেষটায় বেশ দৃঢ়ভাবেই ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে এগিয়ে এলো। এ বাড়ী যখন তাকে ছাড়্‌তেই হবে, তখন যত শীঘ্র সে কাজ হয় ততই ভালো; মিথ্যা মায়া বাড়িয়ে সাহসের অপচয় করা উচিৎ নয়। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে প্রথম সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরমালায় ঘেরা যমুনা-তীরের যে মনোরম ছবি তার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌লো তার থেকে সে জোর করে মনকে ফিরিয়ে নিলে। সেখানে যে সব চেয়ে সে নিরাপদ হ'তে পারে ও আশ্রমের কাজে দিন কাটানোও সব চেয়ে সহজ ও সুন্দর, তা তার অবোঝার ছিল না; তা ছাড়া চন্দ্রা-মণিয়াদের আদর-যত্ন; তার তুলনা আর কোথায় পাবে সে? সেই নিভৃত কুঞ্জখানি, যেখানে সে ছিল; সেখানিও তো কম রমণীয় নয়! যেমন সুপ্রিয় তেমনি সুন্দর! কিন্তু এই সৌভাগ্যপূর্ণ লোভনীয় স্বর্গের দিক থেকে তাকে আজ চোখ ফিরিয়ে নিতেই হবে!

এই জোর করার ব্যথা তার শুখ্‌নো ঠোঁটে ও কালীপড়া শ্রান্ত চোখে দ্বিগুণ বেদনার চিহ্ন এঁকে দিলে। সে যেন সে ব্যথা অগ্রাহ্য কর্‌বার জন্যেই ঘরময় ঘুরে ফিরে যা কিছু ছিল, সব একটা বাক্সে পূরে তার উপর বড় বড় অক্ষরে চন্দ্রাবলীর নাম লিখ্‌লে, তার পর ঠিকানা লিখে সেগুলো ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেন সে এবার ব'স্‌ল।

তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে, এতক্ষণে অনাহারের কষ্ট অনুভব কর্‌তে হ'ল তাকে। মালীর বৌ বাগানে ঝাঁট দিচ্ছিল—তাকে সে পয়সা দিলে, খাবার কিনে আন্‌তে। দুঃখ-কষ্টকে ভয় পেলে তো চল্‌বে না; ভয়ানকের মধ্যেও

সুন্দর আছেন, তিনি ভীম আবার কান্তও ; তাই তাঁকে প্রণাম ক'রে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। তবু সে যে আজ বড় এক্‌লা—একেবারে এক্‌লাটী। তিনি কি নিজে এসে তার সঙ্গী হবেন না আজ ? যার কেউ নেই, তার যে তিনি আছেন, এ কথা যে সে শুনেছে ; আর এ কথা সে বিশ্বাসও ক'রে প্রাণ দিয়ে! এম্‌নি আকুলতা নিয়ে সে যখন চিন্তা কর্‌ছিল, তখন সে জান্‌তেও পারেনি, যে তার এই চিন্তায় আর যোগ-সাধনে কোন তফাৎ নেই—প্রাণের কান্নায় তাঁর আসন যত শীঘ্র নড়ে উঠে, এমন যে আর কিছুতে নয়! যে উপলব্ধি তার হ'ল, তাঁর কাছ থেকে সে যে সাড়া পেলে, তাতে তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে ধারা বেয়ে এলো। সে অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—সে তো যোগ করেনি, তবে কেমন ক'রে এমন হ'ল ? তাঁর দয়া যে আজ আপনিই ঝ'রে পড়্‌ল—শতধারে। অন্যদিনের মত আজও মালী এসে এক ছড়া টাট্‌কা যূঁইএর্ মালা তার সাম্‌নে ধরে দিয়ে প্রণাম করে যখন চলে যাচ্ছে, তখন তার চমক্ ভাঙ্গলো।

ফুলের মালার দিকে চেয়ে একটুখানি হাসি তার শুখ্‌নো মুখে ফুটে উঠ্‌লো—এখনো কেন এ সব—এ ফুলেও তো অধিকার নেই আর! সে মালীকে ডেকে বল্লে—"বাগানের ফুলেও আর আমাদের দাবী নেই—যাঁরা এ বাড়ী দখল করতে আস্‌ছেন, এখন থেকে এ ফুলও তাঁদের—কাল থেকে আর ফুলে হাত দিও না—"

পুরাণো মালী এ কথায় ব্যথা পেলে, বিষণ্ণ মুখে আবার প্রণাম করে সে চলে গেলো। মালা ছড়া তেমনিই পাতার উপর পড়ে ছিল; সন্ধ্যার বাতাস জানালার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাকুল ভাবে এসে রূপার কপালের ছোট ছোট চুলগুলি সোহাগ-ছলে উড়িয়ে তার সারা দেহে লুটিয়ে পড়্ছিল। আকাশের একদিকে সোণালী ও সিঁদুর ও অপর দিকে শ্রাবণের জমাট কালো মেঘের পানে চেয়ে রূপা ভাব্ছিল—কোথায় যাবে সে? কোন খানে? সহরের পথে হাজার জনের উৎসুক দৃষ্টি সহ্য করে সে তো পায়ে হাঁট্তে পার্বে না; গাড়ী করেই তাকে যেতে হ'বে। এখনো যা দু'পাঁচ টাকা পড়ে আছে, তাতে বোধ হয় গাড়ীভাড়াটা কোনো মতে কুলিয়ে যেতে পার্বে।

বেশীক্ষণ তাকে আর এই অন্ধকার ভবিষ্যতের নিরুপায় চিন্তায় কাটাতে হ'ল না; কারণ, তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে তার ঘরে এসে দাঁড়ালেন—আনন্দকিশোর! যাঁর চিন্তা মনে আন্তেও সে ভয় পাচ্ছিল, সেই ভয় একেবারে তার সাম্নে—! কি করে সে জয় কর্বে এ ভয়কে! অবাক্ হ'য়ে সে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আনন্দকিশোরও রূপার শুখ্নো মুখের দিকে খানিকটা ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বল্লেন—“এ কি চেহারা হ'য়েছে?”

—"বেঁচে আছি এখনো এই আশ্চর্য্য ; তার চেহারা।" একটু পরে রূপা আবার বল্লে—"তুমি কি .এতদিন তারকেশ্বরেই ছিলে ?"

—"না, তোমার সঙ্গে যেদিন পথে দেখা হ'য়েছিল, তার পর দিনই আমি কল্‌কাতায় চ'লে আসি। সেই অবধি শেঠ্‌জীর আত্মীয় সহদেব বাবুর বাড়ীতেই আছি।"

—"এখান থেকে কি অনেক দূর ? তাঁর বাড়ী ?"

—"হ্যাঁ, সহরের ভিতর।"

—"অনেক দিন কল্‌কাতায় আছ এবার তা হ'লে।"

—"খাতিরে জড়িয়ে পড়া গেছে, সহদেব বাবু তো ছাড়্‌বার পাত্র নয়। দেশ শুদ্ধ বন্ধু বান্ধবেরা ওখানে আমাকে নিয়ে নেমন্তন্ন খাইয়ে আর নাচ গান শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন—নইলে যে কাজের জন্যে এসেছিলুম, তা সার্‌তে দেরী হয়নি—"

—"কি কাজের জন্যে এসেছিলে ?"

—"শেঠ্‌জীরই একটা ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে—আমি তারকেশ্বরে আস্‌ছিলুম, তাই অমনি কল্‌কাতা হ'য়ে তাঁর কাজটাও সেরে গেলুম—নইলে তাঁকে আবার মিথ্যা এতদূর কষ্ট ক'রে আস্‌তে হ'ত।"

—"সহদেব বাবু যে গান শোনালেন, কেমন ?"

—"বেশ ভালো—"

—"কি কি গান শুন্‌লে ?"

—"তা কি আমার অত মনে আছে, কত কি গান।"

—"তুমি গাইলে ?"

রূপার এই ছেলেমানুষী কথায় আনন্দকিশোরের হাসি এলো কিন্তু সে হাসি চেপে নিয়ে বেশ গম্ভীর ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন—"না"

"আজও তুমি নাচ গান শুন্‌তে যাবে ?"

—"পাগল ! আজ আমায় বৃন্দাবনে ফির্‌তেই হ'বে ; সে কথা আমি সহদেব বাবুকে ব'লে রেখেছি।"

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হ'চ্ছিল কিন্তু অতিথিকে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লে অধর্ম্ম হয় না, তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের হিসেব রূপার জানা ছিল না, নইলে বোধ হয় এই দাঁড়িয়ে থাকার বিরুদ্ধে কিছু ভাবনার থাক্‌লেও সে তাকে প্রশ্রয় দিত না। কিন্তু ভদ্রতার সংস্কার গুলোই যত গোলমাল বাধালে, সে গুলোর জ্বালায় রূপার না ভেবে উপায় ছিল না যে, তার এই আস্‌বাবশূন্য ঘরে সে তাঁকে কোথায় বস্‌তে বল্‌বে—মাটীতে তো বস্‌তে বলা যায় না—! তার এই সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে আনন্দ-কিশোর নিজেই ব'লে বস্‌লেন—"বিছানাতেই বস্‌ছি আর যখন আসন নেই—"

রূপা কিছু বল্লে না, অতর্কিতে তার সমস্ত মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আনন্দকিশোর এবার বল্লেন—"কাগজে এই ব্যাপার দেখে তো অবাক্! কি ক'রে যে

এমন ঘট্‌লো। যাক্‌ তার তো আর উপায় নেই, পুলিশের উপর কারোই হাত নেই। এখন তুমি কোথায় থাক্‌বে ? এ বাড়ীও তো বাঁধা ?”

—“হ্যাঁ”

—“আত্মীয় স্বজনও কেউ নেই এখানে ?”

—“না। সব প্রসাদপুরে।”

—“সে আমি জানি, আমারও যে সেই দেশ” বলে আনন্দকিশোর একটা নিঃশ্বাস ফেল্লেন—তার পরে আবার বল্লেন—“সেখানে আর কি ক'রে যাবে এখন। জমিদারী তো এখন অপরের হাতে—যেখানে একদিন সব ছিল, সেখানেই এ ভাবে থাক্‌তে—”

—“না সেখানে যাওয়া অসম্ভব।”

—“তবে চলো আমার সঙ্গে। বৃন্দাবনের যে কুঞ্জে তুমি থাক্‌তে তা তোমার জন্যে ঠিক্‌ করা আছে, তুমি গেলে চন্দ্রা আর আশ্রমে থাক্‌বে না, যেমন তোমার কাছে থাক্‌তো তেমনি থাকবে। কাজের ভারও নিতে হ'বে, স্নেহের মেহন্নত্‌ আশ্রম দাবী কর্‌ছে তোমার কাছে।” রূপা কোন উত্তর দিলে না, আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—“আমোদের দিকটা আমরা আশ্রম থেকে একেবারে বাদ দিয়েছি। তার ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে, আশ্রমে যেটার অভাব আপাততঃ বিশেষ ক'রেই আছে—তুমি গেলে এই আনন্দের দিকটা আমরা খুল্‌বো—”

"সেটা কি ?"

"এই কাব্য, সঙ্গীত—এই সবের চর্চ্চা।"

—"কি যে পাগলের মত ব'কছ তার ঠিক নেই! যারা খেতে পায় না তাদের ওসব শেখানোর চাইতে খেটে খেতে পারে, এমন কিছু শেখালে কাজ দেখ্‌বে।

—"খেতে পায় না ব'লে কি তাদের আনন্দবোধের অধিকারও নেই? তারাও তো মানুষ! পরিশ্রমের কষ্টটুকুই বুঝ্‌বে তারা, আর পরিশ্রমের আনন্দটুকু বোঝার কোন সাহায্য আমরা কর্‌ব না কেন তাদের? দুঃখের ব্যথাটুকুই নেবে তারা, আর দুঃখের সুখটুকু থেকে বঞ্চিত হ'বে কেন? সেটুকু বোঝাতে গেলে ওসব বাদ দিলে তো হ'বে না—"

রূপার মুখে হঠাৎ একটু হাসির আভাষ দেখা গেলো, সে বল্লে—"তুমি আর অত গান শুন্‌তে যেয়ো না, ওরাই তোমার মাথায় এই সব ঢুকিয়েছে—"

হাসি চাপা আনন্দকিশোরের পক্ষে অসম্ভব হ'ল, তিনি তা লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা না ক'রে বল্লেন—"কারো সাধ্য নেই, আমার অনিচ্ছায় আমার মাথায় কিছু ঢোকায়! আর আমি জান্‌তুম তুমি তা জানো, এখন দেখ্‌ছি তুমিও আমায় সব সময়—"

—"থাক্, হ'য়েছে; আর তোমার ব্যাখ্যা কর্‌তে হ'বে না।"

আনন্দকিশোর থাম্‌লেন, কিন্তু বক্তব্যে বাধা পাওয়ায়

তাঁর কথা বলার সঙ্কীর্ণ পরিসীমা ভেবে ম্লান হ'য়ে উঠ্লেন। একটু পরে বল্লেন—"একটু খাবার জল দিতে পারো ?"

আনন্দকিশোরের এই যেচে আতিথেয়তা নেওয়া রূপার কঠোর হ'বার পথ আরো কঠোর ক'রে তুল্ছিল। যে রাজা হ'য়ে পূজা নিতে আসে, তাকে সোণার সিংহাসনে বসাবার ক্ষমতা যার নেই, সে স্পষ্ট অক্ষমতা জানিয়ে দিয়ে পূজার ভার থেকে নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু যে দেবতা বা ভিখিরী হ'য়ে পূজো নিতে আসে, তাকে ফেরানো যে সহজ ও সম্ভব নয়, তা রূপার আজ স্পষ্ট চোখে পড়্ল। দুটো ফুল চন্দন বা দুটী ক্ষুদ কুঁড়ো দেবার অক্ষমতা জানাতে গেলে মিথ্যাই বল্তে হয়। তাই ভিক্ষার দাবী ফেরান বড় সহজ কথা নয়। রূপা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জল ও খাবার নিয়ে এলো, আনন্দকিশোরের ইচ্ছা হ'ল খাবারের পাত্রটা সরিয়ে শুধু জলটুকুই খান্, কিন্তু যার দুঃখ-সজল দৃষ্টি বারবার তাঁর দৃষ্টিতে মিলিত হ'য়ে যাচ্ছে,—সে মুখে যতই অনাদর অবহেলা দেখাক্ না কেন, খাবার ফিরিয়ে দিলে তার দৃষ্টি যে গভীরতর ব্যথায় কাতর হ'য়ে উঠ্বে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসজনিত দয়ার উদ্রেক অভিমানের এই তীব্র প্রেরণাকেও জয় ক'রে ফেল্লে—তাই খাবার ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল না। শুধু ছোট্ট দুটী কথায় সেই তীব্র অভিমান সরস ও স্নিগ্ধ হ'য়ে দেখা দিলে,

তিনি বল্লেন—"না চাইলে তো তেষ্টার জলটুকুও দিতে না।" রূপা কোন উত্তর দিতে পার্‌লে না। আজ যেন বিশ্বের সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ধ'রেছিল, সে তেমনি চুপ ক'রেই ব'সে রইল।

খাওয়া সেরে হু'টো তিনটে পান খাওয়া হ'য়ে গেল, তবুও রূপার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলো না দেখে আনন্দকিশোর বল্লেন—"ভাব্‌ছো ?"

—"ভাবিনি তো"

—"তবে উঠে সব গুছিয়ে নাও, ট্রেণ ধ'র্‌তে পার্‌বো না, না হ'লে—"

—"আমি তো তোমার সঙ্গে যাবো না—"

—"তবে কোথায় যাবে শুনি ?"

—সে শুনে তোমার লাভ নেই।"

—"আমার সঙ্গে যেতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমি বরং সেখানে গিয়ে চন্দ্রা বা মণিয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি যেও—"

—"তাদের সঙ্গেও আমি যাব না"

—"কেন ?"

—"তা আমি তোমায় বোঝাতে পার্‌বো না"

—"তোমায় একলা ফেলে তো আমি যেতে পারিনে"

—রূপা এবার বল্লে—"আমিও এতক্ষণ ভেবেছিলুম একলা আছি কিন্তু তা নয়! কেমন ক'রে যে জগতের সঙ্গে

যুক্ত হ'য়েছিলুম, তা জানিনে। অন্তরের আয়নায় অনন্তের ছবি একে একে ভেসে উঠ্‌লো।"

আনন্দকিশোর প্রশ্ন ক'র্‌লেন—"কিছু না ক'রেই ?"

—"হ্যাঁ, জান্‌তুম না—কিছু না ক'রেও এমন হয়!"

—"তা হয়। তোমায় তো আমি এ কথা আগেই ব'লেছিলুম ; তখন তুমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারনি ; মানে, ধারণায় আন্‌তে পারনি। এখন অনুভব হ'য়েছে, তাই পারছ। যখন যোগ না ক'রেই যোগ হয়, তখন আসন, ইন্দ্রিয়রোধ, প্রাণায়াম—এ সব কিছুরই প্রয়োজন হয় না—বিশ্বে ও অন্তরে সে যোগ দিবারাত্র চ'ল্‌ছে—"

—"তুমি এত জানো, তবে আমার জন্যে ভয় পাচ্ছ কেন ?"

—"স্নেহ থাক্‌লেই আশঙ্কা আসে।"

—"স্নেহ, আশঙ্কা যেখানে আধিপত্য করে, সেখানে যোগ, ধ্যান কেমন ক'রে হয় ? তোমার উপর অন্ধ-বিশ্বাস আমি কখন করিনি ; কিন্তু সত্যকে তো মিথ্যা ব'ল্‌তে পারিনে ; তোমার কাছ থেকে যে সত্য পেয়েছি, তাতে ক'রে দৃঢ় বিশ্বাস এসেছে। কিন্তু এও বুঝ্‌তে পারছিনে যে, কেমন ক'রে তা সম্ভব হয়—যদি সাধারণের মত স্নেহ থাকে ?"

আনন্দকিশোর একটু হেসে বল্লেন—"সেটা তুমি নিজেকে দিয়ে বুঝ্‌লেই ভাল হয়, রূপা! তোমারও তো স্নেহ,

মমতা—সবই আছে! তবে কেমন ক'রে যুক্ত হ'লে বিশ্বের সঙ্গে?—অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে?"

—"হঠাৎ তাঁর দয়ায়, একান্ত চিন্তার ফলে হ'য়ে গিয়েছিল বোধ হয়।"

—"তবে আমার পক্ষেও তাই জেনো।"

—"কিন্তু লোকে তো বিশ্বাস ক'র্‌বে না। দু'টো পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব কেমন ক'রে অবিরুদ্ধতার দিক্ দিয়ে লোকে দেখ্‌বে?"

—আনন্দকিশোর বল্লেন—"কিছু অবিরুদ্ধতা নেই এর ভিতর, প্রাণ দিয়ে যদি বোঝা যায়।"

—"লোকে তা বোঝে না।"

আনন্দকিশোর হাস্‌লেন ও বল্লেন—"লোককে দেখাবার বা জানবার আমার কিছু প্রয়োজন নেই। তুমি দেখেছো, বুঝেছো—তা হ'লেই হ'ল। নীরস, নির্জ্জীব জড়পিণ্ডবৎ হ'তে হ'বে—যাতে ক'রে তার সঙ্গে আর ইঁট-পাথরের সঙ্গে কোন প্রভেদ না থাকে, বা কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে ক'রে স্নেহ, ভালবাসা-শূন্য হ'তে হ'বে—এই ধারণা যাদের মনে আছে, তাদের মনেই থাক্, তুমি এ ধারণা মনের কোণেও স্থান দিও না।"

একটু থেমে আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—"গভীর অনুরাগই যোগের প্রথম সোপান; তার থেকে সরিয়ে নিলে যোগ দাঁড়ায়—বিশেষ একটী বিদ্যা বা কর্ম্ম; ওর

অব্যক্ত ভাব ঐখানেই আছে—যেখানে আত্মহারা ভালবাসার অনন্ত মহিমা—সেখানেই—”

—“একটুকে ভালবাস্‌লে তো অনন্তকে ভালবাসা হয় না—”

—“যদি তা যথার্থ, নিঃস্বার্থ, একনিষ্ঠ ও অশেষ হয়, তা হ’লে হয়। এক থেকে অনন্তে মেশা তার স্বভাবজ ধর্ম্ম; না মিশে সে থাকৃতে পারে না! এক আর অনন্ত একই; কেবল বহু যেখানে, সেখানেই গোল বাধে। যথার্থরূপে একেক ভালোবাস্‌তে পার্‌লে অনন্তকেও বাসা যায়!”

রূপা বল্লে—“বহুকে নিয়েই তো অনন্ত? বহুকে ছেড়ে অনন্তকে ধ’র্‌বে কেমন ক’রে?”

আনন্দকিশোর' বল্লেন—“একের মধ্যে দিয়েই অনন্তে পৌঁছান সহজ ও সুষ্ঠু। বহুতে আর অনন্তে প্রভেদ এই যে, বহুতে বিভিন্নতা আনে, অনন্তে সমতা আনে। গীতায় তো প'ড়েছো—ব্যাবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একে হো কুরুনন্দন, বহুশাখা অনন্তাশ্চ বুদ্ধ্যায়োব্যবসায়িনাম্‌—কামীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা-যুক্ত, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে—তাই বহু পথের পথিক, আর অনন্ত পথের পথিক একই জিনিষ নয়। ‘এক’ হ’চ্ছেন সেই জন্যে অনন্তের প্রতীক।”

—“কিন্তু একের সাধনায় বিচিত্রতা নেই; বহুর সাধনায় তা আছে। আর বিচিত্রতাই জীবনের চিহ্ন।”

আনন্দকিশোর বল্লেন—“বিচিত্রতা একেতেও আছে,

আর তাই চিরন্তন। বহুতে যে বিচিত্রতা আছে, তা ক্ষণিক; তাই একের বিচিত্রতায় ডুব দিতে হয়। তা হ'লে আর হারাবার ভয় থাকে না। বহুর বিচিত্রতা অলীক, তাই ক্ষণে ক্ষণে হারায়।"

রূপা বল্লে—"সে কি রকম?"

—"মেঘের রং বহুর বিচিত্রতা, ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আকাশের রংএরও বিচিত্রতা আছে, কিন্তু তা হারায় না; একই নানা রূপ ধারণ করে। কিন্তু মেঘ মিলিয়ে যায়, তার অস্তিত্ব নেই। আকাশের অস্তিত্ব আছে, তাই সে কখনও হারিয়ে যায় না। এক বা অনন্তের আর বহুর বিচিত্রতার এই প্রভেদ। তোমার মধ্যে যে বিচিত্রতা আছে, তা অনন্ত, কিন্তু তোমার অনেক রকমের অনেক সাড়ী-জামার মধ্যে যে বিচিত্রতা আছে, তা ক্ষণিক—বহু আর একের বিচিত্রতায় এই তফাৎ।"

একটু ভেবে রূপা প্রশ্ন কর্‌লে—"একেকে ভালবাস্‌লে যে অনন্তকে বাসা হয়, তার যুক্তি কি?"

আনন্দকিশোর বল্লেন—"কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও যে এক বিরাজ কর্‌ছেন, একটী জীবের মধ্যেও সেই অখণ্ড এক পরিপূর্ণ-রূপে আছেন। কোথাও অসামঞ্জস্য নেই, কোথাও ছন্দ পতন হয়নি। সুর, লয়, ছন্দ, তালের যে সমষ্টি নিয়ে একটী ছোট গান রচিত, একটী বড় গানও তাই। এ পৃথিবীতেও চন্দ্র সূর্য্য ওঠেন, অন্য পৃথিবীতেও

ওঠেন। সেই একই নিয়মে মহাপ্রদেশে, প্রদেশে, দেশে, নগরে, গ্রামে, আবার বাড়ীতেও ওঠেন; তেমনি দেহের মধ্যেও চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত—সবই আছে। তা যদি না থাক্‌তো, তা হ'লে সৃষ্টিকাব্যের ছন্দ কেটে যেতো। তা হ'লে ঐ অনন্তের ছবি তোমার দিব্য-চক্ষের আয়নায় ভেসে উঠ্‌ত না—যা আজ দুপুর বেলা দেখেছো। কারণ, যা তোমার মধ্যে নেই, তা তুমি তোমার মধ্যে দেখ্‌তে পেতে কেমন ক'রে? দুটি সমান যন্ত্র যেখানে নেই, সেখানে তারহীন বার্ত্তা পৌঁছায় না; যেখানে আছে, সেখানে শূণ্যেও কথা চলে। তোমার মধ্যেও যা আছেন, জগতের মধ্যেও তাই। তাই একের মধ্যে দিয়েই অনন্তকে ভালবাসা সম্ভব।

রূপা বল্লে—"তা হ'লে বল্‌ছ—নিজেকেই নিজে ভাল-বাস্‌তে হয়?"

—"সে সোঽহং ভাব, জ্ঞানের পথ, বড় কঠোর। ভাল-বাসার পথ তা নয়। ভালবাসার পথে প্রতীক বা প্রতিমায় আত্মসমর্পণ ক'রে তুমি আমি রাখ্‌তে হয়। প্রেমিক শুধু ভালবাসা চায়, তার বেশী আর কিছু চায় না; এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে। রূপা! ভালবাসার চেয়ে বড় ত্রিভুবনে বা ত্রিভুবনের অতীতে আর কিছু নেই। কিন্তু ভালবাসাতে বেদনা আছে; প্রেমিক যে, সে হাসিমুখে কাঁটার মালা গলায় পরে থাকে—খুল্‌তে পার্‌লেও খুল্‌তে

চায় না। তাকে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব বিলিয়ে বেড়াতে হয়; এমন কি, ধর্ম্ম, পুণ্য—সবই তাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়—খালি ভালবাসার জন্যেই। রূপা! আমি যোগী নই, জ্ঞানী নই, ধার্ম্মিকও নই, কিন্তু যদি তোমার কখনও মনে হয়—আমি যোগী বা সন্ন্যাসী, তবে জেনো, ঐ ব্যথার আনন্দই আমায় তা ক'রেছে—তা ছাড়া আর কিছু নয়—আমি অতি নগণ্য সামান্য একটা জীব, তার বেশী ভেবোনা আমায়!"

রূপার চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমে এলো, অতিকষ্টে সে তা সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"লোকে তোমার একটি কথাও বিশ্বাস কর্‌বে না, ভাব্‌বে—ও সব কেবল কথাই সার—"

—"তা ভাবুক্, আমাদের তো তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। এখন চলো, আর সময় নেই—"

"এই যে তোমায় বল্লুম—আমি যাবো না।"

—"কত রকম বিপদ আছে, যা তুমি এখন কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ছ না, এ পৃথিবীতে পীড়নকারীর দলই বেশী—"

স্থির স্বরে রূপা জবাব দিলে—"তুমি আমায় যা দিয়েছ, আমার বিশ্বাস—সেই দানই আমায় সব বিপদ থেকে রক্ষা কর্‌বে। তাই নিয়ে সব দুঃখও আমি নিশ্চয়ই সহ্য ক'রে নিতে পার্‌বো—"

—"আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—তোমার না যাওয়ার কারণ কি। বিশেষতঃ, এ বাড়ী যখন তোমায় ছাড়্‌তেই

হ’বে। অজানা অচেনা কোথাও যাওয়ার চাইতে আমাদের কাছে যাওয়া কি ভালো নয় ?”

—“তোমার কাছে আমি একেই ঋণী, সে ঋণ শোধ কর্‌বার আমার উপায়ও নেই ; তাই আর তাকে বাড়াতে চাইনে—”

রূপার এই কথায় আনন্দকিশোর যে কতখানি ব্যথা পেলেন, তা শুধু সেই জান্‌লে যে দিলে তা। তিনি তাই আর কিছু না ব’লে শুধু বল্লেন—“এমন ভাব্‌ছ যখন, তখন আর তোমায় আমি যেতে ব’ল্‌ব না !”

আকাশের ঘনঘোর মেঘের দিকে চেয়ে তিনি ব’সে রইলেন, তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি সজল হ’য়ে উঠ্‌লো। তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে রূপার সাহস হচ্ছিল না ; কারণ, না যাওয়ার অজুহাত দেখাতে গিয়ে সে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলেছে ও সেই মিথ্যা বলার ভারে তার চোখ যে উঠ্‌তে চাইছে না, ওই চোখে,—যে চোখে জ্বলন্ত সত্যই শুধু জ্বল্‌ জ্বল্‌ কর্‌ছে—আগুনের মত। তার সব মিথ্যা, সব গোপনতা যে পুড়ে ছাই হ’য়ে যাবে—ঐ সত্যের দিকে চাইলে ; তাই তার সাহস হচ্ছিল না চাইতে। অথচ এই মৌনতা সহ্য করাও অসহ্য হ’য়ে প’ড়েছিল। তাই সে এবার সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে বল্লে—“গুরু জীবনে অমৃত হ’য়ে আসেন ; কিন্তু তুমি তো শুধু আমার জীবনে অমৃত হ’য়েই আসনি, আগুণ হ’য়েও এসেছ যে ! সে আগুনের ভিতর দিয়ে আর কতবার চল্‌তে বল্‌বে আমায় ?”

আনন্দকিশোর একটু যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন ; তারপরে বল্লেন—"আমি তো জান্‌তুম না, রূপা ! যে আমি এত ভয়ানক ! তুমি যে আমায় জানিয়ে দিয়েছ, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট !"

উদ্গত অশ্রু থামিয়ে নিয়ে রূপা বল্লে—"জানি, ব্যথা দিলুম ! কিন্তু যদি তুমি জান্‌তে—তোমায় আমি ভয়ানক বলিনি, ভয়ানকের বিপরীতই ব'লেছি ; তা হ'লে হয় তো ব্যথা পেতে না।"

—"এমন রহস্যে ঘিরে কথা বল্লে বোঝা শক্ত। ভয়ানকে ভয়ই থাকে।"

—"ভয় নেই, কিন্তু কালী আছে, যা সমাজ আর অনুষ্ঠান থাকতে মাথা চলে না।" আনন্দকিশোর একটু ভেবে নিয়ে কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি কিছু বল্‌বার আগেই রূপা আবার বল্লে—"নিজের মনের কামনাই আগুন। নিজের যখন প্রতি পদে পা ট'লে যাচ্ছে, তখন আগুনের ভিতর দিয়ে চলা যায় না।"

আনন্দকিশোর ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—"তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন—লৌকিক ও বাহ্যিক ধর্ম্মের মুখোসে আসল ধর্ম্মকে ঢেকে রাখ্‌তে ; তবুও এই যে আন্তরিক টান, একে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

রূপা যেন অনেকটা বুঝে এলো ! সে দেয়ালে হেলান দিয়ে শ্রান্ত মাথাটী হাতের উপর রাখ্‌লে। তার চোখে এতক্ষণ যে সাহসের নির্ভীক দীপ্তি ছিল, তা যেন নির্ভরের

কোমলতায় ভ'রে এলো। সে সেই দৃষ্টি নিয়ে আনন্দ-কিশোরের কথা শোনার আগ্রহে তাঁর দিকে চাইলে। তিনি আবার বল্লেন—"সত্যধর্ম্মের চেয়ে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই কি তোমার কাছে বড় হ'ল? অন্যায়ই বা কি আছে এতে? তুমি তো অন্য বাড়ীতে থাক্‌বে। আমরা পাঁচজন জানা লোক সে দেশে আছি, এই পর্য্যন্ত! যদি তোমার আপত্তি বা অনিচ্ছা থাকে, আমি তোমার বাড়ীর দিক্ দিয়েও যাবো না কখন! তবু চন্দ্রা-মণিয়ারা আছে, তোমার পক্ষে সুবিধে হ'ত—"

রূপা এ কথার উত্তর দিলে না। আনন্দকিশোর আবার বল্লেন—"ঈশ্বরের কাছে যদি দোষী না হই, তবে মানুষের দেওয়া দোষটাই কি আমাদের উপর সগর্ব্বে আধিপত্য ক'র্‌বে? আর সেইটাই কি তোমার কাছেও সব চেয়ে বড় হ'ল?"

রূপা আবার সোজা হ'য়ে বস্‌ল। তার চোখে যদিও এবার সাহসের দীপ্তি ছিল না, কিন্তু মিনতিভরা বেদনায় তা ছল্ ছল্ ক'র্‌ছিল; হাত জোড় ক'রে সে বল্লে—"আমি অনেক ক'রে এ মন বেঁধেছি, আর তুমি তাকে এমন ক'রে এলিয়ে দিও না।"

এবার আনন্দকিশোর উঠ্‌লেন ও শান্ত মুখে শুধু বল্লেন —"না, আর তোমার বাঁধাকে এলিয়ে দেবো না—যতবার এলিয়েছি, ততবার তুমি ক্ষমেছ—তাই স্পর্দ্ধা বেড়ে

গেছে !—যাই তবে, তুমি তো আমায় যেতেই অনুমতি ক'র্‌ছ ?"

—"একটু দাঁড়াও।"

মালীর দেওয়া ফুলের মালা ছড়া অদূরেই প'ড়ে ছিল; রূপা সেটা হাতে তুলে নিয়ে আনন্দকিশোরের সাম্‌নে ধ'রে বল্লে—"এই দক্ষিণা ! তুমি দয়া ক'রে নাও ! এর চেয়ে বেশী আমার আর কিছু দেবারও নেই !"

রূপার হাত থেকে ফুলের মালা তিনি দু'হাতে তুলে নিলেন কিন্তু কোন কথা কইলেন না। তাঁর কাছ থেকে উত্তরের আশায় রূপা তাঁর দিকে চাইলে ; তিনি কিন্তু তার দিকে শুধু স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

রূপা আবার বল্লে—"তোমার দান অশেষ আনন্দের নামান্তর কিন্তু তার বদলে আমি শুধু তোমায় ব্যথা দিতেই বাধ্য !" রূপা থাম্‌লে, আনন্দকিশোর তবুও কোন কথা কইলেন না।

রূপা ফের বল্লে—"তোমায় যা দিতে পার্‌লুম না, তা যেন ত্যাগের দ্বারা নিজেকে নিঃশেষে ফুরিয়ে সবার মধ্যে দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারি—এই তুমি আশীর্ব্বাদ করো—"

আনন্দকিশোর তবুও কোন কথা কইলেন না ! আকাশের কালো মেঘ থরে থরে জমে উঠেছিল, ঝিলিক্ দিয়ে দেয়ার গুরু গুরু ঘরের মধ্যে আলো হান্‌লে—ব্যস্ত হ'য়ে রূপা

বল্লে—"ওগো কথা কও! দেখ্ছো না, কি ভয়ানক বৃষ্টি আস্ছে—সন্ধ্যাও হ'য়েছে অনেকক্ষণ—!"

এবার সেই স্তব্ধ দৃষ্টি রূপার মুখ থেকে নামিয়ে এনে তিনি নীরবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে চ'লে যেতে দেখে রূপা ব'লে উঠ্লো—"না হয় একটু থেমে যাও; বৃষ্টি এলো যে!"

আনন্দকিশোর এ কথার উত্তরও দিলেন না, ফিরেও চাইলেন না, চলাও থামালেন না! জানালা থেকে রূপা তাঁর শ্রান্ত গতির দিকে চেয়ে রইল! দু'পা চ'ল্তে না চ'ল্তেই ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নেমে এলো; নববর্ষার সহস্র ধারায় যেন তাঁকে স্নান করিয়ে দিলে। তিনি ভিজ্তে ভিজ্তে পথের মোড় ঘুর্লেন—আর দেখা গেলো না। জানালার কাছ থেকে স'রে এসে রূপা এবার শয্যায় লুটিয়ে প'ড়্ল—যে শয্যা আসন হ'য়েছিল তাঁরই—দয়া ক'রেই তিনি তা হ'তে দিয়েছিলেন, নইলে সে তো তাঁকে ব'স্তেও বলেনি! এতক্ষণের আয়াসনিরুদ্ধ বেদনার অপরিসীম ব্যথা, সংযত অশ্রু এবার নিশ্চিন্ত আরামে নিজেকে মুক্ত ক'রে দিলে। দুঃখ অনেক আছে, তা সহ্য করার সার্থকতা এবং সান্ত্বনাও অনেক আছে; কিন্তু এ জগতে যে দুঃখের সহানুভূতি মেলে না—যা জানাবারও নয়, সেই সান্ত্বনা ও সার্থকতাহীন গোপন দুঃখ যে কেমন ধারা, তা শুধু সেই জানে—যে জেনেছে! ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের আশায় যে দুঃখ সহ্য করা হয়, তা সহনীয় ও সার্থক

হয়—স্বর্গলাভের প্রতীক্ষায়। যে দুঃখ সহ্য করা হয়—নাম-যশের প্রত্যাশায়, তা কীর্ত্তিকলাপের গৌরবে মুছে যায়। যাতে নাম-যশ, পুণ্য-ধর্ম্মের কোনরূপ দুরাশাই নেই, পরন্তু অক্ষয়-স্বর্গের সিংহদ্বার চিররুদ্ধই হ'য়ে যায়, ও অপযশের মুকুট নেবার জন্যে সর্ব্বদাই মাথা পেতে রাখ্‌তে হয়, তার সার্থকতা কোথায়? সে নিজেই নিজেতে সার্থক! তাই সমস্ত সার্থকতাকে হারিয়ে দিয়ে, তার পরিপূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে যে বচনাতীত আনন্দ ছিল, তাকে সহ্য করাও যেমন রূপার পক্ষে অসহ্য হচ্ছিল, ছাড়াও তেমনি অসাধ্য দাঁড়িয়েছিল—একপ্রকার অসম্ভবই! সেই অতিরিক্ত পুলকের বেদনায় সে যাতনায় ছট্‌ফট্ ক'র্‌ছিল; কিন্তু সে যাতনা উপশমের চেষ্টাও তার ছিল না। বেদনা পুলকের, আনন্দ-বিষাদের, দুঃখ-সুখের সেই অবস্থায়—

"বাহে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
সে প্রেমের অদ্ভুত চরিত।"

তাই এই সাধের বেড়ী খোল্‌বার উপায় রূপার আর কোন মতেই ছিল না। উচ্ছ্বাসের মাত্রা যখন কতকটা কমে এলো, তখন সে ভাব্‌লে—এই রাত্তিরে বৃষ্টির মধ্যে না জানি তাঁকে কত পথই চল্‌তে হ'বে! সে শুধু ব্যথাই দিয়েছে তাঁকে চিরদিন! তিনি যে রাগ ক'রে কথা ক'ননি, সে তো তার পক্ষে ঠিকই হয়েছে! তিনি আর কখনও তার সঙ্গে কথা কইবেন না বোধ হয়! যদি কখন দেখা হয়, তা

হ'লে বোধ হয় তাকে চিন্‌তেও পার্‌বেন না। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বার কোনো সুযোগও তিনি আর দেবেন না তাকে! নিজেই তো সে তাঁর কাছ থেকে এই সব চেয়ে নিয়েছে, এখন তাঁকে নিষ্ঠুর ব'লে, নির্দ্দয় ব'লে কি হ'বে আর? তবু সে হাজারবার বল্‌বে—তিনি ভয়ানক নিষ্ঠুর! তিনি নির্ম্মম! নির্দ্দয়!

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,

বিচ্ছেদ তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে !

*   *   *   *   *   *

প্রেম সাধনার হোম হুতাশন জ্বলবে যবে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক !

সব আশা জাল যায়রে যখন উড়ে পুড়ে

আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,

স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা ক'বে !

আয়রে সবে

প্রলয়-গানের মহোৎসবে !

—বসন্ত

শ্রাবণের দুর্য্যোগ। গঙ্গার তীরে তীরে বরাবর সে চ'লেছে ! রাত্রি গভীর ! বোধ হয় ১টা, ২টো, তিনটেও হ'তে পারে ! রূপার হাঁট্‌বার শক্তি ক্রমশঃ যেন লোপ পেয়ে আস্‌ছিল। তবু তাকে চ'ল্‌তে হবে—যতদূর্ চোখ যায়, ততদূর্। জগৎমন্দিরের নিত্য সেবার অতিথিশালায় কতদিনে সে পৌঁছতে পার্‌বে, তা তো এখনো সে জানে না, কতদূর্ পথ তাও তার অজানিত। তবু তাকে একদিন না একদিন পৌঁছতে হ'বেই। কাঙ্গালী-ভোজনের বিরাট নিমন্ত্রণে সেও বাদ যাবে না সেদিন। একটুখানি প্রসাদ তার ভাগ্যেও মিলে যাবে হয় তো। কিন্তু পথ-ঘাট

সবই তার অজানা, এখানে সে এর আগে আর কখনো আসেনি। এ রাস্তা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, সে সব তার কিছুই চেনা নেই। এত রাত্রে দেবালয়ে বা আর কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে কি না, তাও তার জানা ছিল না।

এধারে তার হাঁটায় অনভ্যস্ত পা দু'খানা ক্রমাগতই তার সঙ্গে বাদ সেধে চ'লেছিল। তার সেই শ্রান্ত, ভয়চকিত, লজ্জা-বেপথু চেহারা কি যে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তা যে না দেখেছে তাকে বোঝানো দুষ্কর। ফুল-শয়নে প্রিয়াশায় উৎসুক যে সৌন্দর্য্য একখণ্ড হীরের মত জ্বল্ জ্বল্ করে, এ সে রূপ নয়। ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে যে কাঙ্গালিনী করুণ চোখে চেয়ে থাকে, এ সে রূপও নয়! এ যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোচ্ছটা, ধূলার মাঝে মণি-দ্যুতি! দুঃখের গাঢ় আঁধার ভেদ ক'রে ত্যাগ-মহিমার প্রোজ্জ্বল দীপ্তি!

রাস্তার আলোর কাঁচগুলো টীপ্ টীপ্ বৃষ্টিতে ঝাপ্সা ও আলোগুলো নিবো নিবো হ'য়ে এসেছিল, সেই আলোয় সে দেখ্‌লে—একটা ঘাটের কাছে বরাবর সে এসে প'ড়েছে। সে ঘাটে কেউ নেই, পথও প্রায় জনমানবশূন্য! ব্যথায় অচল তার পা দু'খানা থামিয়ে এবার সে ঘাটের উপর ব'সে পড়্‌ল!

নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, আঁধার রাত! ঘন ঘোর মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন! গঙ্গায় তুফান! ঢেউএর উচ্ছ্বাস সিঁড়ির ধাপে ধাপে বারবার আছাড় খেয়ে ফির্‌ছিল। উদ্দাম ঝড়, বিরামহীন অজস্র বৃষ্টি ও নিদারুণ বজ্রপাতের সুসম্ভাবনা রূপা আজ অনুক্ষণই প্রতীক্ষা ক'র্‌ছিল, তাই এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর কাছে এগুলি আজ সুন্দর না হ'য়ে আসেনি।

রূপার তৃষ্ণাপিপাসু অনিমেষ দৃষ্টি পশ্চিমের নয়নাভিরাম নতুন কালো মেঘমালার সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিল। সেই জলভার-স্তব্ধ নবঘন তাকে আজ অভিমান-স্তব্ধ আনন্দকিশোরের বিদায়-মুখচ্ছবি মনে করিয়ে দিলে। ঠিক্ তেমনি অনুযোগভরা বেদনার নির্ব্বাক্ চাউনি দিয়ে যেন তার দিকে এখনো চেয়ে আছেন। তিনি এতদূরেও তাকে অনুসরণ ক'রে এসেছেন তা হ'লে? তা হ'লে তো তিনি সর্ব্বত্রই এমনি অভি-রূপ ধারণ ক'রে ফির্‌বেন; তবে কেমন ক'রে সে নিজেকে সরিয়ে নেবে তাঁর এই নিখিল জোড়া দৃষ্টি থেকে?

যে ভাবনা একদিন সে সরিয়ে ফেল্‌তে কতই ব্যর্থপ্রয়াস করেছে, আজ সেই ভাবনার বিষ নীলকণ্ঠের মতই আকণ্ঠ পান ক'রে তার শুষ্ক চোখ কান্নায় সরস হ'য়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণের তীব্র দাহ বরষার স্নেহ ধারায় জুড়িয়ে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভাবনা থামিয়ে দিয়ে অনবরত মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুতের ঝলক্! কি ঘোর রাত্রি! কোথায়

আশ্রয়! কোথায় ঘর! সে ভয়ানক চম্‌কে চারধারে চেয়ে উঠে দাঁড়ালে! এক্ষণি যে দুর্দ্দাম বেগে বৃষ্টি আস্‌বে, তার চিহ্ন আকাশের বুকে গোপন ছিল না। রূপা অত্যন্ত ভয় পেলে, তার হাত পা যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছিল, তার এই ভয়ানক রাত কি ক'বে কাট্‌বে?

কোনমতে আবার সে সাহসে বুক বেঁধে আশ্রয়ের চেষ্টায় অল্প অল্প ক'রে হাঁট্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। একটু পরে একটী বাঁধানো অশথ্‌ গাছের তলায় আবার সে এসে প'ড়্‌ল। মনে হ'ল—অদূরে যেন আবাস-গৃহের প্রদীপ দেখা যাচ্ছে, হয় তো আর একটু চ'লে ঐখানে পৌঁছে সদর দরজায় ঘা দিলে, গৃহস্থ যদি দয়ালু হ'ন্‌, তা হ'লে দরজা খুলে তাকে আশ্রয় দিতেও পারেন! কিন্তু আর অতটুকু চলার শক্তিও যে রূপার এক বিন্দুও ছিল না, তার সে চেষ্টা সে ক'র্‌বে কোথা থেকে!

সে গাছতলায় বাঁধানো বেদীর উপর একেবারে লুটিয়ে প'ড়্‌ল। তার চোখে মুখে মৃত্যুর ছায়া সুস্পষ্টরূপে ফুটে না ওঠ্‌বার কোন সুসঙ্গত হেতুই বিদ্যমান ছিল না। সে ভাব্‌লে—যে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি আস্‌ছে, তা কি এই অশথ্‌ গাছের এত অবিরল পাতা ও সুঘন ডালপালাতেও আট্‌কে রাখতে পারবে? তা পার্‌বে না। এই বৃষ্টিতে হয় তো বাজ প'ড়ে আজ তার মৃত্যু অনিবার্য্যরূপেই বিধাতা লিখে রেখেছেন! তা রাখুন, তবু তাঁরই শরণাশা ছাড়া আজ তো

আর কোন আশার অধিকারই সে রাখেনি,—নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলে এসেছে সব!—এধার ওধার দুধারই!

আবার তার চিন্তা থামিয়ে সেই ভয়ঙ্করের মাঝে রূপার কাণে ভেসে এলো—সুমধুর এক ধ্বনি! চার ধারের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির মাঝে এই সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি যেন এক সঙ্গে সুধা-বিষের মত তার মানস-ওষ্ঠের সাম্‌নে কে এনে ধ'রে দিলে। ভয়ে সে কাঁপ্‌ছিল, এবার পুলক-শিহরণ ব'য়ে গেলো তার সারা দেহে। হঠাৎ আরো একটা অভাবনীয় চিন্তা এসে তাকে আকুল করে তুল্লে, সে শশব্যস্তে মাথা তুলে উঠে ব'স্‌লো ও কাণ পেতে যেন সমস্ত নিঃশ্বাসটুকু বন্ধ ক'রে দু'হাত বুকে চেপে সেই গান এক মনে শুন্‌তে লাগ্‌লো। পরক্ষণেই আবার সে শ্রান্ত ভাবে এলিয়ে প'ড়্‌ল ও লজ্জিত হ'য়ে ভাব্‌লে—যত আজ্‌গুবি ভাবনা—কেন যে তার মাথায় এসে এমন বিব্রত ক'র্‌ছে—তাও কখন হয়—!

কত লোকের গলার স্বর অমন কত লোকের মতন আছে—কেন যে সে এমন ভাব্‌ছে! তিনি কোন্‌কালে বৃন্দাবনে পৌঁছে গেছেন, তার কথা তিনি আর ভাব্‌ছেনও না! যে আঘাত সে তাঁকে দিয়েছে, এর পর সে যেখানে আছে সে দিক্‌ দিয়েও তিনি যাবেন না কখনো! এ বোধ হয় তার একটা নতুন রোগবিশেষ, তাই তাঁরই স্বর শুন্‌ছে, যাঁর স্বর তার কর্ণ-কুহরে প্রবেশের অবসর

বোধ হয় তার এ জীবনে মিল্‌বে না আর! এতক্ষণ মেঘ দেখে তার দৃষ্টি-বিভ্রম হ'য়েছিল, এবার গান শুনে তার শ্রুতিবিভ্রম হ'য়েছে, না জানি তার অদৃষ্টে আরো কত কি আছে।

এবার তার আশ্রয়টুকু ভাসিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে যখন জলধারা নেমে এলো, তখন সে চিন্তা সরিয়ে আবার চম্‌কালে! এমন জোরে অজস্র বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল যে, রূপার মনে হ'ল—এ বৃষ্টি বুঝি ৩১৪ দিনের কম কখনও থাম্‌বে না। দৃশ্য আরো ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌লো, অবিরাম মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চম্‌কানোয় রূপা দু'হাতে চোখ ঢাক্‌লে।

কাছেই বাজ' প'ড়্‌ল! একটা গাছ মড়্‌ মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে মাটীতে প'ড়ে গেলো! সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজে রূপার হৃৎস্পন্দন চিরস্পন্দহীন হ'বার উপক্রম ক'র্‌লে! আজ তার মৃত্যু বুঝি নিশ্চিত! কোথায় যাবে সে? কেমন ক'রেই বা চ'ল্‌বে এই দুর্যোগে? এই ব্যথা-কাতর শরীরটা টেনে নিয়ে আর যে সে এক পা-ও চ'ল্‌তে পার্‌ছে না, তার পা যে একেবারে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে! তার তো আর এক পা-ও নড়্‌বার ক্ষমতা নেই, আর কেই বা আছে যে তাকে হাত ধ'রে নিয়ে যাবে? কেউ তো নেই, দুর্য্যোগও বিরামহীন, আঁধারও অচল, শরীরও অবশ, আশা ভরসাও শূন্য—কি হ'বে তবে? তবে কি মৃত্যুই

নিশ্চিত আজ ? এমনি ভাবে ? চির-প্রিয়ের বিনা দেখায় শেষ কেমন ক'রে বরণ ক'রবে তাকে ? তাও কি কখন হয়। এ যে অসম্ভব ! একেবারেই অসম্ভব !

উঃ ! আবার বিদ্যুৎ ! আবার গর্জ্জন ! আবার অশনি !

কি হ'বে তবে ? আর যে সে ভাবতে পারে না.........

লেখিকার

ছবি ও কবিতার এল্‌বাম "কিশলয়" ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ধ্রুবা (উপন্যাস) ২৲

এম্, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্,

৯০।২, এ, হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।

—:*:—